অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

সপ্তম খন্ড

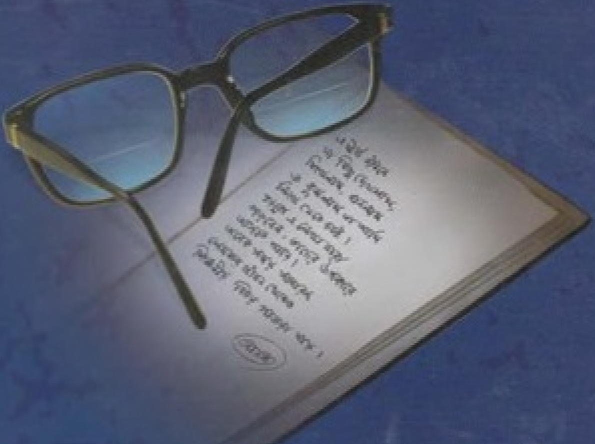

জীবনে যা দেখলাম

সপ্তম খণ্ড

(১৯৯৩-১৯৯৪)

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.bjilibrary.com

জীবনে যা দেখলাম

সপ্তম খণ্ড

(১৯৯৩-১৯৯৪)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.bjilibrary.com

চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৭

জীবনে যা দেখলাম (সপ্তম খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : জননী প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 70 1

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

দেখা-সাক্ষাতের পালা	১৭
দুটো বিশেষ ফোন	১৭
সাংগঠনিক সফর	১৮
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন	১৯
সাংগঠনিক সফরের সিদ্ধান্ত	২০
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ	২১
নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল	২২
কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন	২৩
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি	২৩
কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত	২৪
প্যালেস্টাইনের হেবরন ইস্যু সংসদে	২৪
বড় রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি	২৫
শুরু হলো বয়কটের পালা	২৬
কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু জামায়াতেরই সৃষ্টি	২৬
জামায়াতে ইসলামীর মহাসংকট	২৭
এ মহাসংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস	২৭
প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাওলানা নিজামীর একান্ত সাক্ষাৎ	২৮
বেগম জিয়ার জবাব	২৯
হাইকোর্টে নাগরিকত্ব মামলার শুনানি ও রায়	৩০
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ	৩০
আপিল বিভাগে শুনানি	৩১
এটর্নি জেনারেলের যুক্তির মর্মকথা	৩১
এটর্নি জেনারেলের যুক্তির জবাবে ব্যারিস্টার ইউসুফ	৩২
ঐতিহাসিক রায়	৩৩
এ রায়ের সুফল	৩৪
রায়ের সুখবর বয়ে এনেছেন মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম	৩৫
মুবারকবাদের পালা	৩৫
নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হলেন	৩৬
নাগরিকত্ব বহালের দাবিতে আন্দোলনের গুরুত্ব	৩৬

www.bjilibrary.com

ব্যারিস্টার ইউসুফকে সংবর্ধনা প্রদান	৩৭
ব্যারিস্টার ইউসুফের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা	৩৮
শুকরিয়া সমাবেশ	৪০
শুকরিয়া সমাবেশে আমার বক্তব্য	৪১
২৩ বছরে যাঁদের হারালাম	৪২
১২ কোটি মানুষের সুখ-শান্তিই একমাত্র কামনা	৪৩
জাতীয় ঐক্য ছাড়া দেশ গড়া যাবে না	৪৩
বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই	৪৪
রাজনৈতিক ঐক্য	৪৪
আদর্শিক ঐক্য	৪৫
শেষকথা	৪৫
জামায়াতের মজলিসে শূরা	৪৬
মজলিসে শূরার এজেন্ডায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম	৪৭
মুহাসাবা পদ্ধতি	৪৮
বাইতুল মাল রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট	৪৯
আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ	৪৯
মধ্যবর্ষ অধিবেশন	৫০
সারা দেশে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত	৫২
জামায়াতের প্রস্তুতি	৫৩
লালদিঘি ময়দান জামায়াতের দখলে	৫৩
লালদিঘির ঐতিহাসিক জনসভা	৫৪
মাওলানা সরদার আবদুস সালামের আকস্মিক ইন্তিকাল	৫৫
আমার ঘনিষ্ঠ সাথী	৫৭
তা'লীমুল কুরআন আন্দোলন	৫৭
হঠাৎ মৃত্যু	৫৮
দেশের সমস্যাসংকুল বর্তমান রাজনীতি	৬০
বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি	৬০
গণতন্ত্র ধ্বংসের সরকারি অপচেষ্টা	৬২
আওয়ামী স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি	৬৩
মুজিব হত্যাকারীরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং তারা আওয়ামী শাসনই বহাল রেখেছেন	৬৪
মুজিব হত্যা কি বিচারযোগ্য অপরাধ?	৬৪

www.bjilibrary.com

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ৬৫
শেখ মুজিবের আদর্শ ৬৫
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কঠিন সংকট ৬৬
আওয়ামী লীগের আদর্শ কী? ৬৬
গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন পরিচয় ৬৭
গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন পরিচয় বনাম আওয়ামী লীগের পরিচয় ৬৯
আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক কার্যাবলি ৭০
বাংলাদেশ আমলে আওয়ামী গণতন্ত্র ৭০
শেখ হাসিনার অপশাসন ৭১
মহাবিপদ কেটে গেল ৭৫
মামূন ট্রাফিক জেলে ৭৬
মামূনের মুক্তিপ্রচেষ্টা ৭৭
মামূনের দুদিনের জেলজীবন ৭৭
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানা গেল ৭৯
ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (IDB) মামূনের দায়িত্ব ৭৯
মামূন বংশের বড় ছেলে ৮০
আমার বিদেশ সফর ৮১
নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ৮১
১৯৯১ সালের নির্বাচন ৮১
২০০১ সালের নির্বাচন ৮২
রাষ্ট্রপ্রধান ও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ভূমিকা ৮৩
নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার ভূমিকা ৮৩
শেখ হাসিনার প্রতি অনুরোধ, নিজের সঠিক মূল্যায়ন করুন ৮৪
শেখ হাসিনার সর্বশেষ উপলব্ধি ৮৫
শেখ হাসিনার ইসলাম আতঙ্ক ৮৫
বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়ার ষড়যন্ত্র ৮৬
আমেরিকায় শেখ হাসিনার অপপ্রচার ও আমেরিকার মনোভাব ৮৬
ভারতই শেখ হাসিনার শেষ ভরসা ৮৭
শেখ হাসিনার রাজনীতি ও ভারতের সমর্থন ৮৯
আরো একটা সড়ক দুর্ঘটনা ৮৯
আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সরকার উৎখাতের আন্দোলন ৯১
গণতান্ত্রিক ভাষা তাদের মুখে জোটে না ৯২

www.bjilibrary.com

ভাঙচুর ও জ্বালাও-পোড়াও তাদের আদি কর্মপদ্ধতি ৯২
শেখ হাসিনা ও সন্ত্রাস ৯৪
জোট সরকারের আমলে সন্ত্রাস ৯৫
জেএমবির সন্ত্রাস ও শেখ হাসিনার ভূমিকা ৯৬
শেখ হাসিনার অতি উর্বর মস্তিষ্ক ৯৮
শেখ হাসিনা কি নির্বাচন চান? ৯৯
নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে তিনি হতাশ ৯৯
নির্বাচন বানচালের পরিকল্পনা ১০০
আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে কি ভারতের আধিপত্য চায়? ১০১
জনগণ ভারতকে কেন বন্ধু মনে করে না? ১০১
ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'-এর বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য ১০৩
ভারতে হিন্দুদের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্ক ১০৩
কারা ভারতকে পরম বন্ধু মনে করে? ১০৪
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হুমকি ১০৫
আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক ১০৬
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও শেখ মুজিবের ভূমিকা ১০৮
ভারত ও মুজিববিরোধী চেতনার সূচনা ১০৯
শেখ মুজিবের গদি রক্ষা বাহিনী ১১০
আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাকে কি জনগণ সাড়া দেবে? ১১০
'৭১ সাল ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য ১১১
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ১১২
আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায় ১১২
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভার খবর
যেভাবে পত্রিকায় এসেছে ১১৩
অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ১১৩
দৈনিক ইনকিলাবের খবর ১১৪
আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনায় পার্থক্য ১১৫
জলিল সাহেবের বক্তব্যের তাৎপর্য ১১৫
ডেপুটি হাই কমিশনারের ধৃষ্টতা ১১৬
বিদেশ সফর ১১৬
সফরের বিবরণ ১১৬
সময়ের ব্যবধানে ঘুমের সমস্যা ১১৭

www.bjilibrary.com

আড়াই মাসের কতদিন কার বাড়িতে থাকব	১১৭
সালমানের বাসা	১১৮
শেষ তিন সপ্তাহ	১১৯
দীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ	১১৯
৭/৭-এর ১ম বার্ষিকী	১২১
ইউরোপের সর্ববৃহৎ ইসলাম এক্সপো	১২২
লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ বৈঠক	১২৪
ডকুমেন্টারি ফিল্‌মের প্রতিপাদ্য	১২৪
MCB ও ব্রিটিশ সরকার	১২৫
অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ	১২৬
বাংলাদেশে একই চিত্র	১২৬
উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্‌মে মাওলানা সাঈদী প্রসঙ্গ	১২৭
ব্রিটেনে মাওলানা সাঈদী	১২৮
মাওলানা সাঈদীর বিবৃতি	১২৯
ইসলামের বিরোধিতার পদ্ধতি সর্বত্র একই	১৩১
মুসলিম উম্মাহর দুশমনদের নিকট কাদিয়ানীরা এত প্রিয় কেন?	১৩২
বাংলাদেশি মুসলমানগণ কাদিয়ানীবিরোধী নয়	১৩২
চ্যানেল ফোর ও ব্রিটেনের বাংলা পত্রিকা	১৩৪
কেন এমসিবি এদের টার্গেট	১৩৪
গত বছরের ডকুমেন্টারি	১৩৬
কে এই মার্টিন ব্রাইট?	১৩৬
মুরাদ কোরেশী ও তার সংশ্লিষ্টতা	১৩৭
এমসিবির বিবৃতি	১৩৭
ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিবৃতি	১৩৮
ইসলাম এক্সপো	১৩৯
অনুষ্ঠানস্থল	১৩৯
ইসলাম এক্সপোর মূল লক্ষ্য	১৪০
অনুষ্ঠানের সেমিনার	১৪০
বিলেতে মুসলিমদের অবস্থা	১৪১
আরবদের অবস্থা ভিন্ন	১৪২
বিলেতে মুসলমানদের রাজনৈতিক কৌশল	১৪২
ফিলিস্তিনের ওপর সেমিনার	১৪৩

www.bjilibrary.com

ইরাক দখলের তিন বছর ১৪৪
ইসলাম এক্সপোর তাৎপর্য ১৪৪
বাংলাদেশে গণতন্ত্র ১৪৫
১৯৯১-এর নির্বাচনের পর- ১৪৬
গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথে নতুন সমস্যা ১৪৬
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন ১৪৭
১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচন ১৪৭
ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনার আসল রূপ ১৪৮
অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ ১৪৯
এমন আজব আচরণের আসল কারণ ১৪৯
আওয়ামী লীগ একটি ফ্যাসিস্ট অপশক্তি ১৫০
বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ১৫০
নবম সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করবে ১৫১
আওয়ামী লীগের কারণে কি স্বাধীনতাও বিপন্ন? ১৫২
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কুফরী মতবাদ ১৫২
স্বাধীনতার রক্ষক কি ভারত? ১৫৩
ভারতপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ ১৫৪
স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন ১৫৪
ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় শেখ হাসিনার রাজনীতির সমর্থন ১৫৫
ভারতের বৈরী আচরণ ১৫৮
ভারতের আগ্রাসী নীতি ১৬১
বাংলাদেশে র'-এর সক্রিয় ভূমিকা ১৬২
উক্ত বইয়ের ভূমিকা হিসেবে লেখকের কথা ১৬৩
বাংলাদেশে র'-এর অপকীর্তি ১৬৫
'লজ্জা' ও তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি ১৬৭
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তৎপরতা ১৬৭
গোয়েন্দা সংস্থা'র যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ১৬৮
ক্লাইভ দোষী, নাকি মীরজাফর? ১৭০
ভারতের দোষ কী? ১৭১
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ১৭২
পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দাবি ১৭২
ঐক্য পরিষদের বলিষ্ঠ দাবিনামা ১৭৩

www.bjilibrary.com

ঐক্য পরিষদের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দাবি ১৭৪
ঐক্য পরিষদের দাবিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রশ্নাবলি ১৭৫
সংসদে হিন্দুদের আসন সংরক্ষণের দাবি ১৭৬
হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি ১৭৮
যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্য পরিষদের ব্যাপক কর্মতৎপরতা ১৭৮
বিরাট প্রশ্ন ১৭৯
আওয়ামী লীগের কারণেই উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্দশা ১৮০
লন্ডনে অবস্থান ১৮১
ঢেঁকির দশায় পড়লাম ১৮১
কয়েকটি নতুন বই লেখা হলো ১৮২
স্টাডি সার্কেল আমাকে যা দিয়েছে ১৮৪
'স্টাডি সার্কেল' বইটির বিশ্লেষণ ১৮৬
আমি জাতে লেখক বা সাহিত্যিক নই ১৮৬
আমার ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস ১৮৬
আমার লেখা বইয়ের বৈশিষ্ট্য ১৮৭
লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার ১৮৮
Expo Islamia ১৮৯
সম্মেলনস্থলের বিবরণ ১৯০
অতিথি বক্তাদের পরিচয় ১৯০
প্রধান বক্তার আলোচ্য বিষয় ১৯৩
মিস ইভনি রিডলি ১৯৪
সারা জোসেফ ১৯৪
ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ ১৯৫
আমার বক্তব্য ১৯৬
সম্মেলনে গান ও বিনোদন ১৯৭
গায়ক নাযীল ১৯৭
মা মুন্নীর সন্তানদের বর্তমান অবস্থা ১৯৮
লন্ডনে আতিথেয়তা ১৯৯
ম্যানচেস্টারে এ সফরের শেষ অবস্থান ২০০
এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান ২০১
আগামী বছরের কথা ২০২
ইংল্যান্ডে মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ২০৩

www.bjilibrary.com

নেভিগেটর সিস্টেম	২০৪
বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি	২০৫
পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিমদের বিরোধ	২০৫
আমেরিকার ইসলামফোবিয়া	২০৬
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আমেরিকার বর্তমান পলিসি	২০৮
ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন কৌশল	২০৮
ইসলাম নিজস্ব শক্তিতেই এগুচ্ছে	২০৯
দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে	২০৯
ঢাকায় রওয়ানা	২১০
ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে	২১১
বিমানে ৭ ঘণ্টা	২১১
দোহা বিমানবন্দরে	২১২
ঢাকার পথে	২১২
ঢাকা বিমানবন্দরে	২১২
তাফহীমুল কুরআন থেকে সংগৃহীত বিষয়ে লেখা বই	২১৩
আরেকটি নতুন বই	২১৬
আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকাল	২১৮
আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি	২১৮
ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আগ্রহ	২১৮
কুরআনের প্রেমিক	২১৯
একজন স্বকৃত (Selfmade) সফল ব্যক্তিত্ব	২২০
শ্বশুর সাহেবের সন্তানগণ	২২১
আমার ভাই-বোনদের সন্তানাদি	২২২
আমরা ৪ ভাই ও ৫ বোন ছিলাম	২২৩
আমার চাচাদের কথা	২২৫
ছোট চাচার কথা	২২৬
ছোট চাচার সন্তানাদি	২২৬
আমাদের পূর্বপুরুষ	২২৭
শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি	২২৭
২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি	২২৯
বিদেশে শেখ হাসিনার দেশবিরোধী অপপ্রচার	২৩১
হতাশ-হাসিনার ভারত সফর	২৩১

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনার গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন	২৩২
শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন	২৩২
সংস্কার আন্দোলনের প্রধান দাবি	২৩৩
২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব	২৩৩
চুরির উপর সিনাজুরি	২৩৫
এ হামলা নতুন নয়	২৩৬
বিবেকহীন আওয়ামী নেতৃত্ব	২৩৬
শেখ হাসিনার আরো একটি সর্বনাশা কীর্তি	২৩৬
অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফর্মুলাই কেয়ারটেকার সরকার	২৩৭
শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনারদের ওপর এত ক্ষিপ্ত কেন?	২৩৮
নির্বাচনে কারচুপি কীভাবে হয়?	২৩৯
১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা কীভাবে বিজয়ী হন?	২৪০
শেখ হাসিনার বিজয়ের প্রধান কারণ কি অন্য কিছু?	২৪১
প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের জন্য আবার অবরোধ	২৪২
বিজয়ের নিশ্চয়তা কে দেবে শেখ হাসিনাকে?	২৪২
বাংলাদেশে রাজনীতির গতিধারা	২৪৩
জেনারেল এরশাদের রাজনীতি	২৪৪
১৯৯১ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি	২৪৪
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন	২৪৫
শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি	২৪৫
স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ	২৪৬
কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টাদের ভূমিকা	২৪৭
বিচারপতি কে এম হাসানকে বিব্রত করে শেখ হাসিনা কি বিজয়ী হলেন?	২৪৮
শেখ হাসিনার ক্ষমতালিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটের আসল কারণ	২৪৮
গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ	২৪৯
সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন এক কথা নয়	২৫০
সংবিধানের ব্যাখ্যা	২৫০
সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘন	২৫১
বাংলাদেশে সংবিধান লঙ্ঘনের প্রথম দৃষ্টান্ত	২৫১
সংবিধান লঙ্ঘনের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	২৫২
সংবিধান লঙ্ঘনের তৃতীয় দৃষ্টান্ত	২৫২

www.bjilibrary.com

সংবিধান লঙ্ঘনের চতুর্থ দৃষ্টান্ত ২৫৩
সংবিধান লঙ্ঘনের পঞ্চম দৃষ্টান্ত ২৫৪
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই এখন বিপন্ন ২৫৪
শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ২৫৪
বাংলাদেশের মালিক কে? জনগণ নাকি শেখ হাসিনা? ২৫৬
কেয়ারটেকার সরকার আমলে শেখ হাসিনার মালিকসুলভ হুমকি ২৫৬
নির্বাচন অনুষ্ঠান কি সম্ভব হবে? ২৫৮
দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শেখ হাসিনার অবদান ২৫৯
শেখ হাসিনা যে যে যোগ্যতার অধিকারী ২৬১
নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব ২৬৩
বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৎপরতা ২৬৩
নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কি উপদেষ্টাদের দায়িত্ব? ২৬৪
উপদেষ্টাদের সদিচ্ছার দাবি ২৬৫
সেনাবাহিনীর খেদমত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ২৬৫
সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়েছেন ২৬৬
জনগণের মাঝে সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রতিক্রিয়া ২৬৭
শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া ২৬৮
চার উপদেষ্টার ভূমিকা ২৬৮
শেখ হাসিনা কি নির্বাচন চান? ২৭০
১৮ ডিসেম্বরে পল্টন ময়দানে শেখ হাসিনার ঘোষণা ২৭০
সংবিধান সংশোধনের দাবি ২৭১
নির্বাচন হতেই হবে ২৭২
শেখ হাসিনার হরতাল ২৭২
গৃহযুদ্ধের হুমকি ২৭৩
শেখ হাসিনার অন্তহীন দাবি ২৭৩
হাসিনার মহাজোটে এরশাদ ২৭৪
ইসলামী ঐক্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ইন্তিকাল ২৭৬
বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট ২৭৮
অতীতের রাজনৈতিক সংকট ২৭৮
বিগত পাঁচ বছরে শেখ হাসিনার ভূমিকা ২৭৯
বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ ২৮০
এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুপ্রবেশ ২৮১

www.bjilibrary.com

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পর বাংলাদেশের রাজনীতি	২৮২
আওয়ামী লীগের রাজনীতি সংবিধানবিরোধী	২৮২
বাংলাদেশে আদর্শিক দ্বন্দ্ব	২৮৩
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ	২৮৪
কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির উপযোগিতা	২৮৫
এ পদ্ধতির সংস্কার	২৮৫
আদর্শ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন	২৮৬
গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহাল রাখার উদ্দেশ্যে চুক্তি	২৮৭
এ দেশের প্রাচীন রাজনৈতিক দল	২৮৭
আওয়ামী লীগের প্রতি কয়েকটি পরামর্শ	২৮৮
ভারতের আধিপত্য কামনার দুটো উদাহরণ	২৯১
আওয়ামী লীগের উগ্র ও হিংস্র রাজনীতি	২৯২
শেখ হাসিনা কর্তৃক সেনাবাহিনী ও র‍্যাব প্রত্যাহারের দাবি	২৯৩
কারো উপরই শেখ হাসিনার আস্থা নেই	২৯৩
জেএমবি ইস্যুতে শেখ হাসিনার আজব স্ববিরোধী ভূমিকা	২৯৪
গৃহযুদ্ধের হুমকি	২৯৪
মহাজোট গঠন	২৯৫
মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত	২৯৬
উপদেষ্টাদের পণ্ডশ্রম	২৯৭
কেয়ারটেকার সরকার কি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হবেন?	২৯৭
জনগণের দৃষ্টিতে মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত	২৯৮
বাংলাদেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকগণের ভূমিকা	২৯৯
কূটনীতিকগণের নিকট প্রশ্ন	২৯৯
বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণ	৩০০
মহাজোট কি নির্বাচন প্রতিহত করতে পারবে?	৩০১
মহাজোট যা করতে সক্ষম	৩০২
বর্তমান সংকট সৃষ্টিতে শেখ হাসিনার অবদান	৩০২
জরুরি অবস্থা ঘোষণা	৩০২
বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের এত মাথাব্যথা কেন?	৩০৪
বিদেশিরা বাংলাদেশে কাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়?	৩০৫
গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য আগামী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ	৩০৬
জরুরি অবস্থার পর কী হবে?	৩০৬

www.bjilibrary.com

নতুন কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ ৩০৭
মহাজোটের টনক নড়েছে ৩০৭
কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ কি অনির্দিষ্ট হতে পারে? ৩০৮
সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ৩০৯
নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ৩০৯
কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ ৩১০
রাজনীতি কতদিন স্থবির থাকবে? ৩১১
সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক দল ৩১১
রাজনীতির মান কেমন হওয়া উচিত? ৩১২
বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপ ৩১৩
ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে এলাম ৩১৩
১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে
অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন ৩১৩
মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন ৩১৪
এ অধিবেশন না ডেকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত না? ৩১৪
এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা ৩১৫
উদ্বোধনী বক্তব্য ৩১৫
সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য ৩১৬
সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৩১৭
কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে
যুগপৎ আন্দোলন ৩১৭
১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালের আন্দোলন ৩১৮
মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন ৩১৮
অধিবেশনে সেক্রেটারি জেনারেলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ৩১৯
১৯৯৪ সালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩২০

www.bjilibrary.com

২৬১.

দেখা-সাক্ষাতের পালা

ষোল মাস কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে আত্মীয়-স্বজন ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সর্বস্তরের মানুষ আমার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসতে থাকেন। মুক্তি পাওয়ার জন্য মুবারকবাদ জানানো, জেলজীবন সম্পর্কে জানা ইত্যাদিই সাক্ষাতের সময় আলোচ্য বিষয় ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সরকার হাইকোর্ট থেকে আমার পক্ষে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। ঐ আপিলের রায়ের অপেক্ষায় আমাকে ধৈর্যধারণ করতে হচ্ছিল বিধায় আমার কর্মতৎপরতা ঐ পর্যন্ত সাংগঠনিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ রাখা যথাযথ মনে করেছিলাম।

তাই সাংবাদিকগণ সাক্ষাৎ করতে এলে আমি সীমিত বিষয়েই কথা বলতাম। কারণ, আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল সরকার কর্তৃক আমার নাগরিকত্ব স্বীকার না করা। হাইকোর্ট আমাকে বাংলাদেশের নাগরিক ঘোষণা দিয়ে আমার নাগরিকত্ব বাতিলের সরকারি আদেশকে অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের এ রায় বাতিল করার উদ্দেশ্যে সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করায় বিষয়টা অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। আমার সমস্যা রয়েই গেল।

দুটো বিশেষ ফোন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁদের সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাঁদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে কুশল বিনিময় করতে থাকলাম। অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ফোনে খবরাখবর নিয়েছেন। এটা তেমন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। তবে এমন দুজনকে আমি ফোন করেছিলাম, যাঁরা আমার ফোন পেয়ে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আমি ঐ দুটো বিশেষ ফোনের বিষয়কে উল্লেখযোগ্য মনে করি। তাঁদের একজন হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী, যাঁর নির্দেশে আমাকে প্রথমে শো-কজ ও পরে গ্রেফতার করা হয়। অপরজন হলেন আওয়ামী লীগনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, যিনি তথাকথিত গণ-আদালতে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে আমার বাড়িতে হেঁটে আসতে মাত্র সাত-আট মিনিট সময় লাগে এবং প্রতি ঈদুল ফিতরে তিনি ঈদের দিন হেঁটে এসেই ঈদ মুবারক জানাতেন। একসময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্কই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। মন্ত্রী হওয়ার পরও ফোনে যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমার সাথে যে আচরণ তিনি করেছেন, এর জন্য আমি তাঁকে দায়ী মনে করি না। তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করেছিলেন, আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পালন করা তাঁর কর্তব্য হিসেবেই গণ্য।

www.bjilibrary.com

তাঁর সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সুবাদে ফোন করে তাঁকে অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থায় পেয়েছিলাম। কাঁচুমাচু হয়ে তিনি বললেন, 'ভাই! আমাকে এ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।' আমি বললাম, 'আমি জেলখানায় আপনার মেহমান হিসেবে ভালোই ছিলাম। আপনাকে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আপনার সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আমি বহাল রাখব।'

এরপর শেখ হাসিনার শাসনামলে তিনি আমাদের মহল্লায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তাঁর বাড়ি ডেভেলপারকে সুউচ্চ বিল্ডিং করতে দিয়ে সাময়িকভাবে এ মহল্লায় থাকায় তাঁর সাথে আমার বন্ধুত্ব আরো গভীর হয়। মহল্লার মসজিদে জামায়াতে নামায পড়তে এলে নিয়মিত তাঁর সাথে দেখা হতো। আমার বাড়িতে বেশ কয়েকবার দেশের রাজনীতি নিয়ে তাঁর সাথে মতবিনিময় হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, পাকিস্তান আমল থেকেই জনাব আবদুস সামাদের (তখন 'আজাদ' শব্দ নামের অংশ ছিল না) সাথে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্র ধরে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাই ১৯৭৮ সালে আমি দেশে ফিরে আসার পর তিনি গোপনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বহুবার রাষ্ট্রদূতদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেলে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন হতো।

১৯৯১-এর নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিলে আওয়ামী ও বামপন্থি মহল আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার জোরদার করে। তখন লক্ষ করলাম, হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানে আমার সাথে হাত না মিলিয়ে এই কথা বলে তিনি পিছিয়ে গেলেন যে, 'পত্রিকায় ছবি এসে যাবে'। এরপর থেকে আমি অনেক অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখেও কাছে যাইনি।

তথাকথিত গণ-আদালতে তিনি যে জঘন্য ভূমিকা পালন করেছেন তা জানা সত্ত্বেও তাঁকে ফোন করে বললাম, 'আস্‌সালামু আলাইকুম! আপনার বিস্মৃত বন্ধু গোলাম আযম বলছি।' তিনি এতটা বিব্রতবোধ করলেন যে, কথাই বলতে পারছিলেন না। একটু সামলিয়ে নিয়ে সিলেটি ভাষায় বললেন, 'কেমন আছেন? শরীলডা বালানি?' আমি তাঁকে বেশিক্ষণ বিব্রত না করে এ কথা বলেই ফোন রেখে দিলাম যে, 'দলীয় নির্দেশে আমার বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করেছেন তাতে আমি মাইন্ড করিনি।'

১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে একসাথে আন্দোলন করেছে। সামাদ সাহেবের বাসায়ই জামায়াত ও জাতীয় পার্টির লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক হতো। সংসদ বয়কট করা হলেও সংসদ ভবনে তিন দলের এমপিদের বৈঠকাদি হতো। কিন্তু তিনি আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করেননি। হয়ত তাঁর সে মুখও ছিল না।

সাংগঠনিক সফর

১৯৯৩ সালের ১৫ জুলাই জেল থেকে মুক্তি পেলেও আমার নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত আমীরে জামায়াত হিসেবে প্রকাশ্যে কোনো তৎপরতা শুরু করা গেল না।

www.bjilibrary.com

বিদেশি নাগরিক আমীরে জামায়াত হওয়ার অভিযোগেই তো এত হৈ চৈ হয়ে গেল। তাই সুপ্রিম কোর্টে নাগরিকত্ব মামলার চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত সাংগঠনিক সফরও করা হচ্ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার শুনানি যে কবে হবে, তা অনিশ্চিত। চার মাস পার হয়ে নভেম্বর মাসেও শুনানির কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ৭ ডিসেম্বর থেকে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। জনসভা না করলেও জামায়াতের সাংগঠনিক কর্মসূচি উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় সফর করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকতে হলো।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন

৭ ডিসেম্বর (১৯৯৩) তিন দিনব্যাপী মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হলো। উদ্বোধনী দিনে আমার বক্তব্য কার্যবিবরণীতে সংরক্ষিত রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃত করছি :

"আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে আমীরে জামায়াত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ) ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, 'সকল নবী-রাসূল একই উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন, আর তা হলো– (১) সৎ লোক তৈরি এবং (২) তাঁদের দ্বারা আল্লাহর দীন কায়েম করা।' নবী-রাসূলদের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'তাঁরা সকলেই পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান মেনে চলেছেন এবং আল্লাহর আইন তখনই কায়েম হয়েছে, যখন জনগণ সাড়া দিয়েছে। শক্তির জোরে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনগণের উপর কোনো আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল শিক্ষা যে, জনগণের মর্জির বিরুদ্ধে তাদের উপর কোনো শাসক বা আইন চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।"

এদিক থেকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি বলেন, 'সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ রয়েছে। কারণ, ইসলামে সকল লোকে চাইলেও আল্লাহর আইন বদলানো যায় না।'

আমীরে জামায়াত দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ইসলামই হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। ইসলাম মানুষের মন দখল করতে চায়; ইসলাম সর্বদাই আইনের শাসন কায়েম করতে চায়, যা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।'

গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহে জামায়াতের বলিষ্ঠ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে আমীরে জামায়াত বলেন, 'জামায়াত আন্তরিকভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।' এ প্রসঙ্গে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস, ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আশা ছিল এরপর বিনা বাধায় গণতন্ত্র বিকশিত হবে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জনগণের সে আশা এখনো পূরণ হয়নি।'

www.bjilibrary.com

মুহতারাম আমীরে জামায়াত বলেন, 'গণতন্ত্রের অন্যতম দাবি হলো–

ক. রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র বর্তমান থাকা এবং
খ. রাজনৈতিক আচার-আচরণে সুস্থতা ও সহনশীলতা অনুসরণ করা।

কিন্তু এ দেশের রাজনীতিতে এসব গুণের অভাব তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।'

আমীরে জামায়াত দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে ক্ষমতাসীন বিএনপি, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এবং অন্যসব দলের প্রতি নিম্নলিখিত আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য আকুল আবেদন জানান–

১. অপরের আহূত সভা-সম্মেলনে বাধা দান ও হামলা করা,
২. অপরের আহূত সভাস্থলে অন্যায়ভাবে সভা ডাকা এবং সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে সন্ত্রাসী আচরণকে সহায়তা দান করা,
৩. কোনো রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণার দাবি করা এবং
৪. জাতীয় সংসদে পর্যন্ত অন্যকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, কথা বলতে বাধা দেওয়া এবং অরুচিকর কার্যকলাপ ও কথাবার্তা বলা।

মুহতারাম আমীরে জামায়াত জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ইসলাম ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আরো ধৈর্যধারণ করার জন্য আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে বিগত সময়ে এমনকি আমীরে জামায়াতকে গ্রেফতার করার পরও গাড়ি ভাঙচুর না করা এবং কোনো প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার তাওফীক দানের জন্য তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

উপসংহারে আমীরে জামায়াত বলেন, 'সত্যিকার দেশ গড়ার জন্য আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা অপরিহার্য। জামায়াত এ উদ্দেশ্যেই সংগ্রাম করে যাচ্ছে।' জামায়াতের এ আন্দোলনের ঐতিহ্যকে আরো সমুন্নত করার আহ্বান জানিয়ে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য শেষ করেন।"

সাংগঠনিক সফরের সিদ্ধান্ত

যথেষ্ট আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, রুকন ও কর্মীসম্মেলন এবং শিক্ষাশিবির উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় আমার সফরের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তবে প্রকাশ্য ময়দানের কর্মীসম্মেলনেও অংশগ্রহণ করা যাবে না।

১৯৯০ সালে ফরিদপুর সফরে বাধা দিয়ে এরশাদ সরকার আমার সাংগঠনিক সফরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসনের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোথাও ঘরোয়া বৈঠকেও যেন আমাকে যেতে দেওয়া না হয়।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদের পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকার আমলে সারা দেশেই আমি ব্যাপকভাবে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ঐ অভিযানে সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত, কোনো কোনো দিন আট-দশটি জনসমাবেশে হাজির হতে হয়েছিল এবং এক দিনে দু-তিনটি জেলায়ও যেতে হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

১৯৯২ সালের জানুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সময়েও কোনো সফর করা সম্ভব হয়নি। সে হিসেবে ১৯৯২ ও '৯৩ পূর্ণ দুটো বছর আমি সফর করিনি। এ দুই বছরের মধ্যে জেলেই ১৬ মাস কেটেছিল। ১৯৯৩-এর ডিসেম্বরে মজলিসে শূরায় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর সাংগঠনিক সফর শুরু হয়।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে সমাপনী ভাষণ

উক্ত অধিবেশনে সমাপনী ভাষণে যেসব জরুরি কথা বলেছিলাম, এর কয়েকটি কার্যবিবরণী থেকে উল্লেখ করছি :

১. বিগত দুই বছরে ইসলামী আন্দোলনের দুশমনরা জামায়াতে ইসলামী ও আমার নাম জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। জনগণকে আমাদের বিরুদ্ধে খেপানোর উদ্দেশ্যে ঘাদানি কমিটি সারা দেশ সফর করে যে অপপ্রচার চালিয়েছে, তাতে জামায়াতের নাম এমন লোকদের কানেও পৌঁছেছে, যাদের কাছে আমরা আগে পৌঁছতে পারিনি। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো জামায়াতের আসল পরিচয় সবার নিকট তুলে ধরা।

   আবু জাহল ও আবু লাহাবরা হজ্জের মৌসুমে মিনায় রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করতে গিয়ে গোটা আরবে তাঁর নাম পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তিনি যখন স্বয়ং গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তখন সবাই কৌতূহলী হয়ে তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল। এভাবে দুশমনদের অপপ্রচারও দাওয়াত পৌঁছানোর সহায়ক হতে পারে।

২. দায়িত্বশীলদেরকে নিয়মিত স্টাডি সার্কেল পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের মান আরো উন্নত হয়।

৩. জেলা ও থানা পর্যায়ের জামায়াতের দায়িত্বশীলগণের প্রতি প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিকট ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্য পৌঁছাতে পারলে তাঁরা জামায়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়ে যাবেন।

৪. ইসলামী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হলে জামায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে।

৫. ইসলাম ও জামায়াতের পক্ষে জনমত গঠন করাই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কাজ। এ উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দুটো কথা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরতে হবে–

   ক. আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করা ছাড়া জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে না। কুরআনের মতে, মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসনই সকল অশান্তির কারণ।

   খ. সৎ লোক এমনি এমনি তৈরি হয়ে যায় না। যেসব দল সৎ ও চরিত্রবান লোক গড়ে তোলার চেষ্টা করে না, সেসব দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে অশান্তিই বাড়তে থাকবে।

www.bjilibrary.com

সবশেষে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা, তাঁরই দরবারে ধরনা দেওয়া, তিনি ছাড়া অন্য কারো ভয়ে ভীত না হওয়া এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল

আমার নাগরিকত্ব মামলার প্রধান উকিল ছিলেন ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ। তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে শুনানি চলাকালে আদালতে যুক্তিগুলো যথাযথভাবে পেশ করার জন্য দুজনই সিরিয়াসলি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শুনানি শুরু হতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাঁরা ইসলামী আন্দোলনের সবাইকে আল্লাহর দরবারে খাসভাবে দোআ করার তাকীদ দিতে থাকলেন।

ব্যারিস্টার ইউসুফ সাহেব আমাকে বললেন, 'জীবনে আমি কোনো মামলার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য এত বেশি চাইনি। হাইকোর্টের শুনানিকালেও চেম্বারে বসে অনেকক্ষণ আল্লাহর দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে প্রাণভরে দোআ করার পর নথি দেখে যুক্তিগুলো যাচাই করেছি। প্রস্তুতির ব্যাপারে কখনো সামান্য অমনোযোগীও হইনি। তাই সবাইকে বেশি করে দোআ করতে বলেছি, যাতে প্রস্তুতিতে সামান্য ত্রুটিও না থাকে এবং আদালতে বক্তব্য পেশ করার সময় কোনো পয়েন্ট বাদ না পড়ে। আল্লাহর প্রতি তাঁর এ নির্ভরতা দেখে আমি তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা বোধ করি।

শুনানি বিলম্বিত হচ্ছে দেখে ব্যারিস্টার ইউসুফ হজ্জে গিয়েছিলেন। তখন মক্কা শরীফে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম দায়িত্ব পালন করছিলেন। হজ্জের সময় ব্যারিস্টার সাহেবকে সহযোগিতা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। শহীদুল ইসলাম বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম ডাইরেক্টর।

জামায়াতের পক্ষ থেকে মামলার তদারকি, উকিলদের সাথে যোগাযোগ ইত্যাদির দায়িত্ব জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের উপর ন্যস্ত ছিল। ব্যারিস্টার ইউসুফের সাথে মুজাহিদ সাহেবও হজ্জে গিয়েছিলেন।

মক্কায় কর্মরত শহীদুল ইসলাম থেকে জানা গেল, ব্যারিস্টার সাহেব ও মুজাহিদ সাহেব সব সময় একসাথেই ছিলেন। সৌদি আরবে কর্মরত সংগঠনভুক্ত যাঁরা ঐ বছর হজ্জ করেছিলেন তাঁরা মিনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় ঐক্যবদ্ধভাবে মুজাহিদ সাহেবের নেতৃত্বে সকল অনুষ্ঠান পালন করেছেন। সর্বত্রই মামলায় যেন আল্লাহ তাআলা বিজয়ী করেন, সেজন্য কেঁদে কেঁদে দোআ করা হয়েছিল। ব্যারিস্টার সাহেব সবার কাছে খাসভাবে দোআ চেয়েছিলেন।

যতদিন তাঁরা মক্কা ও মদীনায় ছিলেন, ততদিনই মামলায় সাফল্যের জন্য অব্যাহতভাবে দোআ করেছিলেন। পৃথকভাবে তো সব সময়ই দোআ করেছেন, মাঝে মধ্যে দীনী ভাইদের নিয়ে সমবেতভাবেও দোআ করেছেন।

ব্যারিস্টার সাহেবের আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নির্ভরতা দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হই। যতবারই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন, ততবারই তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগ লক্ষ করেছিলাম। উকিল হিসেবে একজন আল্লাহ্ওয়ালাকে পেয়ে আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ করেছি।

www.bjilibrary.com

২৬২.

কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নিরপেক্ষ সফল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলেই কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রভাব খাটাতে পারেনি। নির্বাচনের সময় প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ঐ নির্বাচন পরিচালনা করেছিলেন।

১৯৯০ সালের শেষদিকে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও পাঁচদলীয় বামজোট যুগপৎ আন্দোলন করেছিল। ঐ দাবিতে একটি অরাজনৈতিক নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পক্ষে সুস্পষ্ট অভিমত পেশ করা হয়েছিল। রাজধানীতে ঐ দাবিতে গণ-অভ্যুত্থান ঘটায় ৬ ডিসেম্বর (১৯৯০) জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯৯১ সালের নির্বাচন যদি এরশাদ সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হতো তাহলে ঐ নির্বাচনে বিএনপি এত আসন পেত না এবং সরকার গঠনের সুযোগও লাভ করতে পারত না। ১৯৯১ সালের বেগম জিয়ার সরকার সরাসরি কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলায় নির্বাচন অনুষ্ঠানেরই ফসল।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ দাবি ও গণ-অভ্যুত্থানের ফলে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে না থাকা সত্ত্বেও কেয়ারটেকার সরকারের উত্থাপিত ফর্মুলা অনুযায়ীই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নির্বাচনী ফলাফলে সকল রাজনৈতিক দলই সন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে সকল মহলই স্বীকৃতি দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে সবাই ধারণা করে নিয়েছিল, এ পদ্ধতিটি ভবিষ্যতেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সরকারি দল হিসেবে বিএনপির উপরই এটা করার দায়িত্ব ছিল। বিএনপি এ উদ্দেশ্যে সংসদে বিল পেশ করার মাধ্যমেই এ কাজটি সমাধা করতে পারত, কিন্তু তা করেনি।

১৯৯১ সালের মার্চ মাসে বিএনপি জামায়াতের নিঃস্বার্থ সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। জামায়াতে ইসলামী জুন মাসেই কেয়ারটেকার সরকার বিল জমা দেয়। ঐ বছরই আওয়ামী লীগও একই উদ্দেশ্যে একটি বিল দাখিল করে। এমনকি এরশাদের জাতীয় পার্টিও একই উদ্দেশ্যে একটি বিল জমা দেয়। সকল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বিল জমা দেওয়া সত্ত্বেও সরকারি দল এ বিষয়ে সামান্য আগ্রহী বলেও মনে হলো না। ১৯৯২ সালটি নীরবেই চলে গেল। কেয়ারটেকার সরকার বিলটি আলোচনার উদ্দেশ্যে সংসদে উত্থাপিতই হলো না।

www.bjilibrary.com

১৯৯৩ সালে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী সংসদে ও সংসদের বাইরে পৃথকভাবে দাবি জানাতে থাকে যে, সংসদে কেয়ারটেকার বিলের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক। সরকার দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে মুখ খুলতে বাধ্য হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সকল মহলকে বিস্মিত করে ঘোষণা করেন যে, তিনি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির প্রয়োজন মনে করেন না। যে পদ্ধতির বদৌলতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তারই আর কোনো প্রয়োজন বোধ করছিলেন না। অর্থাৎ তিনি পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে তাঁর দলীয় সরকারের পরিচালনায়ই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে চান, যাতে ক্ষমতায় স্থায়ী হতে পারেন। এ দেশে কোনো দলীয় সরকারের পরিচালনায়ই নির্বাচন নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়নি এবং কোনো দলীয় সরকারই নির্বাচনে পরাজিত হয়নি।

কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত

জাতীয় সংসদে তিনটি বিরোধী দলই (আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী) কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফলে এটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। বিরোধী দল যত জোরেশোরে এ দাবি জানিয়েছিল সরকারি দল ততোধিক দাপটের সাথে এর বিরোধিতা করেছিল। এমনকি তারা এ দাবিকে পাগলের প্রলাপ বা বালখিল্য বলে তাচ্ছিল্য দেখিয়েছিল, অথচ ১৯৯০ সালে বিএনপি অন্যান্য দলের সাথে এ দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন করেছিল।

তখনকার পরিস্থিতি জামায়াতে ইসলামীর জন্য বড়ই অস্বস্তিকর ছিল। কারণ, আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলে জামায়াতে ইসলামী এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না। যেহেতু কেয়ারটেকার সরকার ইস্যুটি জামায়াতেরই সৃষ্টি, সেহেতু এ ইস্যু নিয়ে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করতে থাকলে জামায়াত তাদের সাথে আন্দোলনে শরিক হতে বাধ্য। অথচ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের অধীনে কোনো আন্দোলনে জামায়াতের শরিক হওয়া স্বাভাবিক নয়। তাই জামায়াত অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গিয়েছিল।

প্যালেস্টাইনের হেবরন ইস্যু সংসদে

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসরাইলি হেবরন মসজিদে অগ্নিসংযোগ করার প্রতিবাদে মুসলিম উম্মাহ সারা বিশ্বে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বাংলাদেশেও ব্যাপক বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল। ১ মার্চ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ হেবরন ইস্যুতে নিন্দাপ্রস্তাব গ্রহণের দাবি জানালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'মুসলমানদের জন্য এত মায়াকান্না? হঠাৎ করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেলেন নাকি?' অন্যান্য বিরোধী দলও (জামায়াত ও জাতীয় পার্টি) নিন্দাপ্রস্তাবের দাবি জানিয়েছিল। সরকারি দল এ দাবি না মানায় সকল বিরোধী দল ওয়াকআউট করেছিল।

পরের দিন ২ মার্চ (১৯৯৩) সরকারি দল বিএনপি ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপ হয়েছিল; কিন্তু নাজমুল হুদার ক্ষমা প্রার্থনার দাবি সরকারি দল

www.bjilibrary.com

মেনে নেয়নি। তখন সংসদ ভবনে বিরোধীদলীয় নেত্রীর কক্ষে শেখ হাসিনা, মাওলানা নিজামী ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিরোধী দল আর সংসদে ফিরে যাবে না।

সাধারণ রাজনৈতিক ইস্যুতে সংসদে থেকে ওয়াকআউট করলে কিছু সময় পর আবার সংসদে ফিরে আসা হলেও সেদিন যে ইস্যুতে ওয়াকআউট করা হয়েছিল তা এমন গুরুতর ছিল, তারা এরপর ৭ মার্চ সংসদ মুলতবি হওয়া পর্যন্ত আর ফিরে আসেননি। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আওয়ামী লীগের মুসলমানিত্ব নিয়ে যে খোঁচামারা কথা বলেছেন, সরকারি দল এর সন্তোষজনক প্রতিকার না করা পর্যন্ত তাদের পক্ষে সংসদে ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

বড় রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি

১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর থানা আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আসনটি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যের মৃত্যুতে শূন্য হয়েছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর যে কয়েকটি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে, মৃত এমপি যে দলের ছিলেন উপনির্বাচনে সে দলের প্রার্থীই বিজয়ী হয়েছেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ স্বয়ং নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতেন, কিন্তু মুহাম্মদপুর আসনটি বিএনপি দখল করে নিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ ঘোষণা দেয়, বিএনপি সরকারের পরিচালনায় তারা আর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

ঐ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। নির্বাচনের পূর্বদিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চার দলের প্রতিনিধিদের বৈঠক ডেকেছিলেন। তিনি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে নির্বাচনের দিন নির্বাচন কমিশনের গাড়িতে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে সকল ভোটকেন্দ্রে যেতে চান। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়, পরদিন সকাল আটটায় চার দলের অমুক অমুক প্রতিনিধি নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় অফিসে হাজির হবেন। পরদিন যথাসময়ে তিন দলের প্রতিনিধিগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফের অফিসে হাজির হলেও বিএনপির কোনো প্রতিনিধি আসেননি। বিচারপতি আবদুর রউফ উপলব্ধি করেছিলেন, সরকারি দল নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে দেবে না এবং এ আসনটি কারচুপি করে দখল করে নেবে। তাই তিনি বিলম্ব না করে মাগুরা থেকে ঢাকা ফিরে আসেন। এর পূর্বে প্রতিটি উপনিবার্চনে তিনি নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করতেন এবং ভোট গণনার পর নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত উপস্থিত থাকতেন। এ ঘটনার কিছু দিন পরই বিচারপতি আবদুর রউফ প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে পদত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্বপদে যোগদান করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

শুরু হলো বয়কটের পালা

২০ মার্চ (১৯৯৪) অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের আসনটি সরকারি দল দখল করে নেওয়ার পর আওয়ামী লীগ এ সরকারের পরিচালনায় আর কোনো উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেনি, তারা কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করবে বলেও ঘোষণা দিয়েছিল।

৭ মার্চ সংসদ অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পরবর্তী দুই মাসের মধ্যেই আবার অধিবেশন বসার কথা। আওয়ামী মহলে যোগাযোগ করে জানা গিয়েছিল যে, তারা সংসদের পরবর্তী অধিবেশন থেকেই সংসদ বয়কট করে কেয়ারটেকার সরকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার কথাই ভাবছিলেন।

কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু জামায়াতেরই সৃষ্টি

বাংলাদেশের জন্মের পর যে কয়েকটি নির্বাচন দলীয় সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর কোনোটিই নিরপেক্ষ হয়নি। তাই ১৯৮১ সালেই জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছিল। ১৯৮৪ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পনের ও সাত দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ঐ বছর এপ্রিলে জেনারেল এরশাদ আন্দোলনরত জোট ও দলসমূহকে সংলাপের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। উভয় জোটের নেতৃবৃন্দের নিকট জামায়াত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে নির্বাচন দাবি করার প্রস্তাব দিলে তারা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। তখন যদি তারা সম্মত হতেন তাহলে এরশাদের পদত্যাগের জন্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে পরিচালিত জোট ১৯৯০ সালের অক্টোবরে কেয়ারটেকার ফর্মুলা মেনে নিয়ে যখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখনই স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বর সংবিধানে অন্তর্ভুক্তি ছাড়াই উত্থাপিত ফর্মুলা অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হয় এবং ১৯৯১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দেশে প্রথম একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকল মহল থেকে মন্তব্য এসেছিল, এমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ইতঃপূর্বে কখনো হয়নি। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হয়েছিল বলেই এমন নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে।

শেখ হাসিনা আশা করেছিলেন, ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টিতে বিভক্ত হয়ে গেলে তাঁর দল আরো বেশি আসন পাবে। তাই তিনি আশানুরূপ আসন না পাওয়ায় সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়ায় কারচুপির অভিযোগ তোলেননি; কিন্তু ২০০১ সালে অনেক কম আসন পাওয়ায় তিনি নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য মূল্যহীন। বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও ১৯৯১, '৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর মহাসংকট

শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করার ঘোষণা দেওয়ায় জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের হাতে থাকবে। জামায়াত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির উদ্ভাবক হলেও আন্দোলনে আওয়ামী লীগের পেছনেই পড়ে থাকতে বাধ্য হবে। রাজনৈতিক ও আদর্শিক দিক থেকে জামায়াতের জন্য এ অবস্থান মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আন্দোলনে জামায়াত যত বলিষ্ঠ ভূমিকাই পালন করুক, জনগণ জামায়াতকে আওয়ামী লীগের লেজুড় বলেই ধারণা করবে। ভারতবিরোধী হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর যে ইমেজ রয়েছে তা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জামায়াতের মতো একটি ইসলামী দলকে আওয়ামী লীগের মতো ইসলামবিরোধী দলের নেতৃত্বে আন্দোলন করতে দেখলে কিছু লোক এ ভুল ধারণাও করতে পারে যে, বর্তমান আওয়ামী লীগ হয়ত ১৯৭৫-পূর্ব আওয়ামী লীগের মতো ইসলামের দুশমন নয়।

১৯৯০ সালে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী যুগপৎভাবে কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করলেও সে আন্দোলন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল না। বিএনপি ইসলামী দল না হলেও জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী হিসেবে গণ্য নয়। তাই বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোনো আন্দোলনে জামায়াতের শরিক হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কোন্ ইস্যুতে আন্দোলন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সর্বসাধারণ এতটা হিসাব করবে না। আওয়ামী লীগের সাথে মিলে জামায়াত আন্দোলন করছে, এটাই বড় হয়ে চোখে পড়বে। তখনকার এ পরিস্থিতি জামায়াতের জন্য মহাসংকট বলেই তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল।

এ মহাসংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস

ঐ সময় মানসিক দিক দিয়ে আমি এত বেশি পেরেশান ছিলাম, সে কথা মনে হলে এখনও বেদনাবোধ করি। রাজনৈতিক আন্দোলনে কোনো সময় আমি এমন কঠিন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। যেহেতু কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু জামায়াতের সৃষ্টি, সেহেতু আওয়ামী লীগ এ দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে জামায়াতের পক্ষে নিশ্চুপ থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর জামায়াত আন্দোলনে শরিক না হলে রাজনৈতিক ময়দান থেকে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হবে।

এ মহাসংকট থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল ও সংসদে জামায়াতের পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, মাওলানা নিজামী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে একান্ত সাক্ষাতে মিলিত হবেন এবং কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি মেনে নেওয়ার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ জানাবেন। তিনি তাঁর বক্তব্য কীভাবে পেশ করবেন, সে বিষয়েও আমরা পরামর্শ করে ঠিক করেছিলাম।

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাওলানা নিজামীর একান্ত সাক্ষাৎ

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে জাতীয় সংসদনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তাঁর দফতরে একান্তে সাক্ষাৎ করে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, '১৯৯০ সালে এরশাদের আমলে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আপনার সাথে মিলে যুগপৎ আন্দোলন করেছি। আন্দোলন সফল হয়েছিল বলেই কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হয়েছে এবং সংসদ নির্বাচন আমাদের দাবি অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে আপনি সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে বিজয়ী হয়েছেন। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন না হলে আপনি কিছুতেই এত আসনে বিজয়ী হতে সক্ষম হতেন না। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির বদৌলতেই আপনার উত্থান।

আমরা আশা করেছিলাম, নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে আপনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সংসদে বিল উত্থাপন করে এ চমৎকার পদ্ধতিটি সংবিধানে সংযোজনের ব্যবস্থা করবেন। আমরা '৯১ সালেই বিল জমা দিয়েছি। অন্যান্য বিরোধী দলও এ উদ্দেশ্যে বিল জমা দিয়েছে। কিন্তু সংসদে এ বিষয়টি আলোচনার কোনো ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হলো না। বাধ্য হয়ে সংসদের বাইরে সকল বিরোধী দল এর পক্ষে দাবি জানিয়ে আসছে। জনগণ এ বিষয়ে অবহিত যে, বিরোধী দল কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা দাবি করছে আর সরকারি দল এ দাবিকে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করে চলেছে।

মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় তারা ঘোষণা করেছে যে, এ সরকারের পরিচালনায় আর কোনো নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবেন না। তারা এখন কেয়ারটেকার সরকার সংবিধানে সংযোজনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, এমনকি সংসদ বয়কট করারও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

বেগম জিয়ার মধ্যে এ গুণটি রয়েছে যে, কেউ দেখা করতে গেলে তিনি ধৈর্যের সাথে তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন। নিজামী সাহেবের উপরিউক্ত বক্তব্যও তিনি নিঃশব্দে শুনেছিলেন; কিন্তু তখনো কিছু বলেননি। নিজামী সাহেব একটু থেমে কথা অব্যাহত রেখেছেন।

'কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু ছাড়া আওয়ামী লীগের নিকট অন্য কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই। জনগণকে আকৃষ্ট করার মতো কোনো কর্মসূচিও তাদের হাতে আছে বলে মনে হয় না। কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি মেনে নিয়ে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায়, বিএনপিসহ সকল রাজনৈতিক দল এ দাবিতে একমত হওয়ায় এবং এর ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ দাবি বিশাল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এ দাবিতে আবার আন্দোলন হলে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুলসংখ্যায় সাড়া দেবে বলে ধারণা করা যায়।'

www.bjilibrary.com

'আমরা নিশ্চিত যে, কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন হলে আগামী নির্বাচনে আপনি আরো বেশি আসনে বিজয়ী হবেন। নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ কিছুতেই অধিকাংশ আসন পাবে না। তাই আপনি এ জনপ্রিয় ইস্যু আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেবেন না। আপনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে এটাকে সংবিধানে সংযোজনের ব্যবস্থা করুন। এত বড় একটা হাতিয়ার হাতছাড়া করবেন না।'

'আপনি জানেন, এ ইস্যুটি জামায়াতে ইসলামীর সৃষ্টি। এ ইস্যুতে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করলে জামায়াত তাতে শরিক হতে বাধ্য হবে। জামায়াত কিছুতেই আপনার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলনে যেতে চায় না। আপনি আমাদেরকে আওয়ামী লীগের দিকে ঠেলে দেবেন না। আমাদেরকে আপনার রাজনৈতিক দুশমনে পরিণত করবেন না।'

'আওয়ামী লীগ সংসদ বয়কটের ঘোষণা দেবে বলে মনে হচ্ছে। এর আগেই যদি কেয়ারটেকার সরকার ইস্যু নিয়ে সংসদে আলোচনা হবে বলে আপনি ঘোষণা দেন, তাহলে সংসদের আগামী অধিবেশনে আমরা যোগদান করব। তখন আওয়ামী লীগও সংসদে যেতে বাধ্য হবে। আপনি এ সিদ্ধান্ত নিলে আওয়ামী লীগ আপনার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আর কোনো জনপ্রিয় ইস্যুই পাবে না। আমি বড় আশা নিয়ে আপনার নিকট হাজির হয়েছি।'

বেগম জিয়ার জবাব

নিজামী সাহেবের দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর পূর্বসিদ্ধান্তে অটল থেকেছিলেন। তিনি বেশি কিছু বলেননি। নিজামী সাহেবের কোনো যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টাও করেননি। অত্যন্ত দাম্ভিকতার সুরে আঙুল উঁচিয়ে নিজ মুখের দিকে ইশারা করে উচ্চারণ করেছিলেন, "এ মুখ দিয়ে 'কেয়ারটেকার সরকার' উচ্চারণ হবে না।"

হতাশা ও দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজামী সাহেব আমাকে যখন রিপোর্ট দিয়েছিলেন তখন আমার পেরেশানি আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম, বেগম জিয়া এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত কেমন করে নিলেন? কার কুপরামর্শে তিনি কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলাকে শিশুসুলভ বলে ধারণায় পৌঁছালেন? এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন কীভাবে?

১৯৯৪-এর জুনের প্রথম সপ্তাহে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল। অধিবেশন শুরুর আগের দিন বেগম জিয়া এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী দলসমূহকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'জনগণ আপনাদেরকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে। আপনারা রাজপথে কেন আন্দোলন করবেন? যা বলার সংসদেই বলুন, তবে কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে সংসদে কোনো আলোচনা হবে না।'

এ কথা বলে তিনি বিরোধী দলকে রাজপথে আন্দোলন করতে বাধ্য করেছিলেন। সকল বিরোধী দলও সংসদ বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

www.bjilibrary.com

২৬৩.

হাইকোর্টে নাগরিকত্ব মামলার শুনানি ও রায়

হাইকোর্টে বিচারপতি ইসমাইলুদ্দিন সরকার ও বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর আদালতে ১৯৯২ সালের জুলাই মাসের ১৯ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে দশ দিন ও আগস্ট মাসের ২ থেকে ৫ তারিখ পর্যন্ত চার দিন মিলে সর্বমোট ১৪ দিন আমার নাগরিকত্ব মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগস্টের ৬ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত দুজন বিচারপতি মোট পাঁচ দিনে রায় দেন। সিনিয়র বিচারপতি ইসমাইলুদ্দিন সরকার আমার নাগরিকত্ব বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী অবৈধ ঘোষণা করেছেন। ফলে মামলার চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য প্রধান বিচারপতি তৃতীয় জজ হিসেবে বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর আদালতে মোট ১৭ দিন শুনানি চলেছিল। তিনি ১৯৯৩-এর ২১ ও ২২ এপ্রিল আমার নাগরিকত্বের পক্ষে রায় দেওয়ার ফলে এ রায়ই হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এ রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করায় মামলাটির শুনানি আবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ

সাধারণত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে কমপক্ষে পাঁচজন বিচারপতি থাকেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে যত আপিল করা হয় এর ফায়সালা এ বিভাগেই হয়ে থাকে। দুজন বা তিন জনের বেঞ্চ গঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় প্রধান বিচারপতিসহ পূর্ণ বেঞ্চও বসেন।

১৯৯৪ সালে যখন আপিল বিভাগে আমার নাগরিকত্ব মামলার শুনানি চলছিল, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আপিল বিভাগের অন্য চার জন বিচারপতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, এ টি এম আফজাল, মুস্তফা কামাল ও লতিফুর রহমান ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকত্ব মামলাটিকে যে গুরুত্ব দিয়েছে তাতে প্রধান বিচারপতিসহ ফুলবেঞ্চ গঠিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সঙ্গত কারণেই আমার মামলায় প্রধান বিচারপতি বেঞ্চে শামিল হননি। কারণ, প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে আমার নাগরিকত্ব সম্পর্কিত ফাইলটি স্টাডি করেছিলেন। সরকার গঠন ও জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসানোর ব্যবস্থা করার পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আমার নাগরিকত্ব বহাল করার ওয়াদা দিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর শিক্ষক আমার বন্ধু ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর নিকট দুঃখ প্রকাশ

www.bjilibrary.com

করে জানিয়েছিলেন যে কী কারণে তিনি নাগরিকত্ব বহাল করার ওয়াদা পূরণ করতে পারেননি। যেহেতু তিনি মামলার আগেই নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে অভিমত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন, সেহেতু এ মামলায় বিচারকের ভূমিকা পালন করা তাঁর জন্য সমীচীন ছিল না। তাই তিনি বেঞ্চে শামিল হননি। এ বিষয়ে 'জীবনে যা দেখলাম' ষষ্ঠ খণ্ডে ২৪৬ ও ২৪৯ নং কিস্তিতে বিস্তারিত বিরণ রয়েছে।

আপিল বিভাগের চার জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ছিলেন প্রিজাইডিং জজ। মামলায় আমার পক্ষ থেকে নিয়োজিত উকিলের দায়িত্ব পালনকারী চার জনের প্রধান ছিলেন ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ। তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। আরো দুজন সহকারী হিসেবে এডভোকেট শেখ আনসার আলী ও এ্যাডভোকেট নোয়াব আলী দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সরকারের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে আদালতে এটর্নি জেনারেল আমিনুল হক যুক্তি পেশ করেছিলেন।

আপিল বিভাগে শুনানি

হাইকোর্টে আমার নাগরিকত্ব মামলার রায় ঘোষণার এক বছর পর ১৯৯৪ সালের ৪ মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার শুনানি শুরু হয়। হাইকোর্টে এ মামলায় আমি বাদী ছিলাম, কিন্তু আপিল বিভাগে সরকার বাদী থাকায় সরকারপক্ষের উকিল এটর্নি জেনারেল প্রথমে যুক্তিতর্ক পেশ করেছেন। মে মাসের ৪ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে সাত দিন রায়ের বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য পেশ করেছেন।

ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ ১৭, ৩০ ও ৩১ মে এবং ১ জুন এটর্নি জেনারেলের যুক্তির জবাব দিয়েছেন। আদালত এটর্নি জেনারেলকে সর্বশেষ যুক্তি পেশ করার জন্য সুযোগ দিলে তিনি ৪ ও ৫ জুন বক্তব্য রেখেছেন।

এটর্নি জেনারেলের যুক্তির মর্মকথা

এটর্নি জেনারেল আমার নাগরিকত্বের পক্ষে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশ সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে যথার্থ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে' বলে যে যুক্তি পেশ করেছেন তার মর্মকথা হলো–

১. তিনি ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ দেশে অবস্থান করলেও অব্যাহত বসবাসের শর্ত পূরণ করেননি। তিনি ২২ নভেম্বর (১৯৭১) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান চলে যান। এ আচরণ দ্বারা তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন। বাংলাদেশের কনসেপ্টেরই তিনি বিরোধী ছিলেন।

২. আনুগত্যের সাথে নাগরিকত্ব সংশ্লিষ্ট। নাগরিকত্ব ব্যক্তির সত্তার সাথে সংযুক্ত থাকে। তার আচরণে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

৩. তিনি ইচ্ছে করলে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হিসেবে ব্রিটিশ বা অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট নিয়ে দেশে আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে পাকিস্তানের পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বিদেশি হিসেবে এসেছেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের নিকট পাকিস্তানি পাসপোর্ট সারেন্ডার করেননি।

৪. পাসপোর্ট নাগরিকত্বের চূড়ান্ত দলিল। তিনি বিদেশি পাসপোর্টধারী। তাই তার Natural Justice পাওয়ার কোনো অধিকারই নেই। দালাল আইনের অধীনে তাকে যে শো-কজ করা হয়েছে তাতেই Natural Justice-এর দাবি পূরণ হয়ে গেছে।

৫. তিনি এত বিলম্বে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন, তার মামলা খারিজযোগ্য হয়ে গেছে।

৬. জনগণ তার বিরুদ্ধে এত বেশি ক্ষিপ্ত, তার নাগরিকত্ব বহাল করা হলে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

আদালত আমার নাগরিকত্ব বহাল করার বিরুদ্ধে উপরিউক্ত যুক্তিসমূহকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন, যার জবাব ব্যারিস্টার ইউসুফকে দিতে হয়েছে।

এসব যুক্তি ছাড়াও এটর্নি জেনারেল আমার বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে প্রকাশিত অপপ্রচারের বস্তা আদালতে হাজির করেছিলেন, যা বিচারপতিগণ অপ্রাসঙ্গিক বলে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি হাইকোর্টে যেসব বক্তব্য রেখেছিলেন সেসব আপিল বিভাগে পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন নেই বলে বিচারপতিগণ মন্তব্য করা সত্ত্বেও তিনি সবকিছু পুনরাবৃত্তি করার দাবি করায় আদালত বাধ্য হয়ে তা শুনেছেন। বিচারপতিগণের মধ্যে বিচারপতি মুস্তফা কামাল এটর্নি জেনারেলকে সবচেয়ে বেশি জেরা করেছেন এবং তাঁর অনেক বক্তব্যকে মামলার সাথে সম্পর্কিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন। সর্বকনিষ্ঠ বিচারপতি লতিফুর রহমান কোনো জেরা করেননি। প্রিজাইডিং জজ ও অপর বিচারপতিও বিভিন্ন পয়েন্টে জেরা করেছেন। এটর্নি জেনারেল বেশ কয়েকবারই বিচারপতি মুস্তফা কামালের জেরায় দারুণভাবে নাজেহাল হয়েছেন।

এটর্নি জেনারেলের যুক্তির জবাবে ব্যারিস্টার ইউসুফ

আমি জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার সাড়ে ৯ মাস পর ১৯৯৩ সালের ১৫ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আমার নাগরিকত্ব মামলার শুনানি শুরু হয়। তাই ব্যারিস্টার ইউসুফের সাথে শুনানির পূর্বে, শুনানি চলাকালে এবং শুনানি শেষ হওয়ার পর ২২ জুন রায় ঘোষণা হওয়া পর্যন্ত বহুবার দেখা হয়েছে। প্রতিবারই তিনি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে দোআ করতে বলতেন :

১. শুনানির প্রস্তুতি যেন সন্তোষজনকভাবে নিতে পারি।

২. আদালতে যুক্তি পেশ করার সময় যেন কোনো পয়েন্ট বাদ না পড়ে এবং বিচারপতিগণকে যেন Convince করতে পারি।

www.bjilibrary.com

৩. চারজন বিচারপতি যেন নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে একমত হন। আপিল বিভাগের সর্বসম্মত রায়ের গুরুত্বই আলাদা। একজন বিচারপতিও যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে নাগরিকত্ব বহাল হলেও বিরোধীরা এটাকে পুঁজি বানিয়ে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ নেবে। সর্বসম্মত রায় হলে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ দোআ অব্যাহতভাবে করতে থাকা প্রয়োজন।

ব্যারিস্টার ইউসুফ এসব দোআ করার তাকীদ শুধু আমাকেই দেননি, এ মামলার ব্যাপারে আগ্রহী যার সাথেই দেখা হতো তাকেই দোয়া করতে বলতেন। তিনি এটর্নি জেনারেলের প্রতিটি যুক্তির এমন দাঁতভাঙা জবাব পেশ করেছিলেন, বিচারপতিদের চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রিজাইডিং জজ সিনিয়র বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান মাঝেমধ্যে ব্যারিস্টার ইউসুফ সাহেবকে বাহবা দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি বলতে থাকুন। আপনার বক্তব্য থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য ও বলিষ্ঠ যুক্তি পাচ্ছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আপনার যুক্তিগুলো অত্যন্ত সহায়ক। তাই আপনি যতক্ষণ বলতে চান বলুন।'

এটর্নি জেনারেলের পেশ করা যুক্তিসমূহের জবাবে ব্যারিস্টার ইউসুফ চার দিন যে দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন তা এখানে আলোচনা করা প্রয়োজনবোধ করি না। এটর্নি জেনারেলের প্রতিটি যুক্তি এমন চমৎকারভাবে তিনি খণ্ডন করেছিলেন যে, বিচারপতিগণ সর্বসম্মত হয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে রায় প্রদান করেছেন।

ঐতিহাসিক রায়

এ রায়কে ঐতিহাসিক হিসেবে গণ্য করেই জনাব শহীদুল ইসলাম (বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একজন ডাইরেক্টর) হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চারজন বিচারপতির দীর্ঘ রায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেছেন। রায় ইংরেজি ভাষায় হওয়ায় ঐ ভাষায়ই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। ১৩২ পৃষ্ঠার বইটির নাম 'Professor Ghulam Azam's Citizenship— The Historic Verdict of the Supreme Court of Bangladesh'.

সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদেরকে এত দীর্ঘ রায় পড়তে আমি বাধ্য করতে চাই না। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা ঐ বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। সবার জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, 'সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চারজন বিচারপতি সর্বসম্মতভাবে রায় দিয়েছেন, গোলাম আযম জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। ১৯৭৩ সালে সরকার যে নির্বাহী আদেশবলে তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করেছে তা বেআইনি ও অবৈধ।

এ রায়কে কয়েক কারণেই ঐতিহাসিক বলে আখ্যায়িত করা যায় :

১. ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তিন কিস্তিতে ৮৩ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছিল। প্রথম কিস্তির ৩৯ জনের মধ্যে আমার নাম রয়েছে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে সরকার নাগরিকত্ব বহালে ইচ্ছুকদেরকে স্বরাষ্ট্রসচিব বরাবর দরখাস্ত পেশ করার পরামর্শ দিয়েছিল। সে অনুযায়ী যারাই নাগরিকত্ব পুনর্বহালের জন্য আবেদন জানিয়েছিল তাদের সকলের

www.bjilibrary.com

দরখাস্তই মঞ্জুর করা হয়। শুধু আমার বেলায়ই তিন-তিনবার দরখাস্ত করা সত্ত্বেও নাগরিকত্ব বহাল করা হয়নি।

একমাত্র আমার ব্যাপারেই ১৯৮০ ও ১৯৮৮ সালে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়েছে। একমাত্র আমাকেই বিদেশি নাগরিকের মতো বাংলাদেশের নাগরিকত্ব মঞ্জুর করার দরখাস্ত দিতে বাধ্য হতে হয়েছে। এ দরখাস্ত না দিলে বাংলাদেশে অবস্থান করার কোনো বৈধ সুযোগ ছিল না বলেই আমি বাধ্য হয়ে দরখাস্ত করেছিলাম, কিন্তু সরকার আমার দরখাস্ত মঞ্জুর না করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে দেশে আসার সাড়ে ১৩ বছর পর আমাকে বিদেশি নাগরিক ও অবৈধভাবে অবস্থানকারী হিসেবে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল।

সরকারের সাথে দুই বছর আইনি লড়াই চলার পর আমার নাগরিকত্ব বাতিল করার ২২ বছর পর সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায়ের বলে আমি নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছি। এটা গোটা বিশ্বে অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

২. এটাও দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল ঘটনা যে, বাংলাদেশ সরকার এমন এক ব্যক্তিকে নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছে, যে ব্যক্তি জন্মসূত্রেই বাংলাদেশের নাগরিক। কোনো নাগরিক আইনের বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হলে প্রয়োজনে চরম শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে জন্মসূত্রে কোনো দেশের নাগরিক তার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কোনো সরকারের নেই। তাই সরকারের এ কাজকে বেআইনি ঘোষণা করে যে রায় দেওয়া হয়েছে তা ঐতিহাসিকই বটে।

৩. এটাও অত্যন্ত আজব ব্যাপার যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান থেকে শুরু করে গোটা সরকার কোনো ব্যক্তির পরিচয় ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও এবং ১৩ বছর সরকারের জ্ঞাতসারে দেশের রাজধানীতে তার নিজের বাড়িতে অবস্থান করা সত্ত্বেও হঠাৎ তাকে বিদেশি হিসেবে গ্রেফতার করা হয় এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় সরকারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে। এদিক দিয়েও ঐ রায়কে ঐতিহাসিক বলা যায়।

এ রায়ের সুফল

এ রায়ের সুদূরপ্রসারী সুফল রয়েছে। ১৯৭৩ সালে নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষবশত যে ৮৩ জন রাজনৈতিক নেতাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, সে ঘোষণাটিই অবৈধ হয়ে গেল। তাদের মধ্যে কারো নাগরিকত্ব সরকার বহাল না করে থাকলেও তিনি আইনত বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হয়ে যাবেন। তাদের কেউ এ পর্যন্ত দেশে ফিরে না এসে থাকলে এ রায়ের বলে নাগরিক হিসেবে তার দেশে ফিরে আসার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা রইল না।

ভবিষ্যতে কোনো সরকার কোনো অজুহাতেই জন্মসূত্রে অর্জিত নাগরিকত্ব বাতিল করার সাহস পাবে না। যদি কোনো হঠকারী সরকার এমন কাজ করে তাহলে এ রায়ের নজির দেখিয়ে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

এ রায়কে রেফারেন্স হিসেবে অন্যান্য দেশের কোর্টেও ব্যবহার হতে পারে।

www.bjilibrary.com

রায়ের সুখবর বয়ে এনেছেন মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম

১৯৯৪ সালের ৫ জুন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের শুনানি সমাপ্ত হওয়ার পর আদালত রায় ঘোষণা করার জন্য ২২ জুন তারিখ নির্ধারিত করে দিলে ঐ তারিখে স্বাভাবিকভাবেই এ রায় শোনার জন্য আদালতে অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। প্রায় শ' খানেক এ্যাডভোকেট ও ব্যারিস্টার ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতা-কর্মী মহাগুরুত্বপূর্ণ এ মামলার রায় জানার আগ্রহ নিয়ে আদালতকক্ষ ও চত্বরে ভিড় জমিয়েছিলেন।

আদালতে শুনানিকালে উভয়পক্ষের উকিলদের যুক্তি-তর্ক, বিচারপতিদের জেরা যারা শোনে তারা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারে যে, রায় কী হতে পারে। বিচারপতিদের মনোভাব তাঁদের চেহারা থেকেও অনুমান করা যায়। সে হিসেবে এ মামলায় আমার পক্ষে রায় যাঁরা কামনা করেছিলেন তাঁরা অনেকটা নিশ্চিতই ছিলেন যে, রায় আমাদের পক্ষেই হবে; কিন্তু কেউ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অধীর আগ্রহ নিয়ে সবাই চূড়ান্ত রায় জানার অপেক্ষায় ছিলেন।

আমি প্রায় নিশ্চিন্ত মনেই আল্লাহকে স্মরণ করছিলাম। আমার টিনের ঘরের বারান্দায় সুসংবাদের আশায় বুক বেঁধে বসে ছিলাম। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমির ডাইরেক্টর মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম সহাস্য বদনে হাজির হয়েছিলেন। মাওলানার চেহারা দেখেই অনুমান করেছি, সুখবর নিয়েই তিনি এসেছেন। তাঁর সাথে কোলাকুলি করলাম। জানা গেল, রায়ের সংবাদ আমার নিকট অবিলম্বে পৌঁছানোর জন্য মামলার তত্ত্বাবধায়ক জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তিনি রায় ঘোষণার সময় আদালতকক্ষেই উপস্থিত ছিলেন। আইনজীবী ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে আদালতকক্ষ সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে কক্ষের বাইরেও ভিড় ছিল বলে তিনি জানালেন।

মুবারকবাদের পালা

মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আমি বারান্দায় উপবিষ্ট থাকাকালেই ফুল দিয়ে সাজানো বিরাট এক টুকরি নিয়ে হাজির হয়েছিল আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের জামাতা সায়হাম টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মুহাম্মদ হুমায়ুন।

আমার জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছিলাম ২১ বছর পর, যার মধ্যে ১৬ বছর নিজ দেশেই সরকারের নিকট বিদেশি হিসেবে গণ্য ছিলাম। তাই বিরাট আনন্দের ব্যাপার। আত্মীয়-স্বজন ও আন্দোলনের সাথীদের অনেকেই আমার আনন্দে শরীক হতে এসেছেন এবং তাঁদের উল্লসিত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের তখনকার হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল মুবারকবাদ জানালে আমি তাঁকে বললাম, 'বাংলাদেশ সরকার আমাকে জোর করেই পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে এত দিন গণ্য করেছে। আজ থেকে পাকিস্তানের নাগরিকদের সংখ্যা একজন কমল এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের সংখ্যা একজন বাড়ল।'

www.bjilibrary.com

নাগরিকত্ব পুনর্বহাল আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হলেন

ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির ব্যাপক অপতৎপরতা ও তথাকথিত গণ-আদালতে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার রায় নিয়ে রাজধানী ঢাকায় তোলপাড় সৃষ্টি করার দিকে ইঙ্গিত করে আদালতে এটর্নি জেনারেল বেশ গুরুত্বের সাথে দাবি করেছিলেন, গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল করা হলে জনগণের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

জামায়াতে ইসলামী ঘাদানিক-এর মিছিল ও সমাবেশের চেয়ে বড় সমাবেশের আয়োজন না করলে হয়ত বিচারপতিগণের মনে পরিবেশের প্রভাব কিছুটা পড়তে পারত। নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে আন্দোলনকে প্রতিহত করার হিম্মত ঘাদানিক-এর ছিল না। তারা জামায়াতের মিছিল ও সমাবেশে হামলা করার সাহসও করেনি।

ঘাদানিক-এর দুর্বৃত্তরা কাপুরুষের মতো হামলা করে বিভিন্ন সময় চারজন আল্লাহর বান্দাহকে নিহত করেছে। তারা ১৯৯২ সালের ১৮ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে আগত দুজন ছাত্রকে বাসে ঢুকে গুলি করে পালিয়ে গিয়েছে। দুজন ছাত্রই মুন্সিগঞ্জ থেকে বাসযোগে সমাবেশে এসেছিলেন। সমাবেশ শেষে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে ওঠার পর তাদের উপর গুলি করা হয়। তারা হলেন– এইচএসসির ছাত্র শহীদ আতিকুল ইসলাম দুলাল ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ সাইজুদ্দীন। ২৫ মার্চ (১৯৯২) খুলনায় অতর্কিত হামলা করে এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র শহীদ আমিনুল ইসলামকে হত্যা করা হয়েছে। একই বছর ১৬ অক্টোবর নরসিংদীর শহীদ মাওলানা আবদুল মতীন মৃধা নিহত হয়েছেন।

আমার নাগরিকত্ব বহালের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে যাঁরা শহীদ হলেন, তাঁদের কথা পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং আল্লাহর দরবারে কাতর আবেদন জানাচ্ছি, যেন তিনি তাঁদেরকে শাহাদাতের পূর্ণ মর্যাদা দান করেন।

২৬৪.

নাগরিকত্ব বহালের দাবিতে আন্দোলনের গুরুত্ব

১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমার নাম ঘোষণার সাথে সাথে ইসলামবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বামপন্থি ও ভারতপন্থিরা ঘাদানিক (ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি) নামে আমার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং তথাকথিত গণ-আদালতে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে রাজধানীকে এতটা কাঁপিয়ে তুলেছিল যে, পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত উগ্র জনতার নিকট পরাস্ত হয়েছিল। এটর্নি জেনারেল এদিকে ইঙ্গিত করেই আদালতে জোর দাবি তুলেছিলেন যে, আমার নাগরিকত্ব বহাল করা হলে জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির আমার নাগরিকত্ব বহালের পক্ষে মিছিল ও মহাসমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলে প্রমাণ করেছিল, যত লোক এর বিরোধিতা করছে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক এর পক্ষে রয়েছে। আদালত যদিও আইন দ্বারা পরিচালিত, তবু পরিবেশের প্রভাব কখনো কখনো সুপ্রিম কোর্টের উপরও পড়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দিলে এর প্রেসিডেন্ট মৌলভী তমিজউদ্দীন খান গণপরিষদ ভাঙার বিরুদ্ধে মামলা করলে হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিলেও সুপ্রিম কোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ মুনীর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর এক সুধীসমাবেশে স্বীকার করে নিয়েছেন, বিরূপ পরিবেশের কারণে সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিলে তা বাস্তবায়ন করার সাধ্য কোর্টের ছিল না।

আমার মামলায় পরিবেশ দ্বারা আদালত প্রভাবিত হতো কি না জানি না; কিন্তু আমার পক্ষে বেগবান আন্দোলন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে যে অত্যন্ত সহায়ক ছিল, এ বিষয়ে দ্বিমত করার কোনো অবকাশ নেই।

ব্যারিস্টার ইউসুফকে সংবর্ধনা প্রদান

ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ যে দক্ষতা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছেন এর স্বীকৃতি জ্ঞাপন ও তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়ে সংবর্ধনা প্রদান ও আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসের সম্মেলনকক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মামলার আইনজীবীগণের মধ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ও এ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া এ্যাডভোকেট মাওলানা নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতের পক্ষ থেকে এ মামলার তদারকির দায়িত্ব জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ পালন করায় উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব আব্বাস আলী খান তাঁকে প্রাথমিক বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি সংক্ষেপে ব্যারিস্টার ইউসুফের প্রশংসা করে বলেছেন, 'আইন পেশায় যারা নিযুক্ত তারা যত যোগ্যতার সাথেই আদালতে তাঁদের মক্কেলের পক্ষে কাজ করেন না কেন, তারা চুক্তি করে ও দাবি জানিয়ে অর্থ আদায় করে থাকেন। পেশার দাবি এটাই। তাই এটাকে কেউ অসঙ্গত মনে করেন না। এদিক থেকে বিবেচনা করলে ব্যারিস্টার এ আর ইউসুফ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি কোনো সময়ই এ মামলাকে পেশার অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে মনে হয়নি। এ মামলাকে তিনি দীনের খেদমত মনে করে আবেগের সাথে পরিচালনা করেছেন। তিনি কখনো ইশারা-ইঙ্গিতেও পারিশ্রমিক দাবি করেননি। জামায়াতের পক্ষ থেকে সম্মানী হিসেবে কিছু দেওয়া কর্তব্য মনে করে যখন দিয়েছি তখন তিনি সৌজন্য হিসেবেই তা গ্রহণ করেছেন, আগ্রহ সহকারে নয়।' সংবর্ধনাসূচক এ কয়েকটি কথা বলার পর ব্যারিস্টার ইউসুফ বক্তব্য রেখেছিলেন।

সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পর ব্যারিস্টার ইউসুফ বলেছেন, 'জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় ওকালতি করেছি। কোনো মামলায় এ মামলার মতো আবেগ অনুভব করিনি। এ মামলার প্রস্তুতির সময় প্রত্যেক দিন যেভাবে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়েছি, এমনটা অন্য কোনো মামলায় করিনি। এ মামলায় আল্লাহ তাআলার সাহায্য পেয়েছি বলে গভীরভাবে অনুভব করেছি। অনেক মামলায় এমন হয়েছে যে, আদালতে শুনানির পর আফসোস

www.bjilibrary.com

করেছি যে অমুক পয়েন্টটি পেশ করা হয়নি বা অমুক কথাটি অন্যভাবে বললে বেশি ভালো হতো; কিন্তু এ মামলায় একদিনও এমন আফসোস করতে হয়নি। প্রত্যেক দিন শুনানির পর পরম তৃপ্তিবোধ করেছি যে, প্রতিটি পয়েন্ট অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পেশ করা হয়েছে।

'বিচারপতিগণ আমার যুক্তি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করায় আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, আমি প্রেরণা পেয়েছি এবং পরম আস্থার সাথে বক্তব্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি। বিচারপতিদের চেহারায় বিরূপ ভাব প্রকাশ পেলে মন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যুক্তি হারিয়ে যায়। এ মামলায় সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অত্যন্ত সন্তোষবোধ করেছি।

'একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে চাই। এ মামলার বিজয় ও সাফল্যের পেছনে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রস্তুতিপর্বে তো তিনি খুবই যোগ্যতার সাথে আমার সহকারীর দায়িত্ব পালন করেছেন। এমনকি শুনানি চলাকালেও তিনি মোক্ষম সময়ে আমার হাতে নোট পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি নোট না দিলে ঐ পয়েন্টটা হয়ত বলাই হতো না। তাঁর এ মূল্যবান সহযোগিতা কখনো ভোলার নয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে মুজাহিদ সাহেব এ মামলার তদারকির দায়িত্ব যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন তা আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি সবসময় আমার পেছনে লেগেই ছিলেন।

'সর্বশেষে বলতে চাই, এ মামলায় আল্লাহ তাআলার এত সাহায্য পাওয়ার কারণ হলো দেশ-বিদেশের অগণিত লোকের আন্তরিক দোআ। জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত লাখ লাখ লোক এ জন্য আল্লাহর দরবারে কেঁদেছেন। মক্কা ও মদীনা শরীফে আমার উপস্থিতিতেই শত শত মানুষকে দোআয় আবেগাপ্লুত দেখেছি।

'আমার সবচেয়ে বড় কামনা ছিল, যেন চারজন বিচারপতি, সর্বসম্মতভাবে নাগরিকত্ব পুনর্বহালের পক্ষে রায় দেন। হাইকোর্টের বিচারকদের মতো যেন রায়ের ব্যাপারে মতভেদ না হয়। সর্বসম্মত রায় না হলে বিজয়ের আনন্দ পূর্ণ হতো না। আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতেই এটা সম্ভব হয়েছে।'

ব্যারিস্টার ইউসুফের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ব্যারিস্টার ইউসুফ সাহেব সুধী হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমি তখন কারাগারে ছিলাম। মামলার উকিল হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি জেল অফিসে আমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। বিধি অনুযায়ী আমাদের ঐ সাক্ষাতের সময় সরকারি গোয়েন্দা পুলিশ অনুপস্থিত থাকায় আমরা দুজন একান্তে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপরত হয়েছিলাম। মামলা সংক্রান্ত আলোচনা শেষে তিনি আমাকে আবেগের সাথে এমন কথা বলেছেন, যার ফলে আমি তাঁকে ভালোবাসতে বাধ্য হয়েছি।

তিনি বলেছেন, 'আমি জামায়াতের রুকন সম্মেলনে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের জ্ঞানগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছি। সম্মেলনে যে শৃঙ্খলা দেখলাম,

www.bjilibrary.com

এমন শৃঙ্খলা অন্য কোথাও দেখিনি। হাজার হাজার লোকের সমাবেশে মঞ্চের বাইরে কোথাও থেকে কোনো সামান্য আওয়াজও শুনলাম না। আশপাশে কাউকে হাঁটাহাঁটি করতেও দেখলাম না। সবাই পিনপতন নীরবতায় দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণ শুনলেন। আমি সত্যিই বিস্মিত হলাম। আমার জন্য আরো বড় বিস্ময় নিয়ে এল মঞ্চ থেকে আব্বাস আলী খান সাহেবের দোআ ও সকলের সমবেত কান্নার করুণ আওয়াজ। খান সাহেবও কেঁদে কেঁদেই দোআ করছিলেন। আমার অজান্তে আমার চোখেও পানি এসে গেল। আপনার নাগরিকত্ব বহাল হওয়া ও বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোআ করার সময় কান্নার রোল পড়ে গেল। প্রিয়জনের মৃত্যুতে মানুষ উচ্চৈঃস্বরেও কাঁদে। মৃতের মাগফিরাতের জন্য দোআ করার সময় কাঁদতে বহুবারই দেখেছি। নেতার মৃত্যুতেও ভক্তরা কাঁদে। কিন্তু কোনো জীবিত নেতার জন্য এভাবে কাঁদতে এর আগে আমি কখনো দেখিনি। তাই এটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল।

'আমি গভীরভাবে অনুভব করলাম, আপনি অন্যান্য দলের নেতাদের মতো শুধু রাজনৈতিক নেতা নন আর ঐ সম্মেলনে উপস্থিত কেউ অন্যান্য দলের কর্মীদের মতো নয়। মুরীদরা পীর সাহেবকে যেমন ভালোবাসে তাঁরাও আপনাকে তেমনই ভালোবাসে। এ ভালোবাসা দুনিয়ার কোনো স্বার্থে নয়। তারা আপনাকে ইসলামের স্বার্থে ভালোবাসে। আমি তাদের ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাকে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম।'

তাঁর কথা শুনে আমার চোখও ছলছল করে উঠেছিল। আমি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলাম, আল্লাহর দিলে যে রহম আছে এর এক শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র তিনি সৃষ্টিকুলের মাঝে বিতরণ করেছেন। বাকি ৯৯ ভাগ তাঁর জন্যই রিজার্ভ রয়েছে। পশু যে সন্তানকে স্নেহ করে তাও ঐ এক ভাগেরই অংশ। হাদীস অনুযায়ী মানুষে মানুষে যদি আল্লাহর মাধ্যমে ভালোবাসা জন্মে তাহলে তা দুনিয়ার যাবতীয় ভালোবাসার চেয়ে বেশি গভীর হয়।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত। যারা এ জামায়াতে সক্রিয় হয় তাদের মধ্যে দীনের ভিত্তিতেই পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তারা আল্লাহকে ভালোবাসে বলে আল্লাহর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুনিয়ার কোনো স্বার্থ এ সম্পর্কের সাথে জড়িত নয়। এ বিষয়ে আমাদের নিকট সাহাবায়ে কেরামই আদর্শ নমুনা।

"আমি ঐ রুকনদের ভোটেই জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হয়েছি। আমার নাগরিকত্ব সরকার স্বীকার না করায় ইসলামী আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। আমি ময়দানে আমীরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছি না। তদুপরি অন্যায়ভাবে ৭০ বছর বয়সে আমাকে জেলে আটক করে রাখায় রুকনদের আবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ারই কথা।

আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখন থেকে আমিও আপনাকে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম। এ ভালোবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে।"

www.bjilibrary.com

তাঁর সাথে সেদিন গভীরভাগে আলিঙ্গন করেছি। মামলা চলাকালে তাঁর নিঃস্বার্থ এ ভালোবাসার পরশ অনুভব করেছি। আল্লাহর দরবারে দোআ করি, তিনি যেন তাঁকে এর জন্য উত্তম পুরস্কার দান করেন।

শুকরিয়া সমাবেশ

জামায়াতে ইসলামীর সিদ্ধান্ত ছিল যে, সুপ্রিম কোর্টের রায় নাগরিকত্বের পক্ষে ঘোষণা করার পরের দিনই বায়তুল মুকাররমের উত্তরদিকের প্রশস্ত মহাসড়কে শুকরিয়া সমাবেশের আয়োজন করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৩ জুন (১৯৯৪) জামায়াতের ঢাকা মহানগরী শাখা বিশাল মঞ্চ নির্মাণ করে সমাবেশের আয়োজন করেছে। ঘাদানিক গোষ্ঠী সমাবেশে যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য জামায়াত ব্যাপক নিরাপত্তাবেস্টনি গড়ে তুলেছিল। আদালতের রায় তাদের চেতনায় যে কঠোর আঘাত হেনেছে, এর প্রতিক্রিয়ায় মরিয়া হয়ে সমাবেশ বানচাল করার জন্য অপচেষ্টা চালানোর আশঙ্কা করেই জামায়াত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল।

১৯৭০ সালের পর এ দেশে কোনো উন্মুক্ত জনসমাবেশে যোগদানের এটাই ছিল আমার প্রথম সুযোগ। দীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রকাশ্যে জনসভায় দেশবাসীকে সম্বোধন করার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে আমি মহান মা'বুদের প্রতি শুকরিয়ার জযবায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার জীবনে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। যাকে সরকার ও বিরোধী দল এ দেশে থাকতে দিতেই নারাজ এবং জন্মসূত্রে নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যার নাগরিকত্ব ২৩ বছর পর্যন্ত বহাল করা হয়নি, সেই অবাঞ্ছিত(!) ব্যক্তির রাজধানীতে বিরাট সমাবেশে বক্তব্য রাখা ছোট ঘটনা নয়।

জামায়াত এ সমাবেশকে 'শুকরিয়া' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে। 'শুকরিয়া সমাবেশ'-এর বদলে 'বিজয় সমাবেশ' নাম দিলে রাজনৈতিক দিক থেকে অযৌক্তিক হতো না। তবে শুকরিয়া সমাবেশ নাম দিয়ে বিজয়ের জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়েছে, প্রতিপক্ষের পরাজয় ঘোষণা করা হয়নি।

আমি মঞ্চে আরোহণ করার পর বিশাল সমাবেশে উপস্থিত ইসলামী আন্দোলনের সকল পর্যায়ের দীনী ভাইদের আবেগ-উচ্ছ্বাস আমাকে অভিভূত করেছে। ঐ দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসে।

জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর তদানীন্তন আমীর জনাব এ টি এম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে আমার পূর্বে যাঁরা বক্তৃতা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জনাব আব্বাস আলী খান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

এ তথ্য জনাব আজহারুল ইসলাম থেকে পাওয়া গেল। তাঁর নিকট থেকে আরো জানা গেল, ২২ জুন আদালতের রায় ঘোষণার পরপরই আদালতপ্রাঙ্গণে উপস্থিত নেতা-কর্মীগণ শুকরিয়ার উদ্দেশ্যে দুই রাকাআত নামায আদায় করে মিছিল সহকারে আমার বাড়িতে এসেছেন এবং বাড়িসংলগ্ন পথে সমাবেশ করেছেন।

www.bjilibrary.com

জনাব আব্বাস আলী খান তাঁর বক্তৃতায় আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় তিনি ভারমুক্ত হলেন বলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানিয়েছেন। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন। তাই তিনি দীর্ঘকাল ভার বহন করার পর ভারমুক্ত হওয়ায় স্বস্তিবোধ করাই স্বাভাবিক ছিল।

আমি কারাগারে বন্দি থাকাকালে নাগরিকত্ব বহাল করার দাবিতে আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। তাই আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ায় তাঁর মধ্যে বিজয়ী বীরের অনুভূতি তীব্র হওয়ারই কথা। তাঁর বক্তব্যে সে অনুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে। মামলা সংক্রান্ত বিষয় তদারকির দায়িত্ব জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ পালন করায় আদালতের রায় পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর বক্তৃতায় তিনি তাঁর আনন্দে সবাইকে শরিক করেছেন বলে মনে হয়েছে।

শুকরিয়া সমাবেশে আমার বক্তব্য

দীর্ঘ ২৩ বছর পর প্রিয় দেশবাসীকে সম্বোধন করে মনের কথা প্রকাশ করার প্রথম মহাসুযোগ পেয়ে আবেগে উদ্বেলিত হওয়াই স্বাভাবিক। ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৪৬ সালে জনসভায় বক্তৃতা করার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। ১৯৫০ সাল থেকে চার বছর তাবলীগ জামায়াতের সমাবেশে অবিরাম বক্তব্য রেখেছি। ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর থেকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন পর্যন্ত ১৬ বছর সারা দেশ চষে বেড়িয়েছি এবং মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা করেছি। সে হিসেবে ২৫ বছর জনসভায় বক্তৃতা করে এসেছি। ২৩ বছর পর আবার বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে মনের অনুভূতি কেমন ছিল, তা উপলব্ধির বিষয়; ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মাত্র ২০ মিনিট প্রাণ খুলে কথা বলেছি। একপাশে সাংবাদিকদের বিরাট বাহিনীকে সারাক্ষণই লিখতে দেখেছি। বিশাল সমাবেশের শেষ প্রান্ত দেখা যায়নি। সকলেই তন্ময় হয়ে শুনেছেন।

আমার ঐ বক্তৃতা জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারি জনাব আবদুল কাদের মোল্লা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন। ঐ পুস্তিকার কভার পেজে লেখা রয়েছে 'সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায়ের পর রাজধানীতে শুকরিয়া সমাবেশে ২৩ বছর পর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত অধ্যাপক গোলাম আযমের ঐতিহাসিক ভাষণ'

ঐ পুস্তিকায় প্রকাশিত ভাষণ পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য হুবহু পেশ করছি :

"আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালীন। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আস্‌হাবিহী আজমাঈন।

শুকরিয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ মহাসমাবেশের সভাপতি, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সংগ্রামী দেশবাসী!

www.bjilibrary.com

আস্‌সালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ আমার দেশ। এ দেশেই আমার জন্ম, জন্ম আমার এ দেশের রাজধানী ঢাকায়ই। জন্মগত নাগরিকত্ব আল্লাহর দান। কে কোথায় জন্ম নেবে তার ফায়সালা তিনিই করেন। জন্মসূত্রের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারো নেই, তবু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। আজ আমার কোনো দুঃখ নেই। আল্লাহ্ তাআলা সম্মানের সঙ্গে আমার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

নাগরিকত্ব হচ্ছে সকল অধিকারের ভিত্তি। যদি নাগরিকত্বই স্বীকৃত না হয় তাহলে অন্য কোনো অধিকারই স্বীকৃত হয় না। এত দিন পর্যন্ত সরকার আমার নাগরিকত্ব স্বীকার করেনি, এ কারণেই আমার রাজনৈতিক অধিকারও ছিল না। সরকারের নিকট রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না, আর বাকি অধিকারের তো প্রশ্নই ওঠে না। আলহামদুলিল্লাহ! আজ আমি আপনাদের মতোই একজন নাগরিক। এ দেশের ১২ কোটি মানুষের মতোই আমি জন্মসূত্রে একজন নাগরিক।

আজ ২৩ বছর পর আমার প্রিয় দেশবাসীর সামনে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য হলো। ২৩ বছর পূর্বে এ দেশের মাঠ, ময়দান, রাজপথ আমার বিচরণক্ষেত্র ছিল। এ ২৩ বছরই আমার জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দুঃখ নেই, আল্লাহ্ তাআলা আবার আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনাদের সাথে শুকরিয়ায় শরিক হওয়ার জন্য আজ আমি হাজির হয়েছি। আজ আমি বেশি কথা বলতে চাই না। আজ সূচনা মাত্র। ইনশাআল্লাহ্, কথা বলার আরো সুযোগ আল্লাহ্ দেবেন, যদি তিনি বাঁচিয়ে রাখেন। আজ আমি অল্প ক'টি কথা বলেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।

২৩ বছরে যাঁদের হারালাম

আমার প্রথম কথা হলো, ২৩ বছর পর বিগত ২৩ বছরের দিকে আমি দৃষ্টি দিয়ে স্মরণ করছি আমার দেশের অনেক বড় বড় নেতাকে, যাঁরা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন নেতা ছিলেন এমন, আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলে যাঁদের সাথে মিলে আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে কাজ করেছি। সে দুজন আজ দুনিয়ায় নেই। তাঁরা হলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর আমি স্মরণ করছি আরো দুজনকে, এ দেশে গণতন্ত্র পুনর্বহাল করার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। সে দুজনও দুনিয়ায় নেই আজ। একজন জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী, আরেকজন প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান। শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের স্মরণ করছি। আরো কয়েকজনকে স্মরণ করছি, যাঁরা এ দেশে আল্লাহর দীন, আল্লাহর কালেমার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাঁদের অবদানকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁরা হলেন মাওলানা আতাহার আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ হাফেযজী হুজুর এবং শর্ষিনার পীর সাহেব মাওলানা আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ এবং আরো অনেকেই। ২৩ বছর আগে যাঁরা চলে গেছেন তাঁদের নাম আমি উল্লেখ করলাম না। গত ২৩ বছরে যাঁদের হারালাম শুধু তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আমি আমার দ্বিতীয় কথা শেষ করলাম।

www.bjilibrary.com

১২ কোটি মানুষের সুখ-শান্তিই একমাত্র কামনা

বাহাত্তর বছর বয়সে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি, আমার ডাক কবে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি কত দিন দুনিয়ায় আমাকে কাজ করার সুযোগ দেবেন তিনিই জানেন। আমার কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি নিজে দেশের বড় কিছু হবো, দেশের কোনো কর্তা হবো– এ ধরনের কোনো কামনা আমার নেই। কিন্তু একটি কামনাই আমাকে অস্থির করে তোলে। দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেব, আমার দেশের এই ১২ কোটি মানুষকে কী অবস্থায় আমি রেখে যাব! তাদেরকে সুখী ও নিরাপত্তাবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় রেখে যেতে পারব কি না, এটাই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা। আমার এটাই হচ্ছে সাধনা— কীভাবে এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করা যাবে আর কীভাবে এ দেশের জনগণকে সুখী করা যাবে। ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা-স্বাস্থ্য এগুলোর কারণে মানুষ কষ্ট পাবে না– এমন অবস্থায় যদি রেখে যেতে না পারি, যাওয়ার সময় যদি তাদেরকে সুখী-সমৃদ্ধশালী দেখে যেতে না পারি, তাহলে এই জীবনের সার্থকতাই বা কী? এটাই আমার একমাত্র ধান্দা।

জাতীয় ঐক্য ছাড়া দেশ গড়া যাবে না

এ কথাটা চিন্তা করা সহজ, কাজটা সবচেয়ে কঠিন। কীভাবে আমাদের দেশের মানুষ এ দুর্নাম থেকে মুক্তি পাবে যে, এটা গরিব এবং ভিক্ষুকের দেশ। সারা দুনিয়ায় এ বদনামের বোঝা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। এ দেশের মানুষের উন্নতি হোক এবং দুর্নাম ঘুচুক– এটাই আমার সবচেয়ে বড় সাধনা, সবচেয়ে বড় কামনা। এ বিরাট কাজটা এমনি এমনি হবে না। কোনো একটি দলের পক্ষেও সম্ভব হবে না। কোনো দলীয় সরকারও একাকী পারবে না। দেশে অনেক সমস্যা। তাই আমি আরো মনে করি, এ বিরাট কাজ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা রাজনৈতিক ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাসী রাজনীতি এবং উত্তেজনাপূর্ণ রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষান্ত করে সবাই সুস্থ রাজনীতি করতে রাজি হব। আমি মনে করি, দেশ গড়ার চিন্তা-ভাবনা যাদের আছে, তারাই রাজনীতি করেন। আর রাজনৈতিক ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের চেষ্টা-সাধনার উপরই জনগণের ঐক্য নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কোনো নেতৃত্ব সফল হবে না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেই সত্যিকারভাবে দেশের কল্যাণ করা সম্ভব। এ ঐক্যের জন্য আসুন, আমরা সকলে চেষ্টা করি।

অতীতে রাজনৈতিক অঙ্গনে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। আসুন, আমরা ঐসব অতীতের দুঃখের কথাগুলো ভুলে যাই। আমরা যারা রাজনৈতিক ময়দানে আছি, তারা সবাই আসুন একসাথে বসি, ভাব বিনিময় করি। দেশের সমস্যা কারো অজানা নয়। সবারই তা জানা। আসল কথা, সমাধানের পথ কী? কীভাবে সমাধান করব? এ সমাধানের জন্য আসুন আমরা একসাথে বসি, একসাথে চিন্তা করি, মতের বিনিময় করি। ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করা ছাড়া এ বিরাট কাজ কিছুতেই সমাধা করা সম্ভব নয় বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি দেশবাসী সকলের কাছে এ কামনাই করি। আপনারাও দোআ করুন, আমি এ চেষ্টাই করতে চাই, প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার দুয়ারে দুয়ারে আমি

www.bjilibrary.com

যেতে চাই, প্রত্যেক নেতার কাছে আমি ধরনা দিতে চাই। আসুন, আমরা একসাথে মিলে দেশকে গড়ি। ঐক্য ছাড়া দলীয় কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব নিয়ে আমরা শুধু ঝগড়া করতে পারব, কিন্তু দেশ গড়তে পারব না। এখানে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই।

বিরোধীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই

রাজনৈতিক ময়দানে যারা কাজ করেন, বিভিন্ন দলের মধ্যে তাদের মতের পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এ পার্থক্যের কারণে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ভিন্ন ভিন্ন হয়। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয় এবং এক দলের সিদ্ধান্ত আরেক দলের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ কারণে আমাদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব দূর করতে হবে। আর দূর করার পথ এটাই যে, অতীতকে ভুলতে হবে। আমার বিরুদ্ধে যারা বহু বছর থেকে ব্যাপক অপপ্রচার করেছেন, আমি তাদের অপপ্রচারকে কিছুই মনে করি না। তাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করব না। তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, আসুন! আমরা একসাথে মিলে দেশ গড়ার চেষ্টা করি। আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে– ইচ্ছাকৃতভাবে দেশ ও জনগণের ক্ষতির কোনো চেষ্টা আল্লাহর রহমতে কোনো দিন আমি করিনি; যা ভালো বুঝেছি, দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য তা করেছি। এর পরেও মানুষের ভুল হয়, ভুল হতে পারে। কেউ আমার কাজকে ভুল মনে করতে পারেন। তার জন্য তাদেরকে আমি দোষী বলব না। নবী ছাড়া কে দোষী নয়? দোষ কম-বেশি সবারই আছে। তাই যারা আমার কোনো কাজকে ভুল মনে করেছেন, আমার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আমার কোনো কাজে ব্যথিত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, তাদের সবার কাছে জানাচ্ছি, আপনাদের এ বেদনার সাথে আমি শরিক, আমিও দুঃখিত। আমি আল্লাহর কাছে দোআ করি, কারো মনে দুঃখ না দিয়ে এবং কারো মনে দুঃখ না আসে এমনভাবে যেন কাজ করতে পারি– আপনারাও এ দোআ করবেন।

সর্বশেষে যে ঐক্যের কথা আমি আজ বলছি, এ ঐক্যের তো ভিত্তি চাই। ঐক্যের কথা সকলেই বলেন, অনেকেই বলেন। ঐক্যের একটা ভিত্তি প্রয়োজন। বিনা ভিত্তিতে ঐক্য কিসের উপর দাঁড়াবে? আমার দৃষ্টিতে ঐক্যের ভিত্তি দুটো। একটা রাজনৈতিক ঐক্য, আরেকটা আদর্শিক ঐক্য। রাজনৈতিক ঐক্য ও আদর্শিক ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা এ দেশের ১২ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি।

রাজনৈতিক ঐক্য

রাজনৈতিক ঐক্য মানে হচ্ছে, বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে যে বাংলাদেশ, এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করতে হবে। অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করছি, বিদেশ থেকে এসে কিছু লোক আমাদের দেশে এ কথা বলার সাহস পায় যে, '৪৭-এর সীমানা উঠিয়ে দিতে হবে। '৪৭-এর সীমানা উঠিয়ে দিলে বাংলাদেশ কোথায় থাকবে? '৪৭-এ ভারত ভাগ করে যে সীমানা ঠিক করা হয়েছিল, সে সীমানাই কি বাংলাদেশের সীমানা নয়? '৭১-এ কি সে সীমানার মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম

www.bjilibrary.com

হয়নি? এ সীমানার হেফাজত করা হলো রাজনৈতিক ঐক্যের পয়লা ভিত্তি। রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি এটাই। যারা এই সীমানা তুলে দিতে চায় তারা এ দেশের স্বাধীনতার রক্ষক হতে পারে না। যারা এই সীমানা তুলে দিতে চায় তারা এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না। আমি বিশ্বাস করি, দেশের দায়িত্বশীল সকল রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে একমত। বাংলাদেশের এ সীমানার ভেতরে, যে সীমানা '৪৭-এ হয়েছিল এবং '৭১-এ যে সীমানাকে নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- এ সীমানার হেফাজত করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব এবং এটা আমাদের রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্যই কি যথেষ্ট? রাজনৈতিক ঐক্য কখনো যথেষ্ট নয়। আদর্শিক ঐক্য ব্যতীত রাজনৈতিক ঐক্য ক্রিয়াশীল হয় না।

আদর্শিক ঐক্য

আমি অনেক ভেবে-চিন্তে তালাশ করে দেখেছি, তিনটি কথাই হচ্ছে আদর্শিক ভিত্তি- আল্লাহ্, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের মনিব, মা'বুদ, প্রভু সে আল্লাহ্ই আদর্শিক ঐক্যের পয়লা ভিত্তি। আল্লাহ্ মানবজাতির দিশারী হিসেবে, পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন, যুগে যুগে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন দ্বিতীয় আদর্শিক ভিত্তি। তৃতীয় আদর্শিক ভিত্তি হচ্ছে, আল কুরআন যা মানবজাতির জীবনবিধান হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর মাধ্যমে এসেছে। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর কুরআন—এর কোনোটাই জামায়াতে ইসলামীর দলীয় সম্পদ নয়, কোনো দেশের কিংবা কোনো দলেরও নিজস্ব সম্পদ নয়। এ সম্পদের ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে ঐক্য না হওয়ার আমি কোনো কারণ দেখি না।

আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করি যে, আমাদের দেশের প্রধান প্রধান দলগুলোর নেতৃবৃন্দ মুসলিম। তাঁরা নামায পড়েন, হজ্জ করেন, কুরআন-কিতাব অস্বীকার করতে পারেন না। নামায, হজ্জ এগুলো তো কুরআনেই আছে। তাঁরা এগুলো পালন করেন। সুতরাং কীভাবে আমি মনে করব যে, তাঁরা কুরআনকে পছন্দ করেন না? নিশ্চয়ই তাঁরা কুরআনকে বিশ্বাস করেন। তাই আমি তাঁদের নিকট আকুল আবেদন জানাই, রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আর আদর্শিক ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, যা বাংলাদেশের সংবিধানে রয়েছে, মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্ব এবং কুরআনের বিধান- এ ঐক্যের ভিত্তিকে যদি আমরা গ্রহণ করি, কাল থেকে আমরা দেশ গড়ার কাজ শুরু করতে পারি।

শেষকথা

বিদায়ের আগে জনাব আব্বাস আলী খান সাহেব, যিনি এতদিন ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে এই ভার বহন করেছেন, তিনি বয়সে আমার চেয়ে আট বছরের বড়। আমার বয়স ৭২ আর তাঁর বয়স ৮০ বছর। এ বয়সে তিনি যে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন, আমার কাঁধের বোঝা তাঁর কাঁধে নিয়ে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, এ সক্ষমতার জন্য আমি

www.bjilibrary.com

আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। আমি তাঁকে বয়সের দিক দিয়ে মুরব্বি মনে করি। আমি তাঁকে অনুরোধ জানাই যে তিনি আপনাদেরকে নিয়ে আমার জন্য দোআ করবেন, যেন আমার বাকি জীবন এদেশের কল্যাণের জন্য, এ দেশের জনগণের সমৃদ্ধি-উন্নতির জন্য ও সুখ-শান্তির জন্য ঠিকমতো কাজ করতে পারি এবং জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য আমি যে নিয়ত করেছি, সে নিয়ত যেন আল্লাহ তাআলা পুরা করেন। এই দোআ করার আবেদন জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

আল্লাহু আকবর। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ।"

২৬৫.

জামায়াতের মজলিসে শূরা

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরাই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। এমনকি গঠনতন্ত্র সংশোধন করার ক্ষমতাও এরই হাতে। সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এ সংস্থাটি জামায়াতের রুকনদের সরাসরি গোপন ভোটে নির্বাচিত।

গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কমপক্ষে বছরে দুবার এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে। প্রয়োজনে জরুরি বা বিশেষ বৈঠক হতে পারে। সাধারণত একটা বৈঠক বছরের মাঝামাঝি জুন-জুলাই মাসে এবং অপরটি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিকে মধ্যবর্ষ অধিবেশন ও দ্বিতীয়টিকে বার্ষিক অধিবেশন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

মধ্যবর্ষ অধিবেশনে প্রধানত যে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

১. বাইতুল মালের বিগত বছরের রিপোর্ট অনুমোদন ও প্রয়োজনে সম্পূরক বাজেট অনুমোদন।

২. কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের মুহাসাবা।

৩. তিন বছরে একবার আমীরে জামায়াতের প্যানেল নির্বাচন। জামায়াতের কেন্দ্র থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত নেতা নির্বাচনে কারো পদপ্রার্থী হওয়ার বিধান নেই। ভোটাররা গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোট দেন। যিনি সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পান তিনিই নির্বাচিত বলে ঘেষণা করা হয়। জেলা পর্যায়ে আমীর ও মজলিসে শূরার মেয়াদ ২ বছর। কেন্দ্রীয় আমীর ও মজলিসে শূরার মেয়াদ ৩ বছর। তাই প্রতি তিন বছরে মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশনে আমীরে জামায়াত নির্বাচনের জন্য তিনজনের প্যানেল নির্বাচিত করতে হয়। রুকনগণ এ তিনজনের একজনকে ভোট দেন। কোনো রুকন ইচ্ছা করলে এ প্যানেলের বাইরেও কাউকে ভোট দিতে পারেন।

www.bjilibrary.com

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনের এজেন্ডার প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নরূপ :

১. বার্ষিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পর্যালোচনা।
২. বাইতুল মালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুমোদন।
৩. রাজনৈতিক রিপোর্ট পেশ।
৪. পরবর্তী বছরের জন্য কর্মসূচি ও কর্মতৎপতার পরিকল্পনা গ্রহণ।
৫. পরবর্তী বছরের বাজেট অনুমোদন।
৬. বাজেটের অংক সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জেলার ক্ষমতা অনুযায়ী কোটা বরাদ্দ করা।
৭. অডিট রিপোর্ট পেশ।
৮. প্রতি তিন বছরে একবার কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনের পর কর্মপরিষদ গঠন, নির্বাচন কমিশনার ও কেন্দ্রীয় অডিটর নিয়োগ।

মধ্যবর্ষ ও বার্ষিক উভয় অধিবেশনে যেসব বিষয় এজেন্ডায় কমন থাকে তা নিম্নরূপ :

১. কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২. রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।
৪. প্রয়োজন হলে গঠনতন্ত্র সংশোধন।
৫. জাতীয় নির্বাচনে জামায়াতের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬. প্রশ্নোত্তর— শূরা সদস্যগণের প্রশ্নের জবাব প্রদান।

মজলিসে শূরার এজেন্ডায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইটেম

মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ ও বার্ষিক অধিবেশনের এজেন্ডায় নির্দিষ্ট বিশেষ আইটেমের তালিকা ও উভয় অধিবেশনে কমন যেসব আইটেম রয়েছে তা থেকে কয়েকটি আইটেম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি। অতুলনীয় সংগঠক মাওলানা মওদূদী (র) সংগঠনের শুরুতেই এমন কতক পদ্ধতি চালু করেছেন, যার ফলে সংগঠনে উপদল সৃষ্টি হতে পারে না, নেতৃত্বের কোন্দলে এক নামে একাধিক দলের সৃষ্টি হয় না, নেতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাওয়া যায় না, দায়িত্বশীলদের স্বচ্ছতায় সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ থাকে না এবং সংগঠনের তহবিল, আয়ের উৎস ও ব্যয়ের হিসাব অডিটযোগ্য থাকে।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের মধ্যে যারা অগ্রসর হয়ে রুকন হতে আগ্রহী হন তাদেরকে সংগঠন সম্পর্কিত সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হয়। এ সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী, যা বেশ কয়েক খণ্ডে বিস্তৃত।

১৯৪১ সালের ২৬ আগষ্ট লাহোরে যখন জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের সূচনা হয় তখনকার বিস্তারিত বিবরণ এবং মাওলানা মওদূদী (র) সর্বসম্মতভাবে আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর সংগঠনকে সর্বাবস্থায় সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে কয়েক দফায় যেসব মূল্যবান হিদায়াতি বক্তব্য দিয়েছেন তা কার্যবিবরণীর প্রথম খণ্ডে সংকলিত। জামায়াতের কেন্দ্রীয় অধিবেশনে মাওলানার পরবর্তী আরো সাংগঠনিক ভাষণ জামায়াতের স্থায়ী সাহিত্যের

www.bjilibrary.com

অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এসব সাহিত্য অধ্যয়ন করে রুকন হওয়ার ফলেই জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শ সুস্থ সংগঠন হিসেবে টিকে আছে। জামায়াতের সংগঠনে আজ পর্যন্ত কেউ ফাটল ধরাতে পারেনি। কেউ কেউ চেষ্টা করে বহিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু কাউকে ভাগিয়ে নিয়ে পাল্টা সংগঠন দাঁড় করাতে পারেনি।

মুহাসাবা পদ্ধতি

মাওলানা মওদূদীর শেখানো সাংগঠনিক পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মুহাসাবা পদ্ধতি। 'মুহাসাবা' শব্দটি আরবী। এর বাংলা অর্থ হিসাব-নিকাশ করা, হিসাব দেওয়া, হিসাব নেওয়া, অডিট করা ইত্যাদি। একই ক্রিয়ামূল থেকে ইহতিসাব শব্দটি গঠিত। এর অর্থ মূল্যায়ন, গণনা, অনুমান, ধারণা ইত্যাদি। কারো কাজ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে পর্যালোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করা অর্থে ইহতিসাব শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নিজের সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

সাংগঠনিক পরিভাষায় 'মুহাসাবা' হলো একে অপরের কাজের হিসাব নিয়ে হেয় কিংবা দোষী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য ছাড়া মহব্বতের সাথে সংশোধন করার নিয়তে দোষ ও ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, যাতে সংশোধন হওয়া যায়। যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে একে অপরকে দীনী ভাই হিসেবে বুঝিয়ে বলা বা ভুল ধরিয়ে দেওয়া। যার ভুল ধরা হয় তিনি যদি তার কাজ সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা দেন যে তার ভুল হয়নি, যিনি ভুল ধরেছেন তিনি বুঝতে ভুল করেছেন, তাহলে মুহাসাবাকারী সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। অথবা যার ভুল ধরা হয়েছে তিনি যদি ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন হতে রাজি হন, তাহলে আর কোনো অভিযোগ থাকে না। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক সাহিত্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

এ পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেন, 'কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। সংগঠনের দায়িত্বশীলের কোনো ভুল-ত্রুটি হলে যদি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে যার চোখে তা ধরা পড়ে, তার মনে অভিযোগ আকারে তা থেকে যায়। একসময় সে তা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করতে বাধ্য মনে করে। এভাবেই তা গীবতের আকার ধারণ করে। সংগঠনে আরো যারা তার সাথে একমত হয় তাদেরকে নিয়ে উপদল সৃষ্টি হয়ে যায়। এর পরিণামে সংগঠনে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। মুহাসাবা পদ্ধতি এ জাতীয় সকল সমস্যার পথ বন্ধ করে দেয়। জামায়াতের সর্বস্তরে এ পদ্ধতি চালু থাকায় আল্লাহর রহমতে এ সংগঠন সর্বপ্রকার অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে মুক্ত। কোনো সাংগঠনিক সমস্যা দেখা দিলে সহজেই তা সমাধান করা সম্ভব হয়।'

কমপক্ষে বছরে একবার সকল পর্যায়ে মুহাসাবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে যেকোনো সময় মুহাসাবা হতে পারে। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশনে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করা হয়। ঐতিহ্য অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমীরে জামায়াত নিজেকে মুহাসাবার জন্য পেশ করেন। এরপর নায়েবে আমীরগণ, সেক্রেটারি জেনারেল, সহকারী জেক্রেটারি জেনারেলগণ, বিভাগীয় সেক্রেটারিগণ, কর্মপরিষদ ও পরিষদের সদস্যগণের মুহাসাবা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

বাইতুল মাল রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট

জামায়াতের দলীয় তহবিলকে ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী 'বাইতুল মাল' বলা হয়। বিগত বছরের রিপোর্টের মাধ্যমে মজলিসে শূরা সদস্যগণ জানতে পারেন যে, বাজেট অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ব্যয় হয়েছে কি না, অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে এর কৈফিয়ত কী, জেলা থেকে কেন্দ্রে দেওয়ার জন্য যে নিসাব ধার্য করা হয়েছিল তা সংগ্রহ হয়েছে কি না। এসব প্রয়োজনীয় তথ্য এজন্য সরবরাহ করা হয়, যাতে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।

কেন্দ্রীয় অডিটর প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী জামায়াতের কেন্দ্রীয় বাইতুল মাল ও জেলা বাইতুল মাল অডিট করেন এবং এর রিপোর্ট মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশনে পেশ করেন। তিনি জেলাসমূহের বাইতুল মালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিধি অনুযায়ী রাখা এবং কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের ব্যাপারে স্বয়ং পর্যালোচনা করেন। অডিট রিপোর্টে তিনি বিভিন্ন মানের ভিত্তিতে জেলাসমূহের নাম উল্লেখ করেন, যাতে সকল জেলাই মানের দিক দিয়ে উন্নত হয়।

জামায়াতে ইসলামীতে বিনা রসিদে কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয় না এবং বিনা ভাউচারে কোনো টাকা ব্যয় করা হয় না। তাই তহবিল তসরুফের কোনো সুযোগ থাকে না।

আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ

জামায়াতের সূচনাকাল থেকেই এ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যে, মজলিসে শূরার অধিবেশনে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষে আমীরে জামায়াত ভাষণ প্রদান করেন। উদ্বোধনী ভাষণে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলনের ভূমিকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে আমীরে জামায়াত মজলিসে শূরা সদস্যগণকে এজেন্ডা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখার আহ্বান জানান। সমাপনী ভাষণে তিনি মজলিসে শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সেক্রেটারি জেনারেল সংগঠনের নির্বাহী প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টও মজলিসে শূরার নিকট পেশ করেন।

মজলিসে শূরার সকল অধিবেশনের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার স্থায়ী ব্যবস্থা রয়েছে। এসব কার্যবিবরণী পাকা রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। এ রেজিস্টার আমার 'জীবনে যা দেখলাম' রচনার বিরাট সহায়ক। আমি এ পর্যন্ত বেশ কয়েক কিস্তিতে রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এ কিস্তিতেও দিচ্ছি। মজলিসে শূরার এ কার্যবিবরণী দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতার নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলির বিশ্বস্ত বিবরণ।

কেউ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস লেখার চেষ্টা করলে এসব রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় তথ্য মজুদ পাবেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে

www.bjilibrary.com

কোনো তৎপরতা চালাতে পারেনি। কিন্তু ১৯৭২ সালে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' সংগঠনটি কীভাবে কাদের প্রচেষ্টায় নতুন করে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়ে পূর্ববর্তী কিস্তিতে লেখার সময় এ রেজিস্টারই আমার প্রধান উৎস ছিল। মরহুম মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহর লেখা 'সূচনাকালের ইতিহাস' থেকেও অনেক জরুরি তথ্য সংগ্রহ করেছি।

মধ্যবর্ষ অধিবেশন

১৯৯৪ সালের ২২ জুন সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমার নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার পর ১৫ থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত মজলিসে শূরার মধ্যবর্ষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে আমীরে জামায়াত হিসেবে প্রদত্ত আমার এবং তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নিজামীর বক্তব্য মজলিসে শূরার কার্যবিবরণী রেজিস্টার থেকে উদ্ধৃত করছি :

"১৫ জুলাই ১৯৯৪ সকাল ৯টায় আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন শুরু হয়। মুহতারাম সভাপতি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন উদ্বোধন করেন। ভাষণের শুরুতেই আমীরে জামায়াত দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে তাঁর নাগরিকত্বের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর তিনি ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও কর্মসূচির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন সার্বভৌমত্বের অধিকারী ও মানবজীবনের জন্য একমাত্র আইনদাতা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (স)-ই হচ্ছেন একমাত্র আদর্শ নেতা এবং কুরআনই হচ্ছে আইনের উৎস। এসব সত্য ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই জানা ও শেখার সুযোগ হয়েছে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো জানার সুযোগ নেই।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'দীনের এ পরিচয় দেশবাসীর কাছে তুলে ধরা তাদেরই দায়িত্ব, যারা এটা জানতে ও বুঝতে পেরেছেন। আর জামায়াতে ইসলামী এ কাজই করে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দাওয়াতই পেশ করে থাকে। অতঃপর যারা এ দাওয়াতে সাড়া দেন তাদেরকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সাথে সাথে জামায়াত সমাজসেবা ও সমাজসংস্কারের কাজও করে থাকে, কিন্তু পত্রিকায় জামায়াতের রাজনৈতিক তৎপরতার খবরই কেবল প্রকাশিত হয়। ফলে জামায়াতের অনান্য কাজের খবর জনগণের কাছে পৌঁছে না; অথচ জামায়াত ৪ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করছে।'

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দীনকে বিজয়ী করা এবং আল কুরআনকে ক্ষমতায় বসানোই জামায়াতের টার্গেট; ব্যক্তি বা জামায়াতকে ক্ষমতায় আনা জামায়াতের মূল লক্ষ্য নয়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে কাজ করলে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা জামায়াতের ঈমানী দায়িত্ব।'

আল্লাহ তাআলা, রাসূল (স) ও কুরআনের বিরোধিতা সম্পর্কে আমীরে জামায়াত বলেন, 'এ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যেকোনো বিশ্বাস পোষণ করতে পারে, কিন্তু মুসলিম নাম ধারণ করে আল্লাহ তাআলা, রাসূল (স) ও কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই। এ ছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি অনুসারে অন্যের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার অধিকার কারো নেই।'

www.bjilibrary.com

এ প্রসঙ্গে বর্তমান বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই ইসলামের বিরোধিতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'বর্তমানে মানবজাতির সামনে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোনো আদর্শ নেই। এজন্য পাশ্চাত্য জগৎ আজ ইসলামের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। এ ছাড়া ইসলামবিরোধী মতবাদ সমাজতন্ত্রের পতনের পর পাশ্চাত্য দুনিয়ায় ইসলামভীতি আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এজন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের নতুন রূপ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নামে দুনিয়াকে ধোঁকা দিচ্ছে।'

মুহতারাম আমীরে জামায়াত পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং ইসলামী গণতন্ত্রের পার্থক্য ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইসলাম আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে জনগণকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়, কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত নয়। জামায়াতে ইসলামী আল্লাহর সার্বভৌমত্বের শর্তযুক্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং এ গণতন্ত্র কায়েমের জন্যই জামায়াত সংগ্রাম করে আসছে।'

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামায়াত দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবিতে সংসদ অধিবেশন বর্জন এবং এ ব্যাপারে সরকারের অযৌক্তিক ও অনমনীয় ভূমিকার ফলে সৃষ্ট সংকট ও অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, '১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন আন্তর্জাতিকভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে সুসংহত করার লক্ষ্যেই কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে এবং এতেই সরকারের মেয়াদ পূর্ণ করে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ধারা নিশ্চিত হতে পারে।'

মুহতারাম আমীরে জামায়াত কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি মেনে নিয়ে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার সুনাম অর্জনের জন্য বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সেক্রেটারি জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতা মূলত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে : ১. অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি এবং ২. ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন।'

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এ দাবি মূলত জামায়াতেরই দাবি এবং জামায়াতই সর্বপ্রথম বর্তমান সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল জমা দিয়েছে। প্রথমে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এ বিল সমর্থন করেনি; কিন্তু বর্তমানে এ দাবিতে তারাও আন্দোলন করছে।' এ আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, হেবরন মসজিদে মুসল্লিদেরকে গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেছিল। পরবর্তী সময়ে মাগুরার উপনির্বাচনে

www.bjilibrary.com

বিএনপির পক্ষ থেকে যে ব্যাপক কারচুপি ও ভোট ডাকাতি করা হয়েছে তার প্রতিবাদে উক্ত ওয়াক আউট অধিবেশন বর্জনে রূপ নেয়। সে সময়ে বিএসএস-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী কেয়ারটেকার সরকার সম্পর্কে যে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন তা পরিস্থিতিকে জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ ঘটনার আগে ও পরে জামায়াত নেতৃবৃন্দ সরকারি দলের মহাসচিবসহ দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সরকারি দলকে পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু সরকারি দল এতে সাড়া দেয়নি। ফলে সংসদ বয়কট স্থায়ী রূপ নিয়েছে।'

মাওলানা নিজামী বলেন, 'সরকার কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের দাবি মেনে না নিলে জামায়াতের জন্য আওয়ামী লীগের সাথে আন্দোলনে থাকা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এ আন্দোলনের ফলে তিনটি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে :

১. সরকার সমঝোতায় আসতে পারে;
২. সরকার সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দিতে পারে;
৩. তৃতীয় কোনো শক্তি ক্ষমতায় চলে আসতে পারে, যা কেউ কামনা করে না।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের আন্দোলনে জামায়াতকে তার নিজস্ব অবস্থানে থেকেই কর্মসূচি দিতে হবে এবং আন্দোলনের ময়দানে থাকা উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য জামায়াতের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; বরং এর পুরো দায়িত্ব হচ্ছে বিএনপির।'

২৬৬.

সারা দেশে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত

১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ঢাকায় যেমন আমাকে নিয়ে জনসভা করা হয়েছে, সারা দেশেই তেমনি জনসভা হওয়া প্রয়োজন। শীতকালের অপেক্ষায় থাকলে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় পাওয়ার পরদিনই রাজধানীতে বিরাট সমাবেশ করা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর আমীর মাওলানা আবু তাহের জুলাই মাসেই দেশের বৃহত্তম দ্বিতীয় মহানগরে জনসমাবেশের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত জানালেন। সে হিসেবে ২৬ জুলাই দিন ধার্য হয়।

নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনা করে বিমানে না গিয়ে সড়কপথে চট্টগ্রাম পৌঁছলাম। ঢাকায় জনসভা নিরাপদেই হয়ে গেল। ঘাদানি কেন্দ্রীয় কমিটি নাগরিকত্ব বহাল হওয়ার বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করল না। ২৩ জুন (১৯৯৪) অনুষ্ঠিত জনসমাবেশের বিরুদ্ধেও কোনো কর্মতৎপরতা দেখাল না। অথচ চট্টগ্রামে জনসভা ঘোষণার সাথে সাথে

www.bjilibrary.com

ইসলামবিরোধীদের গায়ে আগুন লেগে গেল। তারা নির্মূল কমিটির ব্যানারে জনসভাকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করল। প্রকাশ্যে হুমকি দিল যে, তারা জামায়াতকে জনসভা করতে দেবে না। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, আগের দিনই তারা মাঠ দখল করবে। আরো ঘোষণা দিল, তারা গোলাম আযমমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করবে।

তারা দেয়ালে সাঁটানো জনসভার পোস্টার ছিঁড়ে, মাইক পাবলিসিটিতে কোথাও কোথাও বাধা দিয়ে তাদের দৃঢ় সংকল্পের হিংস্র পরিচয় দিল। সর্বত্র আতঙ্ক সৃষ্টি করল, যাতে হাঙ্গামার ভয়ে বেশি লোক জনসভায় না আসে।

জামায়াতের প্রস্তুতি

চট্টগ্রামে রাজনৈতিক জনসভার ঐতিহাসিক স্থান হলো লালদিঘি ময়দান। ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানের যে মর্যাদা, চট্টগ্রামে সে মর্যাদার অধিকারী লালদিঘি। এ ময়দানটি সরকারি মুসলিম হাই স্কুলের খেলার মাঠ। জামায়াত কর্তৃপক্ষ থেকে ২৬ জুলাই জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি নিয়েছে। পুলিশ কমিশনার চট্টগ্রাম মহানগর আমীর মাওলানা আবু তাহেরকে ফোনে বারবার বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করলেন যে, জনসভা মুলতবি করা যায় কি না। বিরোধী সন্ত্রাসী শক্তির আক্রমণাত্মক সক্রিয় তৎপরতায় তিনি বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করলেন।

জামায়াতকে জনসভা অনুষ্ঠানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে পুলিশ কমিশনার মাওলানা আবু তাহেরের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সাথে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার সংগ্রামী নেতা শাহজাহান চৌধুরী এমপিও ছিলেন। কমিশনার সাহেবের কাকুতি-মিনতির জওয়াবে জামায়াত নেতা বললেন, 'আমরা কোনো বেআইনি কাজ করছি না। জনসভা করা আমাদের বৈধ অধিকার। এ অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। সন্ত্রাসীরা সম্পূর্ণ অবৈধ তৎপরতা চালাচ্ছে। তাদেরকে দমন করার জন্য পুলিশ বাহিনী রয়েছে। তাদেরকে দমনের বদলে জামায়াতকে দমন করার চেষ্টা করছেন কেন? জামায়াত জনসভা করবে, আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিযুক্ত পুলিশ বাহিনী সন্ত্রাসীদেরকে দমনের দায়িত্ব পালন করবে— এটাই কাম্য।'

পুলিশ কমিশনার সাহেব এমপি সাহেবের দিকে অসহায়ভাবে তাকালেন। এমপি সাহেব বললেন, 'আপনি আমাকে জবাই করুন।' এরপর আর কোনো কথা চলে না। কমিশনার সাহেব বিমর্ষ হয়ে তাদেরকে বিদায় দিলেন।

লালদিঘি ময়দান জামায়াতের দখলে

চট্টগ্রাম মহানগর আমীর মাওলানা আবু তাহেরের নিকট থেকে এ বিষয়ে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেছি। অন্যথায় প্রায় বারো বছর পূর্বের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ স্মৃতি থেকে পেশ করা সম্ভব হতো না।

সন্ত্রাসীরা যাতে আগের দিন ময়দান দখল করতে না পারে, সে জন্য জনসভার পূর্ব দিন (২৫ জুলাই) দুপুরেই দুহাজার স্বেচ্ছাসেবকের এক বাহিনী ময়দান দখল করে নেয়।

www.bjilibrary.com

বিকেলে সন্ত্রাসীরা মিছিলসহ এসে ঢিল ছুড়তে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে দ্রুত তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

রাতে স্বেচ্ছাসেবকগণ ময়দানেই অবস্থান করলেন। শেষ রাতে তারা তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিলেন। এক মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুস সাত্তার আবেগময় দীর্ঘ দোয়া করলেন। সবাই কেঁদে কেঁদে মহান মালিকের নিকট জনসভা সফল করার জন্য এবং দুশমনদেরকে মোকাবিলা করার তাওফীকের জন্য কাতরভাবে দোয়া করলেন।

মহানগরীর অধিবাসীদের মাঝে ব্যাপক ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। পরদিন জনসভায় যাদের আসা স্বাভাবিক ছিল না, এমন অনেক লোকও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আসার সংকল্প প্রকাশ করল। দুশমনদের অপতৎপরতার খবর বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সংঘর্ষের আশঙ্কায় সভায় হাজির না হওয়ার বদলে জামায়াতের সমর্থকগণও বিরাট সংখ্যায় লালদিঘিতে আসবে বলে জানা গেল। ইসলামী ছাত্রশিবির ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাথে সম্পর্কিত সবাই এ জনসভায় যোগদান করা ঈমানী কর্তব্য মনে করল। জামায়াতের সকল দায়িত্বশীল জনসভার নিরাপত্তার সার্বিক ব্যবস্থা নিলেন।

লালদিঘির ঐতিহাসিক জনসভা

১৯৯৪ সালের ২৬ জুলাই লালদিঘির ময়দানে জনসভায় দীর্ঘ ২৩ বছর পর আমার ভাষণ দেওয়ার কথা। বিরোধীরা এ সভা কিছুতেই করতে দেবে না বলে ঘোষণা করায় এ জনসভার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেল। সমগ্র চট্টগ্রামের মানুষের দৃষ্টি এ জনসভার দিকে নিবদ্ধ। তাই এ জনসভা ঐতিহাসিক মর্যাদার অধিকারী।

যথাসময়ে বিকাল তিনটায় সুউচ্চ বিশাল মঞ্চ থেকে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভা শুরু হয়ে গেল। ময়দান ও এর তিনদিকে জনসমুদ্রের ঢেউ।

ওদিকে নিউমার্কেটে সন্ত্রাসীরাও সমবেত হয়ে হিংস্র দম্ভ প্রকাশ করছে। তারা জনসভায় আক্রমণ করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করতে থাকল। তারা যে সশস্ত্র তা অত্যন্ত দৃশ্যমান। তবু পুলিশ তাদেরকে প্রতিহত করল না। তাদের ও জনসভার মাঝখানে একটু ব্যবধানে পুলিশের দুটো গ্রুপ দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। জনসভার মঞ্চের পেছনে মাত্র শ'দেড়েক গজ দূরে কোতয়ালি থানা। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করার জন্য থানা বরাবর জামায়াতের একদল স্বেচ্ছাসেবক প্রস্তুত হয়ে রইল। তারা আশা করেছিল যে, পুলিশ সন্ত্রাসীদেরকে কাছে আসতে দেবে না। কিন্তু দেখা গেল, পুলিশের প্রথম গ্রুপের বাধা উপেক্ষা করে সন্ত্রাসীরা জনসভার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পুলিশের দ্বিতীয় গ্রুপকেও তারা অতিক্রম করল। স্বেচ্ছাসেবকগণ শাহাদাতের জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিল।

আমি পরে জানতে পারলাম যে, ময়দানে আমার বক্তৃতা চলাকালেই থানার সামনে জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবক ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ চলেছে। মঞ্চে দায়িত্বশীলগণ এ বিষয়ে অবহিত হলেও আমি মোটেই টের পাইনি যে, আমার পেছনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। কিছু গোলমালের আওয়াজ পাচ্ছিলাম মাত্র।

www.bjilibrary.com

বিশাল সমাবেশে, ডানদিকের পাহাড়ে, বাঁদিকের বাড়িঘরের ছাদে মানুষ আর মানুষ। আমার বক্তৃতা সবাই নিঃশব্দে শুনছে। জনসভায় কোথাও সামান্য চাঞ্চল্যও লক্ষ করিনি। পেছনে স্বেচ্ছাসেবকগণ জীবন বাজি রেখে জনসভাকে নির্বিঘ্নে চলার ব্যবস্থা করেছেন। এ বিষয়ে আমি জামায়াতের অফিসে ফিরে গিয়ে জানতে পেরেছি। জনসভাশেষে আমি নিরাপদে জামায়াত অফিসের দোতলায় পৌঁছলাম। দোতলায়ই মসজিদ। মাগরিবের নামাযের পর জানতে পারলাম, নিচতলায় শত শত আহত স্বেচ্ছাসেবকের চিকিৎসা চলছে। আরও জানলাম যে, আমাদের দুজন শহীদ হয়েছেন এবং দুশমনদের তিনজন নিহত হয়েছে।

নিচতলায় আহতদের দেখতে গেলাম। তাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। আর বাকি জামায়াতের যুবক কর্মীগণ। যারা চিকিৎসা করছিলেন, তারা শিবিরের সাবেক সদস্য। একজন ডা. মুহাম্মদ রফিক ও অপরজন ডা. ফজলুল হক। ডাক্তার দুজনের কাছ থেকে আহতদের হাল-অবস্থা জানতে চাইলাম। দুজনই আশ্বাস দিলেন যে, কারো অবস্থায়ই আশঙ্কাজনক নয়। তারা অশ্রুসিক্ত নয়নে আনন্দ প্রকাশ করে জানালেন, স্যার! আহতদের কারো জখম পেছন দিকে নয়; দেহের সামনের অংশেই সবাই আহত। শুনে আমি গৌরব বোধ করলাম।

আহতদের সবার কাছেই গিয়ে খোঁজ-খবর নিলাম। জখমের বেদনাসত্ত্বেও তারা যুদ্ধের সাফল্যে তৃপ্ত হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমার জনসভা সফল হওয়ায় তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। মুজাহিদগণের এ ত্যাগ সারা দেশের জনশক্তির মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি করল। চট্টগ্রামের এ জনসভা জামায়াতের জন্য টেস্ট কেস ছিল। যদি দুশমনরা জনসভা পণ্ড করতে সক্ষম হতো, তাহলে সারা দেশে এর বিরূপ প্রভাব পড়ত। দুশমনরা সর্বত্র জনসভা বানচাল করার সাহস পেত। আল্লাহর ফজলে চট্টগ্রামের জনসভার সফলতার পর সারা দেশে কোথাও দুশমনরা চট্টগ্রামের মতো প্রকাশ্যে হামলা করতে হিম্মত করেনি।

আজ আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা ও গৌরবের সাথে ঐ দুজন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, যারা চট্টগ্রামে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। তারা হলেন শহীদ আবুল খায়ের ও শহীদ জাফর আহমদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের শাহাদাত কবুল করুন।

মাওলানা সরদার আবদুস সালামের আকস্মিক ইন্তিকাল

আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ মহব্বতের দীনী ভাই মাওলানা সরদার আবদুস সালামের ইন্তিকালের খবর পেয়ে এ বিষয়ে লিখতে বাধ্য হলাম।

২৫ মে ২০০৬ তারিখে আসরের নামাযের পরপরই মসজিদে জনাব আবদুল কাদের মোল্লা বিমর্ষ বদনে নিম্নস্বরে বললেন, সরদার আবদুস সালাম ভাই ইন্তিকাল করেছেন। চমকে উঠলাম। মোল্লাহ সাহেব বললেন, নরসিংদীতে প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন; সেখানেই হার্ট ফেল করেছেন।

www.bjilibrary.com

বেদনায় অন্তরে মোচড় বোধ করলাম। মাত্র এক মাস আগে নিজে এসে পঞ্চম মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দিয়ে গেলেন। জানি, তিনি হার্টের রোগী এবং মাত্র কয়েক মাস আগে হার্টের এনজিও প্লাস্ট করা হয়েছে। এ জাতীয় রোগীকে ডাক্তার খুব সাবধান হয়ে চলতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং দীর্ঘদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দেন।

মোল্লা সাহেবের কাছ থেকে জানলাম যে, কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে সরদার সাহেবকে কোনো প্রোগ্রাম দেওয়া হয়নি। নরসিংদী জেলার আমীর অগ্রসর কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দুই দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং তিনি সরাসরি মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ও মাওলানা রফীউদ্দীন আহমদকে মেহমান হিসেবে পেতে চান। দুজনই অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও দীনের খিদমতের ডাকে সাড়া দেন। মাওলানা রফীউদ্দীন আহমদ হাসপাতালে থাকায় সরদার সাহেবকেই দুই দিনব্যাপী ঐ শিক্ষাশিবিরের দায়িত্ব নিতে হয়।

নরসিংদীতে এ জাতীয় প্রোগ্রাম মাওলানা সাইয়েদ কামালুদ্দিন জাফরীর প্রতিষ্ঠিত জামেয়া কাসেমিয়ায়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আমি যতবার নরসিংদী গিয়েছি, আমার সকল প্রোগ্রাম, এমনকি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও ঐ মাদরাসায়ই হয়েছে। সরদার সাহেব প্রোগ্রামের বিরতির সময় সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিকাল চারটায় হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করলেন। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে তাঁকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত্যু সব অবস্থায়ই বেদনাদায়ক। হঠাৎ মৃত্যু অত্যন্ত বেশি হৃদয়বিদারক। মৃতব্যক্তি যেমন মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায় না, আত্মীয়-স্বজনও আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দেনা-পাওনা ও অন্যান্য দায়-দায়িত্বের নিষ্পত্তি করা যায় না। এ মৃত্যু যদি নিজের বাড়িতে হয় তাহলে পরিবার-পরিজনের কিছুটা সান্ত্বনা বোধ হতে পারে। কিন্তু অন্যত্র কোথাও হঠাৎ মৃত্যু ঘটলে সন্তানাদির আফসোস ও দুঃখের কোনো সীমা থাকে না। মৃত্যুর সময়ের সেবাটুকুও করতে না পারায় মনোবেদনা আরো বেড়ে যায়।

সরদার সাহেবের এ মৃত্যু সর্বদিক দিয়েই করুণ ও মর্মস্পর্শী। তাঁর বড় ছেলে রিয়াদ থেকে এসে কোনো রকমে দাফনে শরীক হতে পেরেছে। ছোট ছেলের শিক্ষাজীবন এখনও সমাপ্ত হয়নি। সরদার সাহেবের স্ত্রীও মাত্র পৌনে দুই বছর আগে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। ছোট মেয়েটিকে তিনি বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। পিতার মৃত্যু তাকেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ দেবে।

তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্য বড়ই মায়া লাগছে। বেচারারা মাত্র দুবছরেরও কম সময়ের মধ্যে পিতা-মাতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে গেল। পরিবারের মুরব্বী বলতে শুধু বড় ছেলে জিয়াউল হক। তারই বা বয়স কত? পিতার সংসারের বিরাট বোঝা বহন করার সাধ্য কি তার আছে? হাদীস অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলে পিতার স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ তাআলা এ পরিবারটির উপর রহম করুন। তিনিই তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন এবং বড় ছেলেকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করুন– এসব দোয়াই করছি।

www.bjilibrary.com

আমার ঘনিষ্ঠ সাথী

১৯৮১ সাল থেকে তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য। তখন থেকে ২০০০ সালে আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সময় পর্যন্ত ২০ বছর ইসলামী আন্দোলনে তাঁকে আমি ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে পেয়েছি। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকায় আমার ঘনিষ্ঠ সাথী হওয়ার পূর্বেও সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন বলে তাঁকে ভালো করেই জানতাম। তিনি যেকোনো দায়িত্ব অত্যন্ত আগ্রহসহকারে গ্রহণ করতেন এবং যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে তা পালন করতেন। কোনো সময় দায়িত্ব এড়ানোর উদ্দেশ্যে ওযর-আপত্তি করেননি।

তিনি অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, স্বল্পভাষী ও মৃদুভাষী ছিলেন। কোনো সময় বিতর্কেও তাঁকে উচ্চবাচ্য করতে দেখিনি। উত্তেজিত হয়ে কথা বলা তাঁর স্বভাবে ছিল না। অথচ তিনি আন্দোলনের ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, দৃঢ়সংকল্প ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। দীনের স্বার্থের ব্যাপারে কখনো দুর্বলতার পরিচয় দেননি। আমি তাঁকে 'নীরব মুজাহিদ' হিসেবে জানি। তিনি খুব সরব ছিলেন না, হৈ চৈ করতেন না, উচ্চবাচ্য করতেন না। অথচ তিনি ইসলামী আন্দোলনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তাই আমি তাঁকে একজন খাঁটি মুজাহিদ মনে করি।

তা'লীমুল কুরআন আন্দোলন

'জামায়াতের জনশক্তি বিরাট। কুরআন বিশুদ্ধ উচ্চারণে খুব কম লোকই তিলাওয়াত করতে পারেন। এমনকি রুকন বানানোর জন্যও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা শর্ত হিসেবে রাখা হয়নি। ছাত্রশিবিরেও জনশক্তি কম নয়। তাদেরও শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা শেখানো প্রয়োজন। তাই জামায়াতে ইসলামীর এ প্রকল্প হাতে নেওয়া প্রয়োজন।'

আমি জামায়াতের দায়িত্বে থাকাকালে ১৯৯৭ সালে মাওলানা সরদার আবদুস সালাম আমার নিকট উপরিউক্ত দাবি পেশ করেন। তখন তিনি কেন্দ্রীয় তারবিয়্যাত বিভাগের সেক্রেটারি ছিলেন। তারবিয়্যাতের দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি ঐ প্রস্তাব পেশ করেন।

কর্মীদের সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াতের প্রোগ্রাম যা চালু রয়েছে তা তিনি মোটেই যথেষ্ট মনে করেন না। তাছাড়া শুদ্ধ করে তিলাওয়াত শেখানোর প্রকল্প হাতে নিলে জামায়াতের বাইরেরও অনেকে শেখার সুযোগ পাবেন। তাই এ প্রকল্প গ্রহণের জন্য তিনি বারবার দাবি জানাতে থাকেন।

তাঁর প্রস্তাবের গুরুত্ব অনুভব করা সত্ত্বেও আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করলাম। অল্প সময়ে শুদ্ধ করে কুরআন শেখানোর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি দেশে চালু আছে। কোন্ পদ্ধতি সহজ ও বেশি উপযোগী সে বিষয়ে কোনো তথ্য আমার জানা ছিল না। আমাদের রুকনদের মধ্যে শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের যোগ্য লোক আছে কি না তাও জানতাম না। ইসলামী আন্দোলনের বাইরের লোক দিয়ে এ প্রকল্প চালু করতে চাইনি। কারণ, শুদ্ধ করে কুরআন শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রথমে একদল শিক্ষক তৈরি করতে হবে– আন্দোলনরতদের মধ্য থেকে যাতে এ প্রকল্প সারা দেশে চালু করা যায়। এ

www.bjilibrary.com

শিক্ষকদেরকে এ দায়িত্বও নিতে হবে যে, তারা যাদেরকে শুদ্ধ করে পড়া শেখাবেন তাদেরকে কুরআন বোঝার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন, কুরআনকে রাষ্ট্রক্ষমতায় স্থাপন করার জন্য ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হওয়া যে বড় ফরয, সে শিক্ষাও দেবেন।

সরদার সাহেব এ প্রস্তাব পেশ করার সময় এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার জন্য জানালেন যে, বেশ কয়েকটি কুরআন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদেরকে জামায়াতবিরোধী বানানোর অপচেষ্টাও চালাচ্ছে। তাই এ প্রকল্পের ব্যাপারে যোগ্য প্রশিক্ষক জোগাড়ের কথা তাঁকে বিবেচনা করতে বললাম।

তিনি প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক তালাশ করতে থাকলেন। জামায়াতের রুকনদের মধ্যে একাধিক লোক এ ট্রেনিং নিয়েছেন বলে তিনি জানতে পেরে আমাকে সন্ধান দিলেন। শেষ পর্যন্ত হাতিয়া থেকে মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহানকে এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাঁর ওখানকার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে কিছু সময় দেরি হলো। ১৯৯৮ সালের ২ জুলাই ঢাকায় প্রথম ব্যাচের ট্রেনিং শুরু হয়।

এ প্রকল্পের নাম প্রথমে তা'লীমুল কুরআন রাখা হয়। এটা জামায়াতের একটি বিভাগে পরিণত হয় এবং সরদার সাহেবকেই এর দায়িত্ব নিতে হয়। জামায়াতের তারবিয়্যাত বিভাগের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যাতে তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এ প্রকল্পটি চালু করতে পারেন। এরপর তারবিয়্যাত বিভাগের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক নাজির আহমদ। পরবর্তীতে এ কর্মসূচির সম্প্রসারণের জন্য তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন কায়েম করা হয়। সরদার সাহেব দীর্ঘদিন এর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লাহর রহমতে তা'লীমুল কুরআন একটি আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে। সারা দেশে এর কাজ বিস্তৃত। এটিএন বাংলা নামক টিভি চ্যানেলে মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহানের প্রোগ্রাম এখনও চালু রয়েছে। সরদার সাহেবের তিরোধান উপলক্ষে দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করছি যে, জামায়াতের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা আন্দোলন তাঁরই দাবিতে আমি শুরু করতে বাধ্য হয়েছি এবং তিনি ছাড়া এ বিষয়ে অন্য কেউ আমাকে তাকীদ দেননি। এ মহান কাজটি যতদিন চালু থাকবে তিনি এর সওয়াব পেতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

হঠাৎ মৃত্যু

সরদার সাহেব এভাবে হঠাৎ আমাদের থেকে চলে যাওয়ার বেদনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মনে পড়ছে যে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এভাবেই বিদায় হয়ে গেছেন। অসুস্থ অবস্থায় বেশ কিছুদিন শয্যাগত থাকলে বোঝা যায় যে রোগী বোধ হয় আর সুস্থ হবেন না। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব মনের দিক দিয়ে তার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। জনাব আব্বাস আলী খানের ইন্তিকাল এভাবেই হয়েছে বলে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক মনে হয়নি। কিন্তু জনাব আবদুল খালেক, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ও জনাব মুহাম্মদ ইউনুস সামান্য অসুস্থ হওয়ার পর আকস্মিকভাবেই ইন্তিকাল করেন। একেবারেই হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন মাওলানা মাহমূদ হোসাইন আল মামুন, অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, মাস্টার মুহাম্মদ,

www.bjilibrary.com

শফীকুল্লাহ, মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ্ ও মাওলানা সরদার আবদুস সালাম। আল্লাহ তাআলা যেন আর কোনো নেতাকে হঠাৎ উঠিয়ে না নেন, সে দোয়াই করছি।

আমি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৫৩ নং ওয়ার্ডের অধিবাসী। জামায়াতে ইসলামী ৫৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি জনাব আবদুল হান্নানও এভাবেই হঠাৎ ইন্তিকাল করেন।

আমীরে জামায়াত উত্তরবঙ্গ সফরে না থাকলে সরদার সাহেবের জানাযায় তিনি ইমামতী করতেন। তাঁর বদলে তিনি আমাকে জানাযায় ইমামতী করতে দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আমার সেক্রেটারি নাজমুল হকের নিকট জানলাম। ২৫.০৫.০৬ তারিখ শুক্রবার বায়তুল মুকাররমে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আমি মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হককে জানাযায় ইমাম হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 'আপনার উপর সরদার আবদুস সালামের হক আছে- তাই আপনিই জানাযা পড়াবেন।' খতীব সাহেব মসজিদের ভেতরে থেকেও নামাযে জানাযায় শরীক হতে পারতেন। কিন্তু তিনি ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়েই জানাযায় শরীক হলেন। তাঁর এ আচরণে আমি মুগ্ধ।

আমার আপন ভাগ্নিজামাই ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির সদস্য মাওলানা মুফাযযল হোসাইন খান থেকে জানলাম যে, সরদার আবদুস সালাম ও মরহুম অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় তাঁর সহপাঠী এবং তাঁরা খতীব সাহেবের সরাসরি ছাত্র। মুফাযযল সহপাঠীর মহব্বতে জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বায়তুল মুকাররম মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছিল।

সরদার সাহেবের তিরোধানে দেশ একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক আলেমে দীনকে হারাল, জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি একজন যোগ্য প্রশিক্ষক থেকে বঞ্চিত হলো, আর আমি একজন ঘনিষ্ঠ মহব্বতের দীনী ভাইয়ের সংসর্গ থেকে মাহরূম হলাম। আল্লাহ তাআলা তাঁর যাবতীয় দীনী খিদমত কবুল করুন এবং জান্নাতে তাঁকে মর্যাদা দান করুন। আমীন!

উপরে জামায়াতের যে কয়জন নেতার ইন্তিকালের কথা উল্লেখ করলাম, তাদেরকে বর্তমানে নাম থেকে সবাই চিনবেন। কিন্তু পরর্তীকালে যারা বই থেকে পড়বেন তাদের জন্য পরিচয় লেখা প্রয়োজন বোধ করছি।

১. জনাব আবদুল খালেক- জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাদেশিক সেক্রেটারি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ছিলেন।
২. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের খণ্ডকালীন আমীর ছিলেন।
৩. জনাব মুহাম্মদ ইউনুস- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ও এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।
৪. মাওলানা মাহমূদ হোসাইন আল মামুন- কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন।
৫. অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন- বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের এককালীন সভাপতি ও শেষে ইসলাম প্রচার সমিতির সভাপতি ছিলেন।

www.bjilibrary.com

৬. অধ্যাপক ইউসুফ আলী– কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, পরিকল্পনা বিভাগের সেক্রেটারি ও তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সেক্রেটারি ছিলেন।

৭. মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ– জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদের এমপি ছিলেন।

৮. মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ– চট্টগ্রাম বিভাগীয় সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাবেক সদস্য, ঢাকা মহানগর মজলিসে শূরা সদস্য। তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সাবেক উপাধ্যক্ষ।

৯. মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও শূরা সদস্য।

২৬৭.

দেশের সমস্যাসংকুল বর্তমান রাজনীতি

আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি যে, প্রিয় জন্মভূমির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সমস্যাসংকুল হয়ে পড়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই সমস্যা প্রচণ্ড জটিল আকার ধারণ করেছে। আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার উপরই দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তার নিশ্চয়তা নির্ভর করছে। তাই ধারাবাহিক আলোচনা মুলতবি রেখে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে লেখা অত্যন্ত জরুরি বলে বিবেচনা করছি।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভিত্তি

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত Indian Act of 1935 (১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন) অনুযায়ী এ দেশের জনগণ ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ইত্যাদি গঠনে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। ১৯৩৭ সালে ঐ আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ভোটার ছিলাম না বটে, কিন্তু ভোট কেন, ভোট কী, ভোটের ফলে দেশে কী হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা তখনই লাভ করেছি।

পৃথক নির্বাচনপদ্ধতিতে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের ভোটে মুসলমানদের প্রতিনিধি পৃথকভাবে নির্বাচিত হন। আর হিন্দুদেঃ ভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তখন অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মুসলিমদের নেতা হিসেবে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয় এবং শেরে বাংলা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৩৯ সালে আমি কুমিল্লা শহরে যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন কুমিল্লা জেলা ও শহরের মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। জানা গেল,

www.bjilibrary.com

আইনসভায় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাপন্থি সদস্যগণ শেরে বাংলার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে। টাউন হলে জনসভা হয়েছে। জনসভায় জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি এ্যাডভোকেট জহুরুল হক লিল মিয়া সভাপতিত্ব করেছেন। আব্বাকে তিনি বড় ভাই বলে ডাকতেন। তিনিও নবীনগর উপজেলার লোক। তাঁর বাসার কাছেই আমি লজিং থাকতাম। তাঁকে আমি চাচা ডাকতাম। তিনি আমাকে খুব আদর করতেন। ঐ জনসভার বক্তৃতা থেকেই আমার রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আমি মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যত কর্মসূচি দেওয়া হতো তাতে শরীক হতাম। রাজনৈতিক হাতেখড়ি আমার সেখানেই হয়েছে।

১৯৪৬ সালে আবার সকল প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে শুরু হযেছে। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষকে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ শাসকরা চলে যাবেন।

স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপ কী হবে, কারা শাসক হবে, কোন্ ধরনের সরকার কায়েম হবে- এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঘোষণা করে, ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান মিলে এক ভারতীয় জাতি। তাই গোটা ভারতবর্ষ একটি বিশাল স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এ রাষ্ট্রটি ধর্মনিরপেক্ষ হবে এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার দেশ শাসন করবে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি, যার মধ্যে ১০ কোটি ছিল মুসলমান।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, ১০ কোটি ভারতবাসী মুসলমান একটি আলাদা জাতি। তাই যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি সেখানে পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, যাতে মুসলিম জাতি তাদের জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে। এ ঘোষণার মূলভিত্তি ছিল নিম্নরূপ :

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর যেসব প্রদেশে কংগ্রেস পার্টির সরকার কায়েম হয়েছিল সেখানে সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিমদের সাথে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। এ কথা মুসলিম জাতির নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্রিটিশ সরকার বিদায় নেওয়ার পর নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যাগুরু ৩০ কোটি অমুসলিমদের ভোটে নির্বাচিত সরকারের অধীনেই ১০ কোটি মুসলিমদেরকে জীবন যাপন করতে হবে, ইংরেজ শাসনের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও ১০ কোটি মুসলমান স্বাধীনতার সুফল ভোগ করার সুযোগ পাবে না, প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের যে দুর্দশা ছিল, ইংরেজ সরকার চলে যাওয়ার পর তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই মুসলিম জাতির পৃথক রাষ্ট্র প্রয়োজন।

১৯৪৬ সালে সারা ভারতবর্ষে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে দেখা গেল, মুসলিম ভোটারদের শতকরা ৮০ জন ভারত বিভাগের পক্ষে রায় দিয়েছে। বঙ্গদেশে শতকরা ৯৭ জন ভোটার মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা সমর্থন করেছে। ব্রিটিশ

www.bjilibrary.com

শাসক ও কংগ্রেস মুসলিম জাতির দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান নামে নতুন একটি রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে।

এ থেকে প্রমাণিত হলো, সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ করে পাকিস্তান কায়েম করা হয়নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্মও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটের ভিত্তিতেই হয়েছে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় সংসদে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনেই আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে মি. ভুট্টোর পিপলস পার্টি জাতীয় সংসদে শতকরা ৮০টি আসন পেলেও পূর্ব-পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি। রাজনৈতিক বিচারে ঐ নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। ইয়াহইয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেটের জোরে দাবিয়ে রাখার কারণেই পূর্ব-পাকিস্তান স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পৃথক হতে পারেনি, মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে। নির্বাচনের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে ধীরে ধীরে সাংবিধানিক পন্থায়ই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যেত।

মুসলিম জাতীয়তার আদর্শই পাকিস্তানের ভিত্তি। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগ করে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেয়। মুসলিম জাতীয়তার বদলে বাঙালি জাতীয়তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি করার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই তাদের রাজনীতি পশ্চিম পাকিস্তানে অচল হয়ে যায়। শেখ মুজিব সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে চাননি। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যথাসময়ে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন বলে আমি নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করতে চাইলে সবার সাথে ভারতে পালিয়ে যেতেন, নিজের ইচ্ছায় পাকিস্তানে বন্দি হতে রাজি হতেন না।

১৯৭০-এর নির্বাচনই স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ভারতে আশ্রয় না নিলে, তারা সেখানে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কায়েম না করলে এবং লাখ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে গিয়ে শরণার্থী না হলে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে সামরিক পদক্ষেপ নিত না। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের ভূমিকার ভিত্তিই হলো নির্বাচনে আওয়ামী লীগের একচেটিয়া বিজয়।

গণতন্ত্র ধ্বংসের সরকারি অপচেষ্টা

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের নির্বাচনী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাকিস্তান কায়েম হলেও পাকিস্তান সরকার গণতন্ত্রকে লালন করতে ব্যর্থ হওয়ার পরিণামে সামরিক শক্তি ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত (২০০৬) সামরিক শক্তির হাতেই সরকারি ক্ষমতা বহাল আছে। সেখানে এখনো গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ঠিক একইভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলেই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হলেও জনগণ নির্বাচনে যাদেরকে ঐতিহাসিক বিজয় দান করেছে তারাই গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন। পাকিস্তানে তো কায়েদে আযমের তিরোধানের পর ক্রমে ক্রমে দশ বছরের মধ্যে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন শুরু হয়েছিল; কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবর রহমান মাত্র চার বছরেরও কম সময়ের মধ্যে স্বয়ং জঘন্য প্রকারের স্বৈরশাসকে পরিণত হয়েছেন। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে 'বাকশাল' নামক একদলীয় সরকার কায়েম করেছেন, সকল পত্রিকা বন্ধ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি পত্রিকা চালু রেখেছেন, দেশবাসী সকলকে তাঁর দলে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন। এমনকি সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনীকে বাকশালে যোগদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দল হিসেবে যদি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সামান্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও থাকত তাহলে তারা তাদের দলীয় নেতার স্বৈরাচারী আরচণের প্রতিবাদ করতে সাহস না পেলেও অন্তত আপত্তি তুলতে পারতেন বা বিতর্কের চেষ্টা করতেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব জাতীয় সংসদে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে যখন 'বাকশাল' ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন তখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই আওয়ামী সংসদীয় দল সর্বসম্মতভাবে উচ্ছ্বাসের সাথে সমর্থন করে প্রমাণ দিয়েছে যে, আওয়ামী লীগ বিশুদ্ধ ডিক্টেটরি শাসনে বিশ্বাসী।

সংসদ সদস্যগণের (এমপি) মধ্যে মাত্র দুজন এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, যাঁরা আওয়ামী লীগের পদাধিকারী ছিলেন না। তাঁরা হলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

আওয়ামী লীগ সমর্থক মুক্তিযোদ্ধারাও কোনো আপত্তি তোলেননি; বরং তারা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' স্লোগান চালু করেছেন। ঐ সময়ের আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে এখনো যারা রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন এবং গণতন্ত্রের দোহাই দেন তারাও তখন কোনো আপত্তি তোলেননি। যেমন ড. কামাল হোসেন।

আওয়ামী স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি

বাকশাল কায়েম করে শেখ মুজিব যে চরম ডিক্টেটরি শাসন চালু করেছেন তা থেকে মুক্তিলাভের কোনো বৈধ উপায় ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের যে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল তাতে বাংলাদেশকে ৬১টি এলাকায় ভাগ করে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করার ঘোষণা দেওয়ার কথা ছিল। তিনি যাদেরকে এ উদ্দেশ্যে বাছাই করেছিলেন তারা নিঃসন্দেহে তাঁর স্বৈরশাসনের বিশ্বস্ত সহচর হওয়ার যোগ্য ছিলেন। ঐ ব্যবস্থা চালু হলে শেখ মুজিব বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বাদশাহ হতেন এবং ৬১ জন গভর্নর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার মর্যাদা পেতেন। বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি ভূখণ্ডে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগের মতো হাস্যকর ব্যবস্থার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না। দেশে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যেন সামান্য ক্ষীণ আওয়াজও কেউ তোলার সাহস না পায় সে মহান উদ্দেশ্যই হয়ত ছিল।

www.bjilibrary.com

এ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে দেশে এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন স্থায়ী রূপ লাভ করত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহী চালু হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তাই এ জঘন্য ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হওয়ার পূর্বক্ষণেই সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র একদল জুনিয়র অফিসার ও জোয়ান দেশকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করেছেন।

শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হওয়া নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির জন্য শুধু শেখ মুজিবকে অপসারণ করাই যথেষ্ট ছিল। স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির বিকল্প কোনো পথই তো ছিল না। তাই দেশবাসী এ ঘটনায় আনন্দ-উল্লাস করেছে। কেউ 'ইন্নালিল্লাহ' পড়েছে বলে জানা যায়নি। শেখ মুজিবের ভক্তদের মধ্যে কেউ সামান্য বিক্ষোভও দেখাননি কেন? দেশে তো সামরিক শাসন জারি করে সারা দেশে দূরে থাকুক, রাজধানীতেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়নি। দেশের কোথাও কেন ছোট আকারেও বিক্ষোভ মিছিল হলো না? আওয়ামী লীগের বীরেরা জনগণের মধ্যে মুজিব হত্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আনন্দের ঢেউ দেখে কেউ প্রতিবাদের হিম্মত করেননি। বঙ্গবীর নামে খ্যাত ব্যক্তিও দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে প্রতিবাদ করতে সাহস করেছেন।

মুজিব হত্যাকারীরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং তারা আওয়ামী শাসনই বহাল রেখেছেন

সামরিক বাহিনীর মধ্য থেকে যারা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছেন, তারা সামরিক শাসন কায়েম করেননি এবং সামরিক আইনও জারি করেননি; শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সিনিয়র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদকেই প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ আওয়ামী লীগের নেতাদেরকে নিয়েই মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচিত জাতীয় সংসদও বহাল রাখা হয়েছে। সংবিধানও মুলতবি করা হয়নি।

হত্যাকারীরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তাদেরকে 'স্বাধীনতাবিরোধী' বা তথাকথিত 'রাজাকার' বলার সাহস কারো নেই। তারা জনগণকে জঘন্য স্বৈরশাসনের শিকল থেকে মুক্ত করেছেন। জনগণ তাদেরকে নাজাতদাতা হিসেবে ভালোবাসে। তারা দেশ ও জাতির বিরাট কল্যাণ সাধন করেছেন।

মুজিব হত্যা কি বিচারযোগ্য অপরাধ?

যখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কোনো দেশে সরকারের পতন হয় এবং বিদ্রোহীরা সফল বিপ্লব সাধনে সক্ষম হয় তখন জাতিসংঘও সরকার পরিবর্তনকে বৈধ বলে স্বীকার করে। আর যদি বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হয় এবং প্রতিষ্ঠিত সরকার বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয় তাহলে বিদ্রোহীরা অপরাধী হিসেবে কঠোর শাস্তি পায়।

মুজিব হত্যাকারীরা সামান্য প্রতিরোধেরও সম্মুখীন হননি। তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ (বর্তমানে আওয়ামী লীগনেতা) এবং মুজিব সরকারের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গঠিত রক্ষীবাহিনীর প্রধান জনাব তোফায়েল আহমদ কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাননি। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান (জে. শফিউল্লাহসহ) প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক

www.bjilibrary.com

আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। জাতিসংঘ ও বিশ্বের বহু রাষ্ট্র অল্প দিনের মধ্যেই মুশতাক সরকারকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। মুজিব হত্যার পূর্বে চিন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকেই স্বীকৃতি দেয়নি। মুজিব হত্যার পর তারাও মুশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শতকরা এক শ' ভাগ সফল এমন বিপ্লবীদের বিচার হওয়া মোটেই বৈধ ও স্বাভাবিক নয়। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না এলে এ বিচারের কোনো প্রশ্নই উঠত না। শেখ হাসিনা ১৯৭৯ সালের মে মাসে দিল্লিতে স্বেচ্ছানির্বাসন সমাপ্ত করে দেশে আসার ১৭ বছর পর ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সময়ই মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি। মুজিব হত্যার ২১ বছর পর ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি একটি স্পেশাল কোর্টে বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। শেখ মুজিব সরকারের পতনে দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলায় এবং হত্যার বিচার দাবি করলে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তিনি এ দাবি করা সমীচীন মনে করেননি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইদের হত্যাকে 'ফৌজদারি অপরাধ' গণ্য করে বিচারের ব্যবস্থা করেছেন।

শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা

১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এত উর্ধ্বে উন্নীত ছিল, যার নজির অত্যন্ত বিরল। নির্বাচনে যে বিস্ময়কর বিজয় তিনি লাভ করেছেন, কোনো দেশে এর নজির নেই। এমন বিরল জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি দেশে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তাতে সফলতাই স্বাভাবিক ছিল। তাঁর দলীয় লোকদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন সুশাসনে ব্যর্থ হয়েছেন, তা দেশি-বিদেশি বহু লেখকের পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র পৌনে চার বছর পর যখন তাঁর পতন হয়েছে তখন তাঁর জনপ্রিয়তা শূন্যেরও নিচে ছিল বলে প্রমাণিত। 'যার শেষ ভালো, তার সব ভালো' প্রবচনটির বিপরীত যা, তা-ই শেখ মুজিবের জীবনে মহাসত্য হয়ে আছে। শেখ হাসিনা ক্ষমতার দাপটে শেখ মুজিবের ফটো টাকার নোটে ছাপিয়ে, সর্বত্র জনসমক্ষে ঝুলিয়ে এবং বহু প্রতিষ্ঠানে জোর করে তাঁর নাম চাপিয়ে দিয়ে সর্বোপরি মুজিব হত্যার বিচারব্যবস্থা করে যত কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠা থেকে সামান্যও উন্নীত হয়েছে কি না তা জরিপ করে দেখার বিষয়।

শেখ মুজিবের আদর্শ

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক একমাত্র মূলধন হলো শেখ মুজিব। 'জাতির পিতা' ও 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে জনগণের নিকট তাঁর ভাবমূর্তি যতই বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হোক, তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি যে আদর্শের জন্য জীবন দিয়ে গিয়েছেন, তা হলো বাকশালী স্বৈরতন্ত্র। সারা জীবনের শেষ অর্জন হলো একচেটিয়া ক্ষমতার প্রচণ্ড লোভ।

শেখ মুজিবই যদি আওয়ামী লীগের আদর্শ হয়ে থাকে তাহলে বাকশালী একনায়কত্বই তাদের আদর্শ হওয়ার কথা। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালীন কার্যকলাপে ঐ

www.bjilibrary.com

আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল দুনিয়ার কোনো ডিক্টেটরের আমলেও হয়েছে বলে ইতিহাসে নেই। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাড়ি শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত মালিকানায় বরাদ্দ করার নজিরও বিশ্বে কোথাও নেই। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শেখ হাসিনার বেসামাল কথাবার্তা সুপ্রিম কোর্টকে বিচলিত করায় তাকে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই দুবার সতর্ক করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাকে 'রং হেডেড' আখ্যা দিতেও বাধ্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পজিশন নিয়ে শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে দলীয় ক্যাডারদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, একটি খুনের বদলায় ১০টি খুন করতে হবে। এসবই কি শেখ মুজিবের আদর্শের পরিচয় নয়?

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কঠিন সংকট

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, আগামী নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজনেই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে এত কথা বলতে হচ্ছে। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি যে গণতন্ত্র হত্যারই রাজনীতি, সে আলোচনাও অপরিহার্য।

২৬৮.

আওয়ামী লীগের আদর্শ কী?

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণীত হয়। তখন আওয়ামী লীগই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দই সংবিধান রচয়িতা। ১৯৭২ সালের জাতীয় সংসদের যে অধিবেশনে সংবিধান সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল সেখানে উপস্থিত ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিধিগণের সকলেই আওয়ামী লীগের ছিলেন। তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সংবিধানের ৮ নং ধারায় নিম্নোক্ত চারটি পরিভাষা উল্লেখ করা হয়েছিল :

১. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২. জাতীয়তাবাদ, ৩. গণতন্ত্র, ৪. সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ এ চারটি আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ভারত থেকে এবং শেষটি রাশিয়া থেকে আমদানি করা হয়েছে। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করায় ভারত প্রত্যক্ষভাবে ও রাশিয়া পরোক্ষভাবে বিরাট অবদান রেখেছে। তাই তাদের পক্ষ থেকে চাপ থাকাই স্বাভাবিক।

এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান কায়েম না হলে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার কোনো সুযোগই পেত না। এ কথা আওয়ামী লীগও স্বীকার করতে বাধ্য যে, কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয়েছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বাংলাদেশের আদর্শ নয়। অবশ্য আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালেই ভারতীয় এ মতবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

www.bjilibrary.com

১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উৎখাত হয়ে গেছে এবং 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এ সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় দেশের সংবিধানকে সমুন্নত রাখার ঘোষণা দিলেও সংবিধানবহির্ভূত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদেই তিনি ও তাঁর দল বিশ্বাসী বলে দাবি করেছেন এবং এ দাবিতে তারা এখনো অটল আছেন। তিনি পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংসদে তার ছিল না বটে, তবে গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের চেষ্টা তিনি করতে পারতেন; কিন্তু তাঁর প্রিয় আদর্শ গণভোটের মাধ্যমেই সংবিধান থেকে উৎখাত করা হয়েছিল বিধায় সে আদর্শ গণভোটের মাধ্যমে বহাল করার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। সে হিসেবে আদর্শিক দিক দিয়ে তাঁর শাসনকাল সংবিধানবিরোধী বলে অবশ্যই অবৈধ ছিল। সংবিধানকে সমুন্নত রাখার শপথ নিয়ে তিনি প্রধান ও প্রথম রাষ্ট্রীয় আদর্শকেই নিন্দনীয়ভাবে অস্বীকার করেছেন।

১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসেবে ত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়, সমাজতন্ত্রকে তারা আদর্শ হিসেবে সেখান থেকেই আমদানি করেছিল। এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাদের নিজস্ব কোনো স্থায়ী আদর্শ নেই।

সংবিধানে তারা 'জাতীয়তাবাদ'কে অন্যতম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিল। দেশের নাম 'বাংলাদেশ'। স্বাভাবিক কারণেই জাতীয়তাবাদ মানে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। জাপানের অধিবাসীরা জাপানি জাতি। ভারতের অধিবাসীরা ভারতীয় জাতি। রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই বিশ্বের মানুষ বিভিন্ন জাতি হিসেবে পরিচিত।

যত অযৌক্তিকই হোক, জাতীয়তার বেলায়ও তারা নিজস্ব গোঁ ধরে আছে। তারা নাকি বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমরা বাংলাভাষী হিসেবে অবশ্যই বাঙালি, কিন্তু দেশের পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশি। ভাষার ভিত্তিতে যদি জাতি গণনা করা হয় তাহলে বাংলাশের বাইরে যত বাংলাভাষী রয়েছে তারাও বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত। আওয়ামী লীগ কি পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদেরকে ভারত থেকে পৃথক হয়ে বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে আমাদের সাথে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত করতে পারবে? যদি পারে তাহলে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কায়েম হতে পারে। অবশ্য এটা করতে গেলে রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ' রাখার বদলে 'বাঙালা' রাখতে হবে।

গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন পরিচয়

আওয়ামী লীগ যে একটি ফ্যাসিস্ট দল এর প্রমাণ আমার লেখা সত্তরের দশকের আলোচনায় রয়েছে, যা 'জীবনে যা দেখলাম'-এর চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ আমলে তাদের গণতন্ত্রের নমুনা আরো জঘন্য। বিশ্বে স্বীকৃত গণতন্ত্রের

www.bjilibrary.com

সর্বসম্মত পরিচয় তুলে ধরার পর আমি প্রমাণ করতে চাই, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে মোটেই বিশ্বাসী নয়। গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন পরিচয় নিম্নরূপ :

১. একটি দেশ বা রাষ্ট্রের মালিক কোনো রাজা বা কোনো বংশ নয়। জনগণই দেশের আসল মালিক। জনগণ যাদেরকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয় তারাই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সরকারি ক্ষমতার অধিকারী হবে।

২. নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রতিনিধি বাছাই করবে। এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থার হাতে থাকবে, যার নাম দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশন।

৩. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলই সরকার পরিচালনা করবে। রাজনৈতিক দল দেশকে কীভাবে পরিচালনা করবে, তা জনগণের নিকট স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে, এর পক্ষে জনসমর্থন লাভ করার উদ্দেশ্যে যত বেশিসংখ্যক সম্ভব জনগণকে সংগঠিত করবে।

৪. যে দল সরকার গঠন করে তারা দেশ শাসন করবে। মেয়াদ শেষ হলে আবার নির্বাচন হবে।

৫. যেসব দল সরকারের বাইরে থাকে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে 'ছায়া সরকার' বলা হয়। বিরোধী দল দেশের স্বার্থে সরকারকে ভুল পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, সরকারকে সুপরামর্শ দেবে এবং সরকারের কার্যকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করবে।

৬. সকল দল নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নেবে। যদি নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি বলে কারো নিকট বাস্তব প্রমাণ থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ করবে, প্রয়োজনে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করবে।

৭. নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সরকারকে সংবিধান অনুযায়ী মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দিতে হবে। বিরোধী দলের সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করার অধিকার আছে; কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে পদত্যাগ করার দাবি জানানোর অধিকার নেই।

৮. একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার পরিবর্তন করা যাবে। অন্য কোনো উপায়ে সরকার উৎখাত করা বৈধ নয়।

৯. বিরোধী দল প্রধানত সংসদের অধিবেশনেই তাদের সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করবে। সংসদ বর্জন করে রাজপথে বিরোধী ভূমিকা অর্থহীন। এটা সরকারকে সংশোধন করার কোনো বৈধ পন্থা নয়।

১০. সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা অগণতান্ত্রিক নয়। এটা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার; কিন্তু সে আন্দোলনে এমন কোনো কর্মসূচি দেওয়া গণতান্ত্রিক নয়, যার ফলে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, দেশের সম্পদ ধ্বংস হয়, নাগরিক অধিকার খর্ব হয় ও জনগণের আর্থিক ক্ষতি হয়।

www.bjilibrary.com

গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন পরিচয় বনাম আওয়ামী লীগের পরিচয়

১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। দেশ গড়ার কোনো কর্মসূচি নিয়ে এ দল জনগণকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেনি। তখন খাজা নাজিমুদ্দীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী (উজিরে আ'লা বা Chief Minister) ছিলেন। মওলানা ভাসানী পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আসাম প্রদেশে মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন এবং জনপ্রিয় নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনিই আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণ করেন।

অবিভক্ত বঙ্গদেশে মুসলিম লীগ নাজিমুদ্দীন গ্রুপ ও সোহ্রাওয়ার্দী গ্রুপে বিভক্ত ছিল। বেঙ্গল মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এককালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কুক্ষিগত ছিল। সোহ্রাওয়ার্দী-আবুল হাশেম গ্রুপ মুসলিম লীগকে গণসংগঠনে পরিণত করেছিল। আমি তখন পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্রকর্মী হিসেবে এ গ্রুপেরই সক্রিয় সমর্থক ছিলাম। বেঙ্গল প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন; কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের যুবকর্মীদের অধিকাংশ সোহ্রাওয়ার্দী গ্রুপের সমর্থক ছিল। আমি তাদের একজন থাকলেও মুসলিম লীগের দলীয় রাজনীতিতে শরীক ছিলাম না। তবে সক্রিয়দের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

মওলানা ভাসানী এ গ্রুপের সমর্থন লাভ করেই আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেছেন। তাদের নিকট থেকেই আমি জানতে পেরেছি, নতুন দল গঠনের উদ্দেশ্য হলো জনগণকে এ কথা জানানো যে, যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করেছে সে দল জনগণের দল ছিল এবং জনগণের সমর্থনেই পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। এখন যারা মুসলিম লীগের নেতা সেজেছে তারা খাজা ও নওয়াবদের গোষ্ঠী। এটা জনগণের মুসলিম লীগ নয়। জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করার উদ্দেশ্যেই 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে নতুন দল গঠন করা হয়েছে। 'আওয়াম' শব্দটি আরবী, এর অর্থ হলো জনসাধারণ।

মওলানা ভাসানী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনগণের পক্ষে কতক প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করায় জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁর নামে একটি সড়কের নামকরণ করেছেন— এমনকি বঙ্গভবনে তাঁর ফটোও স্থাপন করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান আমলে তিনি বামদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এ দেশে ঘেরাও ও জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন চালু করেছেন। তাঁর রাজনীতি ছিল এজিটেশনাল; গঠনমূলক নয়। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ ঐ জাতীয় রাজনীতিই চালু করেছে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ দেশ গড়ার কোনো কর্মসূচি নিয়ে জনগণের ময়দানে অবতীর্ণ হয়নি। সরকারের ব্যর্থতার কাহিনী অনেক বাড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করে জনগণকে খেপিয়ে তোলাই ছিল তাদের রাজনীতি। তারা এখনো ঐ ঐতিহ্য ধারণ করে রাখার দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক কার্যাবলি

আওয়ামী লীগ যে দলকে তাদের বিরোধী মনে করে, তাদের জনসভা পণ্ড করার চেষ্টা করে। পাকিস্তান আমলে তা প্রায়ই দেখা গেছে।

'জীবনে যা দেখলাম'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ৭৬ নং কিস্তিতে এর একটা বড় উদাহরণ রয়েছে। ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক দল হিসেবে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ করান। সম্মেলন ব্যর্থ করতে না পারলেও নতুন এ দলকে পল্টন ময়দানে জনসভা করতে দেওয়া হয়নি।

১৯৬৮ সালে পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট)-এর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের পূর্ব পাকিস্তান সফর উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিটি জনসভায় আওয়ামী গুণ্ডাবাহিনীর সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে।

পল্টন ময়দানে জনাব নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে পিডিএম-এর জনসভায় আওয়ামী লীগনেতা জনাব তাজুদ্দীন আহমেদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে এক বাহিনী বিশাল ক্যানভাসে আঁকা শেখ মুজিবের ছবি মঞ্চের সামনে ঝুলিয়ে গোটা মঞ্চ দখল করে তারাই বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেছেন।

১৯৭০-এর ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় তারা হামলা করে সভা পণ্ড করেছে। তাদের আক্রমণে দুজন ছাত্র শহীদ হয়েছে এবং বহু লোক আহত হয়েছে।

১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া অন্য সব দল আওয়ামী দাপটের ভয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ১৬২টি আসনের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৬২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই তারা দাপট দেখিয়েছে এবং ব্যালট বাক্স তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

বাংলাদেশ আমলে আওয়ামী গণতন্ত্র

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্টের ১৫ তারিখ পর্যন্ত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে চরম কুশাসন চলেছে এর বিস্তারিত বিবরণ 'জীবনে যা দেখলাম'-এর চতুর্থ খণ্ডে লেখা রয়েছে। তাদেরই প্রণীত ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামো অনুযায়ী শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সাংবিধানিকভাবে ডিক্টেটর হওয়ার হীন উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী সংসদে পাস করিয়ে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েমের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট পদটি দখল করে একদলীয় বাকশাল শাসন কায়েম করেছেন।

১৯৭৫-এর আগস্ট বিপ্লবের পর আওয়ামী লীগ চরমভাবে জননিন্দিত হয়। শেখ মুজিব নিজেই আওয়ামী লীগ নামের দল বাতিল করে 'বাকশাল' নাম দিয়ে নতুন দল গঠন করে সকল রাজনৈতিক দল খতম করেছেন। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান

www.bjilibrary.com

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ধারা বাতিল করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেন। এরই ফলে আবার নতুন করে আওয়ামী লীগ দল গঠন করা সম্ভব হয়। ১৯৭৯-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদে কোনো রকমে ৩৯টি আসন লাভ করেছে; ১৯৮৬ সালে ৫৭টি এবং ১৯৯১ সালে ৮৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছে। এভাবেই ধীরে ধীরে আওয়ামী লীগ এগুতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে তারা তেমন কোনো দাপট দেখানোর সাহস পায়নি।

১৯৯৬ সালে বিভিন্ন কারণে এবং শেখ হাসিনা ইহরামের পোশাক পরে ও তাসবীহ হাতে নিয়ে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের অতীত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে দেড় শ' আসনের কাছাকাছিসংখ্যক আসন পেয়ে এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হতে সক্ষম হয়েছেন। শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের দুঃশাসনকালে সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের নেতৃত্বে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক(!) চরিত্রের যে জঘন্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এ দেশে ইতিহাস হয়েই রয়েছে। শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের কুশাসনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরছি।

শেখ হাসিনার অপশাসন

১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা তার পিতার মতোই দাপটের সাথে রাজত্ব করেছেন। জনগণের সেবা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য নির্বাচনের পূর্বে তিনি কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন; কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি আসল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো অনুযায়ী দেশগড়া ও জনসেবার দায়িত্ব কতটুকু তিনি পালন করেছেন, তা আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি। মেনিফেস্টোতে উল্লেখ নেই এমন বিরাট বিরাট অনেক কর্ম সম্পাদনের উপর তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। তার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেসব কীর্তি থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিতে জনগণকে বাধ্য করার অপচেষ্টা। শেখ মুজিব এককালে নিঃসন্দেহে জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন; কিন্তু সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তাঁর জনপ্রিয়তা শূন্যের নিচে চলে গেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হওয়া সত্ত্বেও জনগণ চরম উল্লাস প্রকাশ করেছে। পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকলে কি এমন আচরণ প্রকাশ পেতে পারে?

   শেখ মুজিবের ফটো সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান এমনকি মাদরাসায়ও স্থাপন করার জন্য আইন পাস করা হয়েছিল, যাতে জাতির পিতা হিসেবে তাঁকে সম্মান দেখাতে সবাই বাধ্য হয়। সম্মান কখনো আইনের জোরে আদায় করা যায় না। এটা আবেগের ব্যাপার। শেখ হাসিনা তার পিতার জন্য স্বাভাবিক কারণেই যে আবেগ অনুভব করেন তা আইনের ঊর্ধ্বে। এ আবেগ জনগণের মধ্যে আইনের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

২. শেখ মুজিবের শ্বাসরুদ্ধকর স্বৈরশাসনের কবল থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা দেশ ও জনগণকে উদ্ধার করে জাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাদেরকে সাধারণ খুনের আসামি হিসেবে ফাঁসিতে ঝোলানের অপচেষ্টা। শেখ হাসিনা দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে দেশে ফিরে এসে ১৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পিতা হত্যার বিচার দাবি করেননি। সপ্তম সংসদের নির্বাচনী অভিযানে এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দেননি, কিন্তু '৯৬-এর জুনে ক্ষমতাসীন হয়েই সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। মুজিব হত্যার বিচারের উদ্দেশ্যে জেলসংলগ্ন স্থানে এক বিশেষ আদালত কায়েম করা হয়েছিল। এ আদালত ১৫ জন সাবেক সেনা-কর্মকর্তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হলে বারবার বেঞ্চ বদল করতে হয়। কারণ, বেঞ্চের কোনো কোনো বিচারপতি এ মামলার শুনানি করতে বিব্রতবোধ করলে বেঞ্চ পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন জানানো হলে সেখানেও কোনো কোনো বিচারপতি বিব্রতবোধ করেছেন। ২০০০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার হুমকি দিয়ে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে জঙ্গি লাঠিমিছিল করা হয়েছে এবং বিচারপতিদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐ মামলা সুপ্রিম কোর্টেই ঝুলন্ত অবস্থায় কত দিন থাকবে জানা নেই।

মুজিব হত্যার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১০ জনেরও একটি প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ মিছিল বের হয়নি। আওয়ামী লীগই ক্ষমতাসীন থেকেছিল। শেখ মুজিবের আমলের সংসদ সদস্যরাই বহাল রয়েছিলেন। শেখের মন্ত্রিসভার এক সিনিয়র মন্ত্রী দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, ঐ মন্ত্রিসভার সদস্যগণই নতুন মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন। অথচ আগস্ট বিপ্লবের নায়ক সেনা-কর্মকর্তারাই শুধু ফাঁসির আসামি হয়েছেন। প্রথম সংসদের স্পিকার মালেক উকিল লন্ডন গিয়ে 'ফিরাউনের পতন হয়েছে' বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তিনিই '৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে বহাল রয়েছিলেন। মুজিব হত্যা যদি সত্যিই অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে মুজিব হত্যার প্রতিবাদ না করার অপরাধে শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের সকল নেতা-নেত্রীরই বিচার হওয়া উচিত।

সর্বোপরি তথাকথিত 'জাতির পিতা'র হত্যায় বিক্ষুব্ধ না হয়ে গোটা দেশবাসী উল্লাস প্রকাশ করে এবং শোক প্রকাশ না করে যে মহাঅপরাধ(!) করেছে তাদেরও বিচার করার উদ্যোগ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

আমার আশঙ্কা হয়, গণতন্ত্রের চরম দুশমন ও স্বৈরাচারীকে হত্যা করে জনগণকে যারা রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে ফাঁসি দেওয়ার অপচেষ্টা করলে জনগণ তা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

www.bjilibrary.com

৩. শাসনতন্ত্র থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ঐ বিদেশি মতবাদকে শেখ হাসিনা তার দলের আদর্শ বলে দাপটের সাথে ঘোষণা করেছেন। সরকারি সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ব্যক্তি কেমন করে এমন অসাংবিধানিক ঘোষণা দিতে পারলেন? অথচ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় তিনি সংবিধানের আনুগত্য ও সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছেন। সংবিধান সংশোধনের যে পদ্ধতি সংবিধানে রয়েছে, সে অনুযায়ী তিনি সংবিধানে তার ঐ আদর্শকে পুনর্বহাল করার চেষ্টা করলে দূষণীয় বলে গণ্য হতো না; কিন্তু সংবিধানকে অস্বীকার করার কোনো আইনগত ক্ষমতা বা অধিকার তার ছিল না।

ঐ আদর্শকে গায়ের জোরে কায়েম করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই তিনি সকল ইসলামী দল ও মাদরাসা শিক্ষাকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যখনই কোথাও বোমা বিস্ফোরণে নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে তখনই তিনি 'মৌলবাদী'দেরকে দায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। আওয়ামী লীগের মতে, ইসলামী দল ও মাদরাসাই মৌলবাদীদের আখড়া। বোমা বিস্ফোরণের কোনো ঘটনারই তিনি তদন্ত করেননি। কারণ, তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, কারা অপরাধী। এভাবে দেশের ইসলামী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে তিনি নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন। কারণ, তাদেরকে দমন করতে না পারলে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ দেশে চালু করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪. শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যম তার স্বৈরশাসনকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে রক্ষীবাহিনী গঠন করেছিলেন। শেখ হাসিনাও একই মহান উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় দলীয় গডফাদারদের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, নানা অজুহাতে বড় বড় কয়েকজন আলেমকে খুনি সাব্যস্ত করে গ্রেফতার করিয়েছিলেন। সারা দেশে আলেম সমাজের মাঝে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল।

৫. বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যাপক দখলি প্রচেষ্টা চালানো। যেসব স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ, সেসবের নামের সাথে 'বঙ্গবন্ধু' যুক্ত করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সমিতি, হাটবাজার, ঘাট, বীমা, ব্যাংক, সরকারি খাস জমি ও বস্তি এলাকা দলীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে মানের বিশেষ নিরাপত্তা ভোগ করেছেন, অনুরূপ ব্যবস্থা আজীবন শেখ হাসিনা ও তার বোনের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হয়েছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো যে, শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত 'গণভবন'কে শেখ হাসিনার স্থায়ী বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ করে দিয়েছিল। শেখ হাসিনা সন্তুষ্টচিত্তে ঘোষণা করেছেন, তিনি যত দিন রাজনীতি করবেন তত দিন তিনি গণভবনেই থাকবেন। এমন নির্লজ্জ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো নজির কোথাও আছে কি না, আমার জানা নেই।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশটাকে তিনি মৌরুসি সম্পত্তি মনে না করলে এমন আজব সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না।

৬. দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য গড়ার বিপরীতে বিভেদ সৃষ্টি করার ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ। দেশপ্রেমিক নেতারা রাজনৈতিক বিরোধীদেরকেও আপন করে নেওয়ার নীতি প্রয়োগ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশগড়ার কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদার শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে তাদের নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলাকে ২৯ বছর করাবন্দি করে রাখা সত্ত্বেও কারামুক্ত হওয়ার পর তিনি শ্বেতাঙ্গদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে সফলতা লাভ করেন। যদি তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতা পোষণ করতেন তাহলে দেশে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলাই চালু থাকত এবং রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হতেন। শেখ হাসিনা এর বিপরীত নীতিই গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষের ধুয়া তুলে তিনি ইসলামী শক্তিকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন। এ ভেদনীতি তার জন্য নির্বাচনে বুমেরাং হয়েই দেখা দিয়েছে।

৭. শেখ হাসিনা সকল গণতান্ত্রিক নীতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার মাধ্যমে তার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গর্ববোধ করতেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য চরম হিংস্র আচরণ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তার ঘনিষ্ঠ সেবক মতিউর রহমান রেন্টুর 'আমার ফাঁসি চাই' বইটিতে এর চমকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। আমি শুধু একটা উদাহরণকেই যথেষ্ট মনে করি। শেখ হাসিনার আমল ছাড়া এর পূর্বে ও পরে কোনো আমলেই বিরোধী দলের হরতাল বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকারি পক্ষ থেকে সশস্ত্র জঙ্গি মিছিল করতে দেখা যায়নি। তার মুখে কখনো গণতান্ত্রিক ভাষা শুনতে পাওয়া যায় না। কোনো রাজনৈতিক নেতা এত অশালীন ভাষায় কথা বলেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সমবেত তার দলের লোকদেরকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতিপক্ষের ফেলা একটি লাশের বদলে ১০টি লাশ ফেলতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবি হলো, শাসন বিভাগের পক্ষ থেকে আদালতের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা বারবার সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত শালীন ভাষায় একাধিক বার তাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান না থাকলে শেখ হাসিনার কুশাসন দেশের উপর কত কাল চেপে থাকত, তা আল্লাহই জানেন। সব দিক দিয়ে তার পিতাই তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা। তাই তার পিতার মতোই তিনি স্বৈরশাসন চালু করার চেষ্টা করেছেন।

www.bjilibrary.com

২৬৯.

এক মহাবিপদ কেটে গেল

গত কয়েক কিস্তিতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করেছি। এ আলোচনা দীর্ঘ হওয়ারই কথা। এর মধ্যে এমন এক আকস্মিক ঘটনা ঘটেছে, যা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়ে গেল। তাই রাজনৈতিক আলোচনায় ছেদ কেটে সে বিষয়ে লিখতে বাধ্য হলাম।

ঘটনাটি আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহিল মামূন আল-আযামীকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাস থেকেই সে জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে কর্মরত রয়েছে। ৯ জুন (২০০৬) শুক্রবার সেখানকার ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলদের বৈঠক শেষে জুমুআর নামাযের প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে সে বাসার দিকে রওয়ানা হয়। ঠিক ১২টার সময় বিপরীত দিক থেকে হঠাৎ করে একটা প্রাইভেট কার উচ্চ গতিতে মামূনের গাড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মামূন একাই গাড়িতে ছিল এবং গাড়ি চালাচ্ছিল। ঐ গাড়িটি মামূনের ড্রাইভিং সিট বরাবর আঘাত করায় গাড়ি এতটা দুমড়ে গিয়েছে যে, দরজা খুলে সে বের হওয়ার উপায় ছিল না। এরই মধ্যে মামূনের গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেলে সে জান বাঁচানোর তাকীদে অপর পাশের দরজা দিয়ে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে হাত দিয়ে দরজা খুলতে না পেরে মরিয়া হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দরজায় লাথি মারলে আল্লাহর মেহেরবানীতে দরজা খুলে গেল। জান নিয়ে গাড়ি থেকে বের হতে পেরে সে স্বস্তির নিশ্বাস নিল এবং লক্ষ করে দেখল, ঐ গাড়িটি ওলট-পালট হয়ে প্রায় চেপ্টা হয়ে গেছে এবং দরজা ভেঙে ড্রাইভারকে বের করা হচ্ছে। ৫ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। গাড়ি থেকে বের হয়েই ফোনে মামূন দ্বীনী ভাইদেরকে অবস্থা জানাল। যাদের সাথে সে একটু আগেই বৈঠকে মিলিত হয়েছিল তারাও এসে গেলেন।

মামূনের গাড়িটি বেশ বড় ও ভারী বিধায় উল্টায়নি। ঐ গাড়িতেও ড্রাইভার একাই ছিল। গাড়ি থেকে তাকে বেহুঁশ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মামূন দেখতে পেল, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি এসে পৌঁছার আগেই তার গাড়ির তিন ভাগের দুভাগ জ্বলে গেছে। গাড়ি থেকে বের হতে একটু বিলম্ব হলে কী দশা হতে পারত, সে কথা খেয়াল করে সে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল, আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবায় পরম তৃপ্তিবোধ করল। মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পাওয়ার তৃপ্তি!

পুলিশ মামূনকে থানায় নিয়ে গেল। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল এজন্য যে, দুর্ঘটনার জন্য সে যে সামান্যও দায়ী নয় এবং অপর গাড়িটিই সম্পূর্ণ দায়ী, এ কথা প্রমাণিত হবে কেমন করে? দুর্ঘটনাস্থলে যে কয়েকটি গাড়ি ছিল ঐ গাড়ির ড্রাইভাররা তো দেখেছে, রং-সাইড থেকে ঐ গাড়িটি এসে মামূনের গাড়িকে আঘাত করেছে; কিন্তু সাক্ষী হিসেবে তাদেরকে

www.bjilibrary.com

পাওয়ার উপায় কী? সে আরো চিন্তিত হলো এ জন্য যে, ঐ ড্রাইভার যদি মারা যায় তাহলে সে দেশের আইন অনুযায়ী অপর পক্ষকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ রিয়ালের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যেকোনো পরিমাণের অর্থ নিহতের পরিবারকে দিতে হবে, যদি সে পক্ষ ট্রাফিক আইনে দোষী না-ও হয়।

মামুন ট্রাফিক জেলে

আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তির উদ্দেশ্যে যে জেলখানা আছে সে জেল ছাড়াও ট্রাফিক আইন ভঙ্গকারীদেরকে প্রাথমিকভাবে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আটক রাখার জন্য পৃথক জেলখানা রয়েছে। মামুনকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর সে ওর ছোট ভাই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমান আযামীকে মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠাল। ১২টায় যখন দুর্ঘটনা ঘটেছে তখন ঢাকায় বিকেল ৩টা।

আমি সাড়ে ৪টায় আসরের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমানের ফোন থেকে খবর জানা গেল। মামুন আহত হয়নি জানতে পেরে পেরেশানি মুক্ত হলাম। সে জেলে যেখানে আছে সেখানে নেটওয়ার্ক না থাকায় আমান ফোনে যোগাযোগ করতে পারল না। বিস্তারিত জানা ও ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও ফোনে যোগাযোগ করতে পারলাম না। আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং সে আহতও হয়নি বলে জানা সত্ত্বেও যোগাযোগ করে সরাসরি তার সাথে কথা বলতে না পেরে মোটেই ভালো লাগছিল না।

ঐদিন মামুনের আম্মা আত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য চলে যাওয়ায় রাত ৮টা পর্যন্ত বেচারি কিছুই জানতে পারেনি। ফিরে আসার পর তাকে জানালাম। শুনেই সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'ইয়া আল্লাহ! কীভাবে তোমার শুকরিয়া আদায় করব? কত কিছুই ঘটতে পারত।' বিভিন্নভাবে শুকরিয়ার কথা বলে সে সিদ্ধান্ত নিল, দুটো খাসি সদকা দিতে হবে। দুই জায়গায় ফোনে জানিয়ে দেওয়া হলো, যাতে পরের দিনই সদকা দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর একটু শান্ত হয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে সে ফোনে ঘটনা জানিয়ে দোআ করতে বলল, যেন এ দুর্ঘটনার জের হিসেবে কোনো ক্ষতি না হয়।

রাত ১০টা পর্যন্ত চেষ্টা করেও মামুনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করা গেল না। এরপর জেদ্দা থেকে বৌমার ফোন এল। সে আমাদেরকে দুশ্চিন্তা না করার জন্য অনুরোধ করল এবং জানাল, মামুন ভালোই আছে। আল্লাহ তাআলা যে তাকে রক্ষা করেছেন সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সেও কেঁদে ফেলল।

মামুনের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত মনে অস্বস্তিবোধ করছিলাম, জেলে সে কেমন অবস্থায় আছে তা জানার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম। পরের দিন ১০ জুন শনিবার সকাল ৯টায় বৌমার ফোনে জানা গেল, মানূনকে জেল থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঐদিন প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। দুর্ঘটনার দিন শুক্রবার অফিস বন্ধ থাকার কারণে কিছুই করা যায়নি।

www.bjilibrary.com

মামূনের মুক্তিপ্রচেষ্টা

ব্যাংকে মামূনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জেলে গিয়ে দেখা করে জানালেন, জেদ্দার আমীরের দস্তখতের জন্য মুক্তি পেতে বিলম্ব হচ্ছে। দস্তখত হয়ে গেলেই মুক্তি পাওয়া যাবে।

১০ জুন শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় আমান ফোনে জানাল, মামূন এ সময় মসজিদে আছে। ফোনে পাওয়া যাবে। আলহামদু লিল্লাহ! পাওয়া গেল। তার মোবাইলে চার্জের অভাবে বেশিক্ষণ কথা বলা না গেলেও কয়েকটি সুখবর পাওয়া গেল।

মামূন জানাল, গতকালই ট্রাফিক পুলিশ থানায় লিখিত রিপোর্ট দিয়েছে যে দুর্ঘটনার জন্য সৌদি ড্রাইভার দায়ী,' মামূন সম্পূর্ণ নির্দোষ। আরো জানাল, সংগঠনের ভাইয়েরা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসে খাওয়ানোর কারণে আরো সাত-আট জন আটক ব্যক্তিসহ ভালোভাবে খাওয়া হচ্ছে। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত সংগঠনের লোকেরা সাথে ছিলেন। বাসা থেকে প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ও বইপত্র পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলে থাকা-খাওয়ার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

আরো জানা গেল, ড. আলী আল গামেদী জেলে গিয়ে কর্তৃপক্ষ থেকে জানতে পারলেন যে, দুর্ঘটনার জন্য মানূন দায়ী নয়। তাঁর বাড়ি জেদ্দা শহরে। তিনি ঢাকায় সৌদি দূতাবাসে কাউন্সিলর ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের একজন ডাইরেক্টর। ব্যাংকের বোর্ড মিটিংয়ে বছরে একাধিক বার বাংলাদেশে আসেন। ১৯৯৬ সালে তুরস্ক সফরকালে ইস্তাম্বুলে তাঁর বাসায় আমি দুদিন ছিলাম। তিনি তখন সেখানে কর্মরত ছিলেন। সফরে আমার সাথে জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ্জাহেরও ছিলেন। ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাসে তিনি ড. গামেদীর সহকর্মী ছিলেন। তাঁরা দুজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ড. গামেদী ঢাকায় আমার বাড়িতেও কয়েক বার এসেছেন। তিনি মামূনকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। ২০০৩ সালে যখন আমি জেদ্দায় কয়েক মাস ছিলাম তখন তাঁর বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছি।

মামূন ড. গামেদীর কথা জানিয়ে বলল, তিনি জেলে মামূনের সাথে দেখা করে উষ্মা প্রকাশ করলেন যে, দুর্ঘটনার জন্য আপনি দায়ী নন বলে ট্রাফিক পুলিশের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও জেলকর্তৃপক্ষ কেন এখনো আপনাকে আটক করে রাখল তা বুঝলাম না। এর জবাবে মামূন নাকি বলেছে, আপনার দেশের নিয়ম আপনিই ভালো জানেন।

মামূনের দুদিনের জেলজীবন

৯ জুন শুক্রবার দুপুর থেকে ১১ জুন রবিবার দুপুর পর্যন্ত দু'দিন জেলে থাকার অভিজ্ঞতা মুক্তি পাওয়ার পর মামূন ফোনে আমাকে জানাল। রবিবার বিকাল ৩টায় (সৌদি সময় দুপুর ১২টা) মামূন ফোন করে জানাল, 'এই মাত্র বাসায় এসে পৌছলাম।' ঐ সময় বেশিক্ষণ আলাপ করা সমীচীন মনে করিনি। তাই আমি বললাম, দুদিন রেস্ট নাও। পরে ফোনে বিস্তারিত শুনব। সে জানাল, 'পাঁজরে ব্যথা আছে, ডাক্তার দেখাতে হবে। অফিস থেকে এ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলেছে। আগামী শনিবার থেকে অফিসে গেলেই চলবে।'

www.bjilibrary.com

দুদিন পর মামূন ফোন করলে দীর্ঘ সময় কথা হলো। অনেক খবর জানলাম :

১. দুর্ঘটনার সময় গাড়ির স্টিয়ারিং-এর সাথে জোরে পাঁজরে আঘাত লাগায় পাঁজরের একটা হাড় ফেটে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, 'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।' ব্যথার ওষুধ চলছে, ব্যথা কমেছে।

২. ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত অপরাধে ঐ সময় জেলে আরো ২০ জন লোক ছিল। একজন সৌদি যুবক, আর অন্যরা পাকিস্তানি, ভারতীয়, শ্রীলঙ্কান, সুদানি, ইথিওপিয়ান প্রমুখ। একজন বাংলাদেশি যুবকও ছিল, যার বাড়ি বগুড়া জেলায়। সে নাকি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ছিল।

৩. যে কামরায় মামূন ছিল সেখানে আটটা বিছানা ছিল, কিন্তু ১০ জন লোক থাকায় বাধ্যতামূলকভাবে দুটো সিটে দুজন করে শুতে হয়েছিল। মামূন বাংলাদেশি যুবককে নিয়ে এক সিটে ঘুমাল। সে মামূনের পূর্ণ পরিচয় পেয়ে খুবই উৎসাহবোধ করল। মামূন বাসা থেকে যেসব বই জেলে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল সেসব বই থেকে আমার লেখা 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়' বইটি ঐ ছেলেটি একদিনেই পড়ে শেষ করল। সে নাকি মামূনকে আবেগের সাথে বলেছে, 'আমি যে আপনার সাথে দুদিন রইলাম এবং এক বিছানায় ঘুমালাম, এ কথা বললে লোকেরা কি বিশ্বাস করবে?'

৪. দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ফলে মামূন জুমুআর নামায পড়তে পারেনি। জেলের মসজিদে যুহরের নামায থেকে দুদিন সকল ওয়াক্ত নামাযই সে জামায়াতে পড়েছে। মামূনের বয়স বর্তমানে ৫৩ বছর। বয়স, পোশাক এবং চেহারায় আধাপাকা দাড়ি দেখে সবাই প্রথম ওয়াক্ত থেকেই তাকে ইমামতি করতে বাধ্য করেছে। মাগরিবের নামাযে কিরাআত শোনার পর ইমাম হিসেবে সকলে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকল।

৫. মামূন এ দুদিন জেলের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। আমি জানতে চাইলাম, কোন্ ভাষায় কথা বলতে হয়েছে। সে বলল, ইংরেজি, উর্দু ও আরবী ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে।

৬. বন্দিদের কেউ কেউ সামান্য আহত ছিল। তাদের জন্য কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করেনি। মামূন বাইর থেকে ওষুধ আনিয়ে তাদের সেবা করেছে।

৭. মামূনের সাথে দেখা করার জন্য সৌদি, পাকিস্তানি, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশিয়ান, মিসরীয় অনেক লোক জেলে গিয়েছে। জেলখানার সবাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, আপনার এত বন্ধু কেমন করে হলো। মামূন যে ব্যাংকে কর্মরত সেখানে বহু দেশের মানুষ কাজ করে। তারা খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিল।

মামূনের জীবনে জেলের অভিজ্ঞতা এবারই প্রথম। আমার তো কয়েকবারই জেলের অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন দা'ঈ জেলে দাওয়াতি কাজের যে সুযোগ পায় বাইরে তত

www.bjilibrary.com

সুযোগ পায় না। বন্দিদের প্রচুর অবসর। কথা বলার লোক তালাশ করে। তাই যখন কেউ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'র কথা বলে তখন তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে; তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলে অভিভূত হয়; আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকায় দরদ দিয়ে কথা বললে ভক্ত হয়ে যায়। যাক, মাত্র দুদিন মামূন জেলে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করল।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানা গেল

দীর্ঘ টেলিফোন আলাপে মামূনের জেলের অভিজ্ঞতা ছাড়াও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর জানা গেল :

১. মামূনের গাড়িটি ইন্স্যুরেন্স করা ছিল বিধায় আর্থিক ক্ষতি থেকে বাঁচা গেল। এ গাড়িটি গত দশ বছর সে ব্যবহার করেছে। আমি বহুবার সে গাড়িতে মক্কা শরীফ গিয়েছি। গাড়িটি মামূনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

২. গাড়িতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল, যা পুড়ে গেছে, কিন্তু অরিজিনাল কোনো কাগজ গাড়িতে না থাকায় কোনো সমস্যা হয়নি। সব কাগজই ফটোকপি ছিল।

৩. অপর গাড়ির ড্রাইভার ২১ বছর বয়সী সৌদি নাগরিক। অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান। তার সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা চলছে, এখনো জ্ঞান ফেরেনি। তরুণরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে থাকে। এর বেলায় তা-ই ঘটেছে।

৪. আমি চিন্তিত ছিলাম যে, ঐ ছেলেটি মারা গেলে মামূনকে দিয়াতের টাকা দিতে হয় কি না; কিন্তু জানা গেল, কমপ্রিহেনসিভ ইন্স্যুরেন্স করা আছে বিধায় টাকা যদি দিতেই হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিই দেবে।

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে (IDB) মামূনের দায়িত্ব

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক একটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক। সকল মুসলিম দেশেরই শেয়ার এতে আছে। মুসলিম দেশগুলোর উন্নয়নে এ ব্যাংকের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বাংলাদেশেও এ ব্যাংক অনেক কাজ করছে।

ব্যাংকটির বহুমুখী কাজের মধ্যে একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেসব দেশে মুসলিমদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও গরিব ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদেরকে ব্যাংক স্কলারশিপ দিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দান করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্য এ ব্যবস্থা নেই। তবে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা মুসলিম দেশে লেখাপড়া করতে পারে। মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাংলাদেশে মানসম্মত থাকায় বৃত্তিপ্রাপ্তরা এ দেশেও পড়ছে।

ব্যাংক তাদেরকে ধার হিসেবে টাকা দিচ্ছে। যখন তারা আয়-রোজগার করবে তখন সহজ কিস্তিতে এ টাকা পরিশোধ করবে। এ পদ্ধতি সফলভাবেই চালু আছে। যার ফলে ব্যাংকের টাকা এখন আর বাড়াতে হচ্ছে না। ফেরত পাওয়া টাকা ব্যাংকের প্রাথমিক তহবিলে জমা হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা যাতে ইসলামের খেদমত করার যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে, ব্যাংক সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখে। যেসব দেশে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে সেসব দেশে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব মামূন পালন করে থাকে। তাই তাকে এ উদ্দেশ্যে ঐসব দেশেই সফর করতে হয়, যেখানে বৃত্তিপ্রাপ্তরা লেখাপড়া করছে।

মামূন ও বৌমা মুন্নি (মরহুমা) লন্ডনে ভালো চাকরি করছিল। মামূন শিক্ষা বিভাগে যে উচ্চপদে চাকরি করছিল এমন বড় পদে এর আগে কোনো বাংলাদেশি পৌঁছেনি। আমি তাকে দেশে নিয়ে আসার জন্য ১৯৯০ সালে চেষ্টা করলে সে দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বাধা দিয়েছেন। আমি চেষ্টা অব্যাহত রেখে ১৯৯২ সালে জেল থেকে তাকে আবেগপূর্ণ চিঠি লিখেছি। চিঠি পেয়ে সে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ১৯৯৪ সালে দেশে চলে এসেছিল। দেশে আসায় জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ইংল্যান্ডে সে ইসলামী সংগঠনের তারবিয়্যাত বিভাগের দায়িত্বশীল ছিল। বিদেশে রুকন করার নিয়ম নেই। বিদেশে নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করলেও দেশে আসলে যথা নিয়মে রুকন হতে হয়। এ নিয়মেই ইসলামী ছাত্রশিবিরে থাকাকালে রুকন করা হয় না। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে জামায়াতে যোগদান করার পর প্রচলিত নিয়মে রুকন হতে হয়।

মামূন বংশের বড় ছেলে

আমার দাদার চার ছেলের মধ্যে আব্বা সবার বড় ছিলেন। আমার বাপ-চাচার সন্তানদের মধ্যে আমি বয়সে সবার বড়। আব্বা চাইতেন যে আমি যেন এমনভাবে গড়ে উঠি, যাতে বংশের এ প্রজন্মের সবাই আমাকে ভালোবাসে ও মান্য করার যোগ্য মনে করে।

ঘটনাক্রমে আমাদের ভাই-বোনদের পুত্রসন্তানদের মধ্যে মামূনই সবার বড়। আমার এক বোনের কন্যাসন্তান মামূনের চেয়েও বড়। আমার পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেদের মধ্যে মামূনই বংশে প্রথম। এর পরবর্তী প্রজন্মেও বংশের বড় ছেলে মামূনের প্রথম সন্তান নাবীল, যাকে গত বছর লন্ডনে বিয়ে করিয়ে এসেছি।

মামূনকে বড় চাকরি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করেছিলাম, যাতে আমার সাথে রেখে দীনের দিক দিয়ে তাকে আমার মনের মতো করে গড়ে তুলতে পারি। বংশের বড় ছেলে হিসেবে তার নেতৃত্বে অন্যদেরও দীনের পথে উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে বলে ভেবেছিলাম।

মামূন দেশে এসে ইসলামী ব্যাংকে যে চাকরি পেয়েছিল তাতে বাজেটে ঘাটতি পড়া সত্ত্বেও দীনের বৃহত্তর প্রয়োজনে তা সে মেনে নিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে যখন সে বিরাট অংকের বেতনে জেদ্দাস্থ IDB-তে চাকরি পেয়ে গেল, তখন তাকে দেশে থাকতে চাপ দিতে পারলাম না। যে উদ্দেশ্যে তাকে লন্ডন থেকে চলে আসতে বাধ্য করেছিলাম সেদিকের বিবেচনায় মামূনের জেদ্দায় চলে যাওয়ায় মন খুঁতখুঁত করছিল। পরে যখন চাকরির ধরন ও পরিবেশের বিবরণ জেনেছি তখন আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেছি। সেখানে ইসলামের দিক দিয়ে তার উন্নয়ন সন্তোষজনকভাবে হবে বলে ধারণা হলো। দেশে থাকলে হয়ত আরবী ভাষা শেখার সুযোগ হতো না। সেখানে সে সুযোগও পাওয়া গেল।

www.bjilibrary.com

আমার বিদেশ সফর

গত বছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের অর্ধেক প্রায় তিন মাস ইংল্যান্ডে ছিলাম। এবার আড়াই মাসের জন্য ৩০ জুন রওয়ানা হতে চাচ্ছি। মামুনের চার ছেলেমেয়ে ম্যানচেস্টারে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। শুধু ছোট মেয়ে জেদ্দায় থাকে। আমার আরো তিন ছেলে সেখানে আছে। সবার ছোট ছেলেটি লন্ডনে আছে। ওর মেয়ে দুটোর কথা পূর্বে অনেক লেখা হয়েছে– নাবা ও সাফা দুবোন আমাদের কাছেই ছিল বলে ওরা আমাদের অপেক্ষায় দিন গুণে চলেছে। আমার স্ত্রী কিছু দিন আগে স্বপ্নে সাফার পাকনা পাকনা কথা শুনে আমাকে বলতে গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে।

আমাদের ২০ জন নাতি-নাতনির মধ্যে ১৭ জনই সেখানে। ওরা তো আমাদেরকে দেখতে আসতে পারবে না। এত টাকা কোথায় পাবে? আমাদের দুজনের যেতেই প্রায় দেড় লাখ টাকা শুধু বিমানের টিকিটেই লেগে যায়।

২৭০.

নির্বাচনে জয়-পরাজয়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের পরিচালনায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগপ্রার্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দুঃসাহস করেছেন তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। মুক্তিযুদ্ধের ফসল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ একচেটিয়া দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশকে তাদের দলীয় সম্পত্তি বলে মনে করা হয়েছে। নির্বাচনে জাসদ, ভাসানী ন্যাপ ও জাতীয় লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ধৃষ্টতা(!) প্রদর্শন করায় শেখ মুজিব অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছেন। 'জাতির পিতা'র নমিনিদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়া চরম ধৃষ্টতা বৈকি!

নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২টি আসন আওয়ামী লীগ দখল করে নিয়েছে। মাত্র আটটি আসনে জাতীয় লীগের জনাব আতাউর রহমান, জাসদের কয়েকজন ও দু-এক জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। মেজর আবদুল জলিল ও জনাব অলি আহাদ বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত ঘোষণা করা হয়েছে।

গণতন্ত্র হত্যা করে বাকশাল কায়েম করা সত্ত্বেও শেখ মুজিব এখনো আওয়ামী লীগের আদর্শ মহান নেতা। ঐ নেতার নির্বাচনী আদর্শ স্বাভাবিকভাবেই তাদের আদর্শ। তাদের মতে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হতে পারে না; পরাজিত হলে মনে করতে হবে কারচুপি হয়েছে। এ মনোভাব আওয়ামী লীগের মজ্জাগত।

১৯৯১ সালের নির্বাচন

প্রধান বিচারপতি ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় যে নির্বাচন ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে তা এ দেশে প্রথম নিরপেক্ষ,

www.bjilibrary.com

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বলে সর্বমহলে স্বীকৃত। তাঁর এ সুনামের কারণেই ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর নিরপেক্ষতায় পূর্ণ আস্থা না থাকলে কখনো তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা বাছাই করতেন না। এ সত্ত্বেও '৯১ সালের নির্বাচনে বেশি আসন না পাওয়ায় তিনি নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অনেকটা নিশ্চিত ছিলেন যে, নির্বাচনে আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে বলে তাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মাত্র ৮৭টি আসন পাওয়ায় কারচুপির অভিযোগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

২০০১ সালের নির্বাচন

১৯৯৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে পাঁচ বছর দাপটের সাথে তাঁর দুঃশাসন চালিয়ে গেছেন। ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বক্ষণে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ভবনটি (গণভবন) তাঁর ব্যক্তিগত বাড়ি হিসেবে বরাদ্দ করিয়ে নিয়েছেন। তিনি তো নিশ্চিতই করেছিলেন যে, ২০০১ সালের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে গণভবনে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই অফিস করবেন। তাই কিছু দিনের জন্য গণভবন থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার ঝামেলা পোহানোর দরকার নেই। তিনি এ কথাও ঘোষণা করলেন যে, যত দিন তিনি রাজনীতি করবেন তত দিন গণভবনেই অবস্থান করবেন।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার আশা করাটা শেখ হাসিনার জন্য অমূলক ছিল না। নির্বাচনের সময় তাঁরই আস্থাভাজন হিসেবে নির্বাচিত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদকে তাঁরই পরামর্শে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনাব সাঈদ একজন আমলা ছিলেন। সাধারণত বিচারপতিদের মধ্য থেকেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। একজন আমলাকে এ পদে নিয়োগ করায় বিএনপিসহ সকল বিরোধী দল এ নিয়োগের বিরুদ্ধে হরতাল পর্যন্ত করেছে। আমলাকে শেখ হাসিনার আস্থাভাজন ব্যক্তি মনে করেই বিরোধী দলসমূহ প্রতিবাদ করেছে।

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ছাত্রজীবনে বামপন্থি ছিলেন বলে শেখ হাসিনার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্তত চারদলীয় জোটের পক্ষ নেবেন না, যে জোটে দুটো 'মৌলবাদী' দল রয়েছে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁর ফুফা মেজর জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমানকে রিটায়ার্ড হওয়া সত্ত্বেও সেনাপ্রধান নিয়োগ করেছেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে তাঁর ফুফাকে নির্বাচনে প্রার্থী করার উদ্দেশ্যে ফুল জেনারেল হিসেবে প্রমোশন দিয়ে রিটায়ার করিয়েছেন। তাঁর বিশ্বস্ত গণ্য করেই মেজর জেনারেল হারুনকে তিনি নির্বাচনকালীন সময়ে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

প্রশাসন, সচিবালয় ও পুলিশ বিভাগে তিনি তাঁর আস্থাভাজন অফিসারদেরকে সচিব, পুলিশ কর্মকর্তা ও ডিসি নিয়োগ করে ক্ষমতা ত্যাগ করেছেন, যাতে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় নিশ্চিত হয়।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনার নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারগণ, সেনাপ্রধান এবং তাঁরই সাজানো সচিবালয়, পুলিশ বিভাগ ও প্রশাসন তাঁকে আবার ক্ষমতাসীন করবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

রাষ্ট্রপ্রধান ও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের ভূমিকা

রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান দীর্ঘকাল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এবং সর্বশেষে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে যে Judicial Mind গড়ে উঠেছে তাতে অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করার মতো মনোভাব তাঁদের থাকার কথা নয়। শেখ হাসিনা তেমন কোনো আশা করে থাকলে করতে পারেন।

যে সেনাপ্রধানের আমলে ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তাঁকে শেখ হাসিনাই নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি যদি তাঁকে বিজয়ী করার জন্য অন্যায় পদক্ষেপ না নিয়ে থাকেন তাহলে কি তিনি দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন?

বিচারপতি লতিফুর রহমান কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পবিত্র দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে সচিবগণকে ব্যাপকভাবে বদলি করেছেন। শেখ হাসিনার সাজানো সচিবালয় বহাল রাখলে নিরপেক্ষ নির্বাচন কিছুতেই সম্ভব হবে না মনে করেই তিনি নতুন করে সচিবালয়কে সাজিয়েছেন। শেখ হাসিনার নিযুক্ত সচিবগণ দল বেঁধে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীনের নিকট ধরনা দিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, সচিবালয়ে রদবদল করা সরকারপ্রধানের সাংবিধানিক ইখতিয়ার, তিনি সেখানে হস্তক্ষেপ করতে অক্ষম।

শেখ হাসিনা সরকারপ্রধানের এ পদক্ষেপকে 'সিভিল ক্যু' বলে অভিহিত করে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং বিচারপতি লতিফুর রহমানের যে পদক্ষেপই তার মনঃপূত হয়নি, সে পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন। বিচারপতি সাহেবের বিরুদ্ধে যত অশালীন ভাষাই শেখ হাসিনা প্রয়োগ করেছেন, এর কোনো জবাব তিনি দেননি। শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেননি।

দেশি-বিদেশি বহু পর্যবেক্ষক নির্বাচনের দিন সরেজমিনে তদারকি করে নির্বাচনকে অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছেন। সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রশংসানীয় ভূমিকা পালন করেছে বলে সকল মহল স্বীকার করেছে।

নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার ভূমিকা

আগেই বলেছি, বিভিন্ন হিসাব কষে শেখ হাসিনা নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি ১৯৯৬ সালের চেয়েও ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিক আসন পেয়ে ক্ষমতাসীন হবেন। তাই নির্বাচনী অভিযানে তিনি ক্ষমতায় গিয়ে দেশের ও জনগণের জন্য কী কী খিদমত করবেন, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে উচ্চারণ করেছেন।

www.bjilibrary.com

নির্বাচনের দিন তিনি অনেক ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, যথানিয়মেই ভোটগ্রহণ চলছে। কোথাও সামান্য দোষ-ক্রটি দেখলে বা কোথাও থেকে তেমন কোনো অভিযোগ পেলে তিনি বিরাট হৈচৈ বাধিয়ে দিতেন। তিনি নির্বাচনের দিন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিকট অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে স্থূল কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন। নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি শপথ নেবেন না বলে ঘোষণা করলেন। বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত শপথ নিয়েছেন বটে, কিন্তু এক বছর পর্যন্ত তাঁর দলীয় সদস্যদেরকে সংসদে যেতে দেননি।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে তাঁর দলকে পরাজিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে দাবি করলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ, সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধানকে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করলেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন বাতিল করার আহ্বান জানিয়ে পুনর্নির্বাচন দাবি করলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কয়েকবার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার পর অতিষ্ঠ হয়ে প্রেসিডেন্ট অতীব শালীন ভাষায় বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ২০০২ সাল থেকেই তিনি জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আসছেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর দলের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বেগম জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। ঐ বছরের ৩ অক্টোবর পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে তিনি বেগম জিয়াকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, আবার নির্বাচন হলেই তাঁর দলের ক্ষমতাসীন হওয়ার নিশ্চয়তা কে দেবে? যদি তিনি বিজয়ী হতে না পারেন তাহলে আবার তিনি নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবেন। তাঁকে বিজয়ী করার যোগ্য প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশনপ্রধান, সেনা ও পুলিশপ্রধান তিনি কেমন করে জোগাড় করবেন? সুতরাং নতুন নির্বাচনে কেমন করে তাঁর বিজয় নিশ্চিত হবে? বিজয়ী না হলে তো তিনি কোনো নির্বাচনকেই মেনে নেবেন না।

শেখ হাসিনার প্রতি অনুরোধ, নিজের সঠিক মূল্যায়ন করুন

বিগত নির্বাচনে শেখ হাসিনার এমন শোচনীয় পরাজয় কেন ঘটল তা তিনি মোটেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে দেশি ও বিদেশি সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষক মযবুত সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তাঁরাও যদি সবাই শেখ হাসিনার দুশমন হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আর কোথায় আশ্রয় পাবেন? ব্যালট ডাকাতি করে চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে বলে একমাত্র শেখ হাসিনাই বারবার হাস্যকর ঘোষণা দিচ্ছেন। আর কোনো মহল এমন নির্লজ্জ মিথ্যা উচ্চারণ করেনি।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনা বারবার দাবি করছেন যে, তার পাঁচ বছরের শাসনামল এ দেশের স্বর্ণযুগ ছিল, কোনো সন্ত্রাস ছিল না, মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছিল, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং দেশবাসী অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেছিল। এভাবেই তিনি নিজের ঢোল নিজেই জোরে জোরে পেটাচ্ছেন। আর কেউ যখন পেটাচ্ছে না, তখন আর উপায় কী? তার আমলের কুকীর্তির কারণেই যে জনগণ তাকে নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার চরিত্র সংশোধনেরও কোনো সম্ভাবনা নেই। তার বিষাক্ত ও শাণিত জিহ্বাই যে তার বড় আপদ ও শত্রু, সে কথা বুঝতে চেষ্টা করলে তারই কল্যাণ হতে পারে।

আমার সুচিন্তিত অভিমত, চারদলীয় জোট শুধু তাদের ইতিবাচক গুণাবলির কারণে এত বড় বিজয় লাভ করেনি, শেখ হাসিনার চরম ইসলামবিরোধী, স্বৈরাচারী ও সন্ত্রাসী শাসন থেকে জান বাঁচানোর প্রচণ্ড তাকীদেই জনগণ জোটের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

শেখ হাসিনার সর্বশেষ উপলব্ধি

শেখ হাসিনার নির্বাচনোত্তর আচরণ পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তিনি জনগণ, নির্বাচন ও গণতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে তিনি নির্বাচনের পর সংসদে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিরোধী দলের সংসদীয় ভূমিকা পালন করতেন। তিনি এত অল্পসংখ্যক আসনে বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। হয়তো তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে, তার দল এত কম আসন পাবে। পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে তিনি যাকিছু করতে চেয়েছিলেন তা সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তার ক্ষমতাসীন হওয়া অপরিহার্য ছিল। তাই কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের পূর্বে ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি নির্বাচনে বিজয়ের নীল নকশা তৈরি করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও জনগণের রায়ের প্রতি যদি তার আস্থা থাকত তাহলে জোট সরকারের বিরুদ্ধে তার সকল অভিযোগ নিয়ে তিনি দেশবাসীর দ্বারস্থ হতেন, বিদেশে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতেন না। জনগণকে সংগঠিত করে পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা তিনি করেন না। বিদেশি শক্তি জোট সরকারকে উৎখাত করে তাকে গদিনশীন করে দিক- এমন আজব উদ্দেশ্য ছাড়া কেন তিনি দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে অপপ্রচার চালাবেন? কোনো গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী দল এমন উদ্ভট আচরণ করে বলে নজির নেই। ভারতে বাজপেয়ী সরকারের আমলে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদ করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী হাসিনার মতো ভূমিকা পালন করতে বিদেশে যাননি।

শেখ হাসিনার ইসলাম আতঙ্ক

শেখ হাসিনা তার শাসনামলে অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তিনি কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ভারতপন্থি এবং যারা বাংলাদেশে আল্লাহর আইন, ইসলামী খিলাফত ও শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায়, তাদেরকে তিনি উগ্র মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ বলে ঘৃণা করেন।

www.bjilibrary.com

তিনি আবার ক্ষমতায় বসতে পারলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আদর্শ হিসেবে বহাল করবেন এবং ইসলামকে যারা নিছক একটা ধর্ম বলে বিশ্বাস করে তারা ছাড়া অন্য সব ইসলামপন্থিকে নির্মূল করার চেষ্টা করবেন। তার পিতার আমলে প্রণীত সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন বেআইনি করা হয়েছিল, তিনি আবার তা-ই করবেন। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলে বিশ্বাস করে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন, রাসূলুল্লাহ (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ কায়েম করতে চায়, তাদেরকে তিনি তার প্রধান দুশমন মনে করেন।

তার আচরণের কারণে তার সম্পর্কে দেশবাসীর উপরিউক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলেই গত নির্বাচনে কোনো ইসলামপন্থি ভোটারই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। আওয়ামী ওলামা লীগ গঠন করতে এ কারণেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন যে, জনগণের নিকট আলেম হিসেবে স্বীকৃত কেউ আওয়ামী লীগের সমর্থক নন। ইসলামকে শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠানসর্বস্ব বলে বিশ্বাস করেন, এমন আলেমরা তো রাজনীতি করাকেই হারাম মনে করেন। তারাও হয়তো আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন না।

বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়ার ষড়যন্ত্র

শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছেন যে, দেশে যে ইসলামী শক্তি রয়েছে তা আর কোনো দিন আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে না, জনগণের মধ্যে যারা ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র মনে করে না, তারাও শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন তা চায় না। এ অবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতালাভের কোনো সম্ভাবনা হয়তো নেই। তাই তিনি বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মতো মৌলবাদী ও তালেবান রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে বিদেশি শক্তিকে বাংলাদেশে অভিযান চালানোর জন্য উসকে দিচ্ছেন। হয়তো তিনি আশা করছেন যে, বিদেশি শক্তি জোট সরকারকে উৎখাত করে তাকে আফগানিস্তানের হামিদ কারজাইয়ের মতো ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে।

আমেরিকায় শেখ হাসিনার অপপ্রচার ও আমেরিকার মনোভাব

২০০১ সালের অক্টোবরে জোট সরকার কায়েম হওয়ার পরপরই তিনি আমেরিকা সফরে গিয়েছেন। আফগানিস্তানে আমেরিকার ভূমিকায় আশান্বিত হয়েই হয়তো তিনি সর্বপ্রথম সে দেশেই গিয়েছেন। তিনি জোট সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত দুটো মারাত্মক অপবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন :

১. চারদলীয় জোটের দুটো দলই মৌলবাদী। তাই জোট সরকার অবশ্যই তালেবান। যে কারণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে উৎখাত করা জরুরি ছিল, একই কারণে বাংলাদেশেও জোট সরকারকে উৎখাত করা অপরিহার্য।

২. শেখ হাসিনার মতে, ইসলামপন্থি সবাই সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক। তাই তারা বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালায়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে এবং হিন্দু মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে। আর বিএনপি এসব কুকর্মে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সুতরাং জোট সরকারকে উৎখাত করা অত্যন্ত জরুরি।

www.bjilibrary.com

আমেরিকা ও ইউরোপ এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। কারণ, এসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কোনো সত্যতা খুঁজে পান না। আমেরিকার সরকারি দায়িত্বশীলগণও বাংলাদেশ সফর করে এ দেশকে 'উদার মুসলিম রাষ্ট্র' বলে মন্তব্য করেছেন এবং এ দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ দেশে মৌলবাদীদের উত্থান সম্পর্কে পুস্তিকাকারে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা সত্ত্বেও তিনি বিভ্রান্ত হননি। তিনি তাঁর রাষ্ট্রদূত থেকে সঠিক তথ্য পেয়ে বাংলাদেশের প্রশংসাই করে গেছেন। ২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হলে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশে এসে প্রধান দুই দলের নেত্রীদ্বয়ের সাথে একান্তে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারা দুজনই তাঁর নিকট কথা দিয়েছেন যে, তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন এবং যে দলই সরকার গঠন করুক, বিরোধী দল হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন। তারা উভয়েই হরতাল ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করবেন না বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

অবশ্য এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে দাবিদার ও এ দেশের দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধানকে অন্য দেশের এক নেতা এসে উপদেশ দিতে হয় এবং তাদের নিকট থেকে গণতান্ত্রিক আচরণের অঙ্গীকার নিতে হয়। তারা উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে রাজনৈতিক মুরব্বি হিসেবে জিমি কার্টারকে গ্রহণ করেছেন বলেই তো তিনি এ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন। জিমি কার্টার বাংলাদেশকে ভালোবাসেন মনে করেই হয়তো দুই নেত্রী তাঁকে এ সুযোগ দিয়ে থাকবেন। জিমি কার্টারের ভূমিকা আন্তরিক বলেই মনে হয়েছে। তা না হলে তিনি এভাবে বাংলাদেশে আসবেন কেন? তিনি কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিরও প্রশংসা করেছেন এবং তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র বিকাশের জন্য এটি উপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় নির্বাচনের দিন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আবার আসবেন বলে ঘোষণা করেও ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি।

ভারতই শেখ হাসিনার শেষ ভরসা

'বাংলাদেশ বর্তমানে একটি তালেবান রাষ্ট্র এবং জোট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে' বলে প্রচারণা চালিয়েও আমেরিকাকে উত্তেজিত করতে না পেরে শেখ হাসিনা হতাশ হয়ে ভারতের হস্তক্ষেপের আশায় তার কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

২০০৪ সালের মে মাসে ভারতের জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিজয়ী হওয়ার পর কোয়ালিশন সরকার কায়েম করেছে। নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর সরকারের বিদেশনীতি ঘোষণা করে প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বিজেপির বাজপেয়ী সরকারের আমলের আচরণে অতিষ্ঠ ও ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ঐ ঘোষণায় আশান্বিত হয়েছে যে, মনমোহন সরকার থেকে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করা যায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান দিল্লি সফর

www.bjilibrary.com

থেকে ফিরে এসে ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের উদার মনোভাবে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করেননি।

২০০৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে যখন ভয়াবহ ব্যাপক বন্যায় ৩/৪ কোটি মানুষ দুর্গতি পোহাচ্ছে তখন শেখ হাসিনা জননেত্রী ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার দায়িত্ববোধ নিয়ে দুর্গত জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে দিল্লি যাওয়া কেন অপরিহার্য মনে করলেন, সে প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। কারণ, তাঁর উপর এমন কোনো সরকারি দায়িত্ব ছিল না যে, দেশে বন্যাদুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে দিল্লি সফর অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হতে পারে।

বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার বীনা সিক্রি তাঁর বাসভবনে গিয়ে ভারত সফরের জন্য মনমোহন সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটাও বিস্ময়কর। নতুন ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের সরকারপ্রধানকে দাওয়াত দেওয়ার আগে বিরোধীদলীয় নেতাকে নিমন্ত্রণ করাটা কি স্বাভাবিক মনে হয়? তিনি সরকারি দাওয়াতে যাওয়া সত্ত্বেও ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তিগত সফরে যাচ্ছেন, অথচ তিনি সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান, কংগ্রেস দলীয় প্রধান, বিরোধীদলীয় প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

ফিরে এসে তিনি নিজেই সফরের বিবরণ দিয়ে দেশবাসীকে জানালেন, ভারতের নেতৃবৃন্দ তার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রদ্রোহীরা বাংলাদেশে আশ্রয় পায় কি না? তিনি বলেছেন যে, এ প্রশ্ন শুনে তিনি খুবই বিব্রতবোধ করেছেন এবং লজ্জিত হয়ে তাঁদেরকে জানিয়েছেন, এ বিষয়ে বর্তমান সরকারই জবাব দেবে, তিনি এ বিষয়ে জানেন না। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে বিজেপি সরকার এ মিথ্যা অভিযোগ করলে তিনি বলিষ্ঠভাবে তা অস্বীকার করেছিলেন। এখন তিনি না জানার ভান করে যা বললেন তা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তাঁরা সহজেই বুঝে নিয়েছেন যে, হাসিনা সরকারের আমলে বিদ্রোহীরা প্রশ্রয় না পেলেও বর্তমান তালেবান(!) সরকারের আমলে অবশ্যই বিদ্রোহীদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ প্রশ্নের জবাবে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করাই দেশপ্রেমের দাবি ছিল। তিনি অবশ্যই জানেন যে, এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

শেখ হাসিনার এ সফরের পর থেকেই ভারতের নেতাদের সুর একদম বদলে গেল। তাঁরা আগের চেয়ে বেশি জোর দিয়েই ঐ অভিযোগ উচ্চারণ করতে লাগলেন। অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তীব্র প্রতিবাদ করে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, 'হেলিকপ্টার রেডি আছে। আপনারা এসে চিহ্নিত করুন, কোথায় বিদ্রোহীদের ক্যাম্প আছে।' ভারতীয় হাইকমিশনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ধরন ও ভাষায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। দিল্লিতে হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠানো হলো। কয়েকদিন পরই ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব বীরেন্দ্র সিং-এর ঢাকায় আসার কথা ছিল। ঐ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর আসা মুলতবি হয়ে গেল কি না, সে আশঙ্কাও কোনো কোনো মহল থেকে প্রকাশ করা হয়েছে; কিন্তু ভারত সরকার আর তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি। এতে বোঝা গেল, সত্যি কথা জোরালো ভাষায় ও নির্ভীকভাবে বললে মেনে নিতে হয়। ইতঃপূর্বে কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেননি বলেই হাইকমিশনার একটু প্রতিক্রিয়া দেখালেন।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনার রাজনীতি ও ভারতের সমর্থন

শেখ হাসিনার ভারত সফরে ভারতের আধিপত্যবাদী মহলের ধারণা হলো যে, তিনি ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। বাংলাদেশের একটি বৃহৎ দলের নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং দাবি করছেন যে, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে। ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহ তার বক্তব্যকে লুফে নিয়ে ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাল যে, সংখ্যালঘুদেরকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের উপর ভারত সরকারের সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ভারত সরকার শেখ হাসিনার এ রাজনীতিকে তাদের স্বার্থের জন্য বিরাট সহায়ক মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। একটি ঘটনায় প্রমাণ হলো যে, মনমোহন সরকার শেখ হাসিনার রাজনীতিকে সমর্থন করেছেন। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে সার্ক সম্মেলন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে শেখ হাসিনা নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সার্ক সম্মেলন মুলতবি করার দাবি জানালেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। এ উপলক্ষে ঢাকা মহানগরীকে অপরূপ সজ্জায় ভূষিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং হঠাৎ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আসবেন না। সার্ক সম্মেলন মুলতবি হয়ে গেল। শেখ হাসিনা উল্লসিত হলেন যে, তার রাজনীতিকে ভারত সরকার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতা দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা এসে সার্ক সম্মেলনের বিরাট সাফল্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে মনে হয়েছে যে, ভারত সরকার শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি হয়তো আর সমর্থন করবে না।

২৭১.

আরো একটা সড়ক দুর্ঘটনা

ইতঃপূর্বে সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে আমার বড় ছেলের সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ঘটনা লিখেছি। আজ আবার আরো একটা সড়ক দুর্ঘটনার কথা লিখছি। এ দুর্ঘটনা লন্ডন থেকে ৬০ মাইল উত্তরে নর্দাম্পটন শহরের কাছে ঘটেছে। আমার পঞ্চম ছেলে নোমান তার স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে ম্যানচেস্টার থেকে লন্ডনে ওর শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিল। নোমান গাড়ি চালাচ্ছিল। পাশের সিটে স্ত্রী পারভিন। পেছনে বড় ছেলে ইউসুফ (ও-লেভেল পরীক্ষা দিয়েছে), মেয়ে নাওমী (১১ বছর) ও ছোট ছেলে মাশআল (২ বছর) বেবি সিটে বাঁধা।

নোমান ১৬ বছর ধরে ম্যানচেস্টারে আছে। লন্ডনের পর এটাই ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। টেক্সটাইল ক্যাপিটাল (বস্ত্রশিল্পের রাজধানী)-খ্যাত এ শহরে আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীন ১৯৭২ সাল থেকে আছে, তৃতীয় ছেলে মোমেন ১৯৯৬ সাল থেকেই বসবাস করছে। এরা দুজন নিজস্ব বাড়িতেই থাকে। বড় ছেলে মামূন জেদ্দায় থাকলেও ওর তিন ছেলে ও বড় মেয়ে নিজেদের বাড়িতে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। ওর বড় ছেলে নাবীল এমএ ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ফলের অপেক্ষায় আছে।

www.bjilibrary.com

নোমান লন্ডন যাতায়াত করতে গভীর রাতে ভিড় কম থাকে বিধায় তখনই গাড়ি চালাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। প্রায় দু শ' মাইল পথ। খুব ক্লান্তিবোধ করায় পারভিন দাবি করল যে, কোনো সার্ভিস স্টেশনের হোটেলে রাতে ঘুমিয়ে সকালে বাকি সফর করা হোক। অর্ধেকের বেশি পথ চলার পর হোটেলে রাত যাপনশেষে সকালে নাশতা সেরে রওয়ানা হওয়ার পনেরো মিনিট পরই দুর্ঘটনায় পতিত হলো। পেছনের সিটে ইউসুফ ও নাওমী হেডফোন লাগিয়ে ক্যাসেট থেকে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। গাড়ি হাইওয়েতে ৭০ মাইল বেগে চলছে।

হাইওয়েতে কয়েকটি লাইনে গাড়ি চলতে থাকে। নোমানের গাড়ি যে লাইনে (ট্র্যাকে) চলছিল, তার পাশের ট্র্যাক থেকে বিশাল এক লরি ঐ ট্র্যাকে আসতে গিয়ে নোমানের গাড়িকে আঘাত করল। নোমানের গাড়ির টায়ার বার্স্ট করল। সে গাড়ি থামাতে চেষ্টা করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্টিয়ারিং ধরে কোনো রকমে গাড়ি থামাল। এ কসরতের সময় গাড়ি একাধিক ট্র্যাকে ছোটাছুটি করেছে। আল্লাহর অসীম রহমতে এ সময় ঐ ট্র্যাকগুলোতে কোনো গাড়ি চলাচল করেনি। হাইওয়েতে সবসময়ই উচ্চ গতিতে গাড়ি চলে। দুর্ঘটনার সময় যদি পেছন থেকে বেগবান ট্রাক বা লরি এসে পড়ত, তাহলে হঠাৎ থামানো সম্ভব হতো না। এ অবস্থায় নোমানের গাড়ির উপর চড়াও হলে কেউই বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ সময় সবাই কাতরভাবে আল্লাহকে ডাকছিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ হাজির হয়ে গেল, দেখা গেল পারভিনের ডান হাতের মাসল থেতলিয়ে গেছে। পুলিশ তখনই এম্বুলেন্স ডেকে পারভিনকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। ইউসুফের মাথা গাড়ির জানালায় ধাক্কা খেলেও জখম হয়নি। সেও ওর মায়ের সাথে গেল। পুলিশ ম্যানচেস্টারে নোমানের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে ফোনে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল। দুর্ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী শহর নর্দাম্পটন থেকে কোম্পানির বিশাল ট্রাক এসে নোমানের দুমড়ানো গাড়ি ট্রাকে উঠিয়ে নিল এবং নোমান, নাওমী ও মাশআলকে বিকাল ৪টায় লন্ডনে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিল। পারভিন ও ইউসুফ তখনো পৌঁছেনি। ওরা ট্রেনে পরে পৌঁছল। পারভিন বেচারিই বেশি আহত হয়েছে। সুস্থ হতে কমপক্ষে এক মাস সময় লাগবে বলে ডাক্তার বলেছেন।

ইউসুফের মাথার আঘাত কয়েকদিনেই সেরে যাবে এবং নোমানের সারা গায়ে যে ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, তা বিশ্রাম নিলে চলে যাবে বলে ডাক্তার জানিয়েছেন।

বিপদ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না বলে সূরা তাগাবুনের ১১ নং আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যিনি বিপদ দেন, তিনিই উদ্ধার করেন। জেদ্দায় মামূন গাড়িতে একা ছিল আর নোমানের গাড়িতে ওর গোটা পরিবার ছিল। সে বিবেচনায় এ দুর্ঘটনা আরো বেশি মারাত্মক। এত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে তাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আরো মযবুত হলো। আমি ও আমার স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মাথানত করলাম।

নোমান জানিয়েছে, তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এখনই ব্যবহার করার জন্য একটা গাড়ি দেবে। কিছুদিন পর ওর গাড়ির মূল্য নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ন্যায্য মূল্য দেবে,

www.bjilibrary.com

যাতে সে ঐ টাকা দিয়ে পছন্দমতো গাড়ি কিনে নিতে পারে। নোমানের কোম্পানি নাকি ঐ গাড়ির ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিকট থেকে নোমানদের আহত হওয়ার ক্ষতিপূরণ জোগাড় করে দেবে।

ইতঃপূর্বে লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার যাওয়ার পথে আমি দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, গতিমান গাড়ির চাকা নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে কেমন বেগ পেতে হয়। আমি সৌদি আরব থেকে রমযানের পর ম্যানচেস্টারে ছেলেদের সাথে ঈদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে লন্ডন বিমানবন্দরে রাত ১০টায় পৌঁছলাম। আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীন গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। সে ড্রাইভিং সিটে আর আমি ওর পাশের সিটে বসা ছিলাম। গাড়ি ৬৫ মাইল গতিতে চলছিল। হঠাৎ দেখলাম, গাড়ি আমার দিক দিয়ে কাত হয়ে গেল। গাড়ির সম্মুখের অংশ রাস্তায় ঘষা খাচ্ছে। আর আমীন সর্বশক্তি দিয়ে গাড়িকে রাস্তায় থামানোর জন্য স্টিয়ারিং চেপে আছে। থামার পর জানা গেল, আমার দিকের সামনের চাকাটা খুলে পড়ে গেছে। কোনো গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হলে ঐ অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য ছিল।

আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সরকার উৎখাতের আন্দোলন

ফ্যাসিস্ট মনোবৃত্তির আওয়ামী লীগ কোনো গণতান্ত্রিক নিয়মেরই ধার ধারে না। ২০০১ সালের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হয়েছে। নির্বাচনে পরাজিত হলে নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নেওয়ার ঐতিহ্য অনুযায়ী শেখ হাসিনা ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত সংসদ সদস্য হিসেবে আওয়ামী এমপিগণ শপথ গ্রহণ করেছেন; কিন্তু সংসদে না গিয়ে তারা রাজপথে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

শেখ হাসিনা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রথমে নির্বাচন বাতিল করে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আবদার পেশ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি এ অযৌক্তিক দাবির কোনো জবাব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেননি। এরপর তিনি প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করার দাবি জানিয়েছিলেন। একটি নির্বাচিত সরকারকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পদত্যাগ করার দাবি জানানো গণতন্ত্রের কোন্ বিধানে আছে?

২০০৪ সালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রাজনীতিতে চমক সৃষ্টি করলেন। এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি ট্রামকার্ডের হুমকিও দিলেন। বাস্তবে পর্বতের মুসিকও প্রসব হলো না।

এরপরও তারা নির্লজ্জের মতো সরকারের পদত্যাগ দাবি করা অব্যাহত রাখলেন। গণ-অভ্যুত্থানের হুমকি দিয়ে পদত্যাগে বাধ্য করবেন বলে আস্ফালন দেখাচ্ছেন। আমি জুন (২০০৬) মাসের শেষদিকে লিখছি। চারদলীয় জোট সরকারের সাংবিধানিক মেয়াদ আর মাত্র চার মাস বাকি আছে। গত সাড়ে চার বছর ধরেই জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি করা হচ্ছে। এখনো দাবি অব্যাহত আছে। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মেধার মান যা-ই থাকুক, তাদের রাজনৈতিক একগুঁয়েমির প্রশংসা না করে পারা যায় না। একবার যে কথা বলা হয়ে গেছে, যত অযৌক্তিক ও অসময়োপযোগীই হোক, তা বলে যেতেই হবে।

www.bjilibrary.com

গণতান্ত্রিক ভাষা তাদের মুখে জোটে না

মানুষের মন-মানসিকতা, মর্জি-মেজায ও অস্থিমজ্জায় যে ভাবধারা লালিত-পালিত হয় তা-ই মুখের ভাষায় উচ্চারিত হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাকশালী ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা আওয়ামী লীগ-নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক ভাষায় কথা বলতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ইস্যুতে নিজস্ব মতামত পেশ করে থাকে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল নিজস্ব মতামতের পক্ষে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করে। তাদের মতামতকে দাবি হিসেবে সরকারের নিকট পেশ করার সময় তাদের দাবিকে জনগণের দাবি বলেও উল্লেখ করতে পারে। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে, তাদের এ দাবি সঠিক কি না। সরকার কোনো দাবি মানতে অস্বীকার করলে জনগণের দোহাই দিয়ে বলা যায় যে, জনগণ এ দাবি আদায় করে ছাড়বে। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আরো কঠোর ভাষায় এ কথাও বলতে পারে যে, অমুক দাবি না মানলে আমরা নির্বাচন বর্জন করতে বাধ্য হব। সরকারকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারে যে, অমুক দাবিকে আমরা নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে জনগণের দরবারে পেশ করব। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে।

এ জাতীয় গণতান্ত্রিক ভাষা আওয়ামী লীগ-নেতাদের মুখে জোটে না। তাদের ভাষা নিম্নরূপ :

১. অমুক দাবি না মানলে দেশে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না।
২. এ সরকারকে একদিনও স্বস্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না।
৩. আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে।
৪. অমুক দাবি আন্দোলন করে আদায় করা হবে।
৫. কোথাও কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটলে বিনা তদন্তে ঘোষণা করা হয় যে, এর জন্য অমুক শক্তি দায়ী।
৬. কোনো সমস্যার সমাধানে আলোচনা বা সংলাপে বসতে কিছুতেই রাজি না হয়ে তারা যা বলেছেন, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে।
৭. তাদের দাবি হুবহু মানার নিশ্চয়তা না দিলে তারা সংলাপে বসবেন না।
৮. সংলাপে সরকারি পক্ষে কে কে থাকবেন বা থাকবেন না, সে বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তারা সংলাপে বসবেন না।

ভাঙচুর ও জ্বালাও-পোড়াও তাদের আদি কর্মপদ্ধতি

আমি ১৯৩৯ সাল থেকে রাজনৈতিক ময়দানে আছি। তখন মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ। কিছু মুসলমান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে শরীক থাকলেও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে মুসলিম লীগ ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না। আল্লামা মাশরেকীর খাকছার আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য থাকলেও এ দেশে তা মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভারতের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে আরো কতক মুসলিম রাজনৈতিক দল থাকলেও এ দেশে ছিল না।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং তাঁরই উদ্যোগে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) ১৯৫৭ সালে কায়েম হয়েছে। ১৯৫৩ সালে নেজামে ইসলাম পার্টি ময়দানে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকেই ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। ১৯৭২ সালের আগে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো প্রকাশ্য তৎপরতা ছিল না। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অনুপ্রবেশ করে ঐ দলের মাধ্যমে কাজ করত। বাংলাদেশ হওয়ার পর তো ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন নতুন দল গজাতে থাকল। আমার চোখের সামনেই বিগত ৬৫ বছরের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছে।

আমি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে বলতে চাই যে, এ দেশে আওয়ামী লীগই 'ভাঙচুর ও জ্বালাও-পোড়াও-কে রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল বা অবরোধজাতীয় কর্মসূচি পালনকালে ভাঙচুর ও জ্বালাও-পোড়াও করা অপরিহার্য। হরতাল করা তাদের যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার, হরতাল না করাও তো অন্যদের নাগরিক অধিকার। তাদের হরতাল হলেই ভাঙচুরের ভয়ে অনেকেই গাড়ি রাস্তায় বের করে না। দায়ে ঠেকা যাত্রীবাহী বাস, ট্যাক্সি বা স্কুটার রাস্তায় দেখলেই তাদের খুন চড়ে যায়। তাদের হরতালের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা যারা প্রদর্শন করে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া তাদের বাকশালী অধিকার। তারা যাত্রীসহ বাস পুড়িয়ে দেয়। তাদের ভয়ে যারা দোকানপাট বন্ধ রাখে না তাদেরও রক্ষা নেই। হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চলতে থাকে।

সমাজে ভালো কাজ চালু করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ; কিন্তু যা মন্দ তা অতিসত্বর ও সহজেই চালু হয়ে যায়। বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নকলপ্রবণতা, ভাঙচুর ইত্যাদি দেশে ব্যাপক আকারে চালু আছে। অবশ্য গত কয়েক বছরে জোট সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নকলপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণে এসেছে; কিন্তু অন্যান্য মন্দ কাজ যথানিয়মেই চালু রয়েছে। বিশেষ করে রাজপথে গাড়ি ভাঙচুর করার কালচার এতটা ব্যাপক যে, তা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আওয়ামী লীগের যেকোনো প্রতিবাদ মিছিলে যেমন ভাঙচুর চলে, শ্রমিক ও ছাত্রমহলেও যেকোনো রকম প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য গাড়ি ভাঙচুর অপরিহার্য বলে মনে করা হচ্ছে। এখন প্রতিবাদের একমাত্র ভাষাই হলো গাড়ি ভাঙচুর। এ কালচার আওয়ামী লীগের বিরাট অবদান। আওয়ামী লীগের ক্যাডার যেখানেই আছে, সেখানেই এর প্রকাশ ঘটে। এমনকি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ছাত্রমহলে পর্যন্ত এ প্রবণতা দেখা যায়।

রাজপথে বাসে চাপা পড়ে কেউ মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদে এ পথে গাড়ি ভাঙা শুরু হয়ে যায়। যে গাড়ি চাপা দিয়েছে সে গাড়ির নাগাল পেলে তা পুড়িয়ে দেওয়াই কর্তব্য হয়ে যায়। ঘাতক গাড়ির নাগাল না পেলেও রাস্তায় ভাঙার জন্য গাড়ির তো কোনো অভাব নেই।

কয়েকদিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র ট্রেনে কাটা পড়েছে। ট্রেনকে দুনিয়ার কোথাও দোষ দেওয়া হয় না। বাস ড্রাইভারের অপরাধে দুর্ঘটনা হতে পারে,

www.bjilibrary.com

তার অবহেলায় কেউ চাপা পড়তে পারে; কিন্তু ট্রেনে কাটা পড়ার জন্য ট্রেনের ড্রাইভারের অপরাধ ধরা হয় না। তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বান ছাত্ররা রেল স্টেশনে আগুন দিল এবং ট্রেন ভাঙচুর করল। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকেও এর জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁর বাসভবনে হামলা করা হলো।

শ্রমিকদের দাবি জানানোর অধিকার আছে; কিন্তু দাবি জানাতে গিয়ে কারখানায় ভাঙচুর করা জরুরি কেন? দেশের যেকোনো জিনিস নষ্ট করা হলে তা জাতিরই ক্ষতি। এ জাতীয় ভাঙচুর করে দেশের কোনো কল্যাণ হতে পারে না।

আওয়ামী লীগের ১১ জুন (২০০৬) ঢাকা অবরোধের কর্মসূচিতে মগবাজারে রেল লাইনের নিচ থেকে কাঠ তুলে আগুন দেওয়া হলো। এটা কোন্ জাতীয় রাজনীতি? তাদের কর্মসূচি চলাকালে যেসব নাশকতামূলক কার্যকলাপ চলে, এর জন্যও সরকারি দলকে দায়ী করা হয়। যাত্রীসহ বাস পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার নিন্দা জানিয়ে কোনো বিবৃতিও তারা দেন না।

দেশের সম্পদ ধ্বংস করার এ জঘন্য কালচার বন্ধ না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারি ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান এবং এ প্রবণতা বন্ধ করার জন্য যদি সকল মহল একযোগে সোচ্চার হন, তাহলে ধীরে ধীরে এ জঘন্য কালচার থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে।

আমার আশঙ্কা হয়, সরকার উদ্যোগ নিলেও আওয়ামী লীগ সাড়া দেবে না। সন্ত্রাস দমনে সরকার তাদের সহযোগিতা বারবার চেয়েও পায়নি। দেশ থেকে ভাঙচুরের কালচার উঠে গেলে আওয়ামী লীগের হরতাল বানচাল হওয়ার আশঙ্কায়ই তারা সাড়া দেবেন না বলে আমার ধারণা।

আমি সরকার ও সকল মহল বিশেষ করে সুশীল সমাজের নিকট আকুল আবেদন জানাই, আত্মঘাতী ভাঙচুর কালচারের বদ অভ্যাস থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করার জন্য অবিলম্বে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করুন। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে যেমন পরিবেশ দূষণবিরোধী আন্দোলন চলছে, তেমনি কোনো মহল থেকে ভাঙচুরবিরোধী আন্দোলনের উদ্যোগ নেওয়া হোক।

২৭২.

শেখ হাসিনা ও সন্ত্রাস

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই সমাবেশে বোমা মেরে গণহত্যার ঘটনা একটার পর একটা ঘটেছিল। যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে, পল্টনে কমিউনিস্ট পার্টির সমাবেশে, রমনা বটমূলে পয়লা বৈশাখের উৎসবে বোমা ফাটিয়ে বহু লোককে হতাহত করা হয়েছিল। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় গোপালগঞ্জে বোমা পাওয়া গিয়েছিল, যা বিস্ফোরিত হয়নি।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনা কোনো একটি ঘটনারও তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, তিনি তদন্ত ছাড়াই গায়েবি ইলমে জানতে পেরেছেন যে, মৌলবাদীরা এর জন্য দায়ী। রমনা বটমূলের ঘটনা ঘটার পরপরই মৌলবাদীদেরকে দোষী বলে আখ্যায়িত করে লেখা বিরাট ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হলো। বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার সাথে সাথেই ব্যানার কেমন করে লেখা হয়ে গেল, সে এক বিরাট রহস্য।

শেখ হাসিনা যদি প্রথম ঘটনার পরই নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করতেন তাহলে হয়তো পরবর্তী ঘটনাগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। কেন তিনি তদন্ত করা প্রয়োজন মনে করলেন না, তা বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। বিনা তদন্তে যাদেরকে তিনি দোষী বলে বিবৃতি দিলেন, তাদের দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন না কেন?

সন্ত্রাস দমন করার সামান্য ইচ্ছা থাকলেও তিনি প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করে দোষীদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ঐ জাতীয় সন্ত্রাস দেশের জন্য মারাত্মক। অথচ তা দমন করার কোনো প্রচেষ্টা তিনি চালালেন না। ফলে সন্ত্রাস বেড়েই চলল।

জোট সরকারের আমলে সন্ত্রাস

চারদলীয় জোট সরকার ২০০১ সালের অক্টোবরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা শেখ হাসিনার সমাবেশে ঘটল। রাজধানীর কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা হয়ে গেল।

শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলানেত্রী আইভি রহমানসহ ২৩ জন নিহত এবং অনেক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন, এর আশপাশে প্রায় ডজনখানেক গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; কিন্তু ট্রাকের মধ্যে একটাও পড়েনি। পড়লে হয়তো তার জীবনও বিপন্ন হতো। তাই ঘটনাটি বড়ই গুরুতর, আবেগময় ও উত্তেজনাপূর্ণ।

শেখ হাসিনার শাসনামলেও বহু সমাবেশে অনুরূপ হামলায় অনেক লোক নিহত ও আহত হয়েছে। তিনি সেসবের কোনোটিরই রহস্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করেননি।

২১ আগস্টের ঘটনার পরপরই জোট সরকারপ্রধান সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। শেখ হাসিনা ঘটনার সাথে সাথেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন। পরে মৌলবাদীদেরকে, এমনকি সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত দায়ী করলেন। তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করলেন। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ইন্টারপোল ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই বাংলাদেশে এসেছিল। শেখ হাসিনার সাথে প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা করা হলো। শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতৃবৃন্দ তদন্তকারীদেরকে সাক্ষাৎকার দিতেও

www.bjilibrary.com

অস্বীকার করলেন। তারা জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে তদন্ত চাইলেন। তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, এ জাতীয় কাজ ঐ দুসংস্থার করণীয় নয়। আসলে তারা তদন্ত চান না। তাদের টার্গেট হলো, জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং বাংলাদেশকে তালেবানি রাষ্ট্র প্রমাণ করে বিদেশি শক্তিকে উসকানো।

কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এমন কথা বলতে পারে না যে, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সন্ত্রাস করে নিজের সরকারকে দুনিয়ার সামনে হেয়প্রতিপন্ন করতে পারেন। আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। দুনিয়ায় এমন কোনো সরকার কল্পনা করা যায় না যে, সরকার স্বয়ং সন্ত্রাস করে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালেও সন্ত্রাস দমনের প্রচেষ্টা চালাননি। এখন তিনি বিরোধীদলীয় নেতা। সন্ত্রাস দমন করে সরকার কৃতিত্ব লাভ করুক, তা তিনি চাইতে পারেন না। তাই তার জনসমাবেশে গ্রেনেড হামলার তদন্তে সরকারকে সহযোগিতা করা দূরে থাকুক, ইন্টারপোল ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা বিদেশি ও নিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে পর্যন্ত সহযোগিতা করেননি। তদন্তে আসল অপরাধী চিহ্নিত হয়ে গেলে শেখ হাসিনা যাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলেছেন, তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যাক– এটা তিনি চাইতে পারেন না।

জেএমবির সন্ত্রাস ও শেখ হাসিনার ভূমিকা

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একই সময়ে বোমা হামলা হয়ে গেল। যারা করেছে তারা বোমার সাথে হ্যান্ডবিলও ছড়িয়ে জানিয়ে দিয়েছে। জেএমবি (জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ) এতটা সংগঠিত দেখে সবাই বিস্মিত। এ ঘটনা সরকারকে সাংঘাতিকভাবে চমকে দিল। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ টেরই পেল না যে, গোপনে একটি শক্তি সকল জেলাশহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একযোগে একই সময়ে বোমা হামলা করতে সক্ষম হলো।

এ ঘটনা সারা দুনিয়ায় বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করল। বাংলাদেশে সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক এমন সুসংগঠিত বলে ইতঃপূর্বে জানা যায়নি। সরকারের আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ হতভম্ব হয়ে গেল।

আমি তখন ইংল্যান্ডে ছিলাম। এর পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়াবহ বোমা হামলায় অর্ধশত লোক নিহত হয়েছিল। ঐ ঘটনা ব্রিটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে হামলা শুধু লন্ডনে ঘটেছিল। সারা দেশের অন্য কোথাও কোনো ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশে একই সময়ে ৬৩টি জেলাশহরে সংগঠিত বোমা হামলার খবর ওখানকার পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। আমি চরম বিব্রতবোধ করেছি এবং অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনার ভূমিকা বড়ই আজব। তার স্বভাবসুলভ মেজাজ অনুযায়ী তিনি বলে ফেললেন, 'জোট সরকারই এ কাজ করেছে। সরকারে শরীক মৌলবাদী শক্তি দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে।' তিনি অতি সহজেই হিসাব মিলিয়ে ফেললেন যে, বোমাবাজরা ইসলামী আইন চায়। নিশ্চয়ই

www.bjilibrary.com

জামায়াত তাদেরকে এ কাজে লাগিয়েছে। তার দলের এক এমপি নির্দ্বিধায় বলে ফেললেন, 'নিজামীকে রিমান্ডে নিলে সব রহস্য বের হয়ে যাবে।'

ভারতপন্থি, ধর্মনিরপেক্ষ ও আওয়ামী লীগ বলয়ের সকল মিডিয়া তার স্বরে অপপ্রচার চালাল যে, জামায়াত-শিবিরের লোকেরাই জেএমবির ক্যাডার। জেএমবির যারা গ্রেফতার হচ্ছিল, তাদেরকে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তারা সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালাল। জেএমবির যারা গ্রেফতার হয়ে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছে তাদের বরাত দিয়ে মিথ্যা দাবি করা হলো যে, জামায়াত তাদের সাথে আছে। অথচ কোনোটাই প্রমাণ করা গেল না।

জেএমবির শীর্ষনেতারা যখন র‍্যাবের হাতে ধরা পড়ল তখন শেখ হাসিনা এটাকে নাটক আখ্যায়িত করলেন। তার মতে, সরকারই সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, এখন গ্রেফতার করে জনগণকে দেখাচ্ছে যে, সন্ত্রাসীদেরকে দমন করা হচ্ছে। তিনি যা যখন মুখে আসে তা-ই বলে ফেলেন। তার মতো মর্যাদার মানুষ এমন কথা কেমন করে বলতে পারেন, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। সুপ্রিম কোর্ট তাকে 'রং হেডেড' বলে যে উপাধি দিয়েছে, তা সত্যিই যথার্থ। সব ব্যাপারেই তিনি আজব মন্তব্য করতে পারদর্শী।

জেএমবির দেশব্যাপী বোমা হামলায় সরকার ও দেশবাসী যখন উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত, তখন টিভি চ্যানেলে শেখ হাসিনার চেহারা উল্লসিত বলে আমার মনে হয়েছে। তিনি খুব সন্তুষ্টচিত্তে ব্যাপক জঙ্গি তৎপরতার জন্য সরকারকেই দায়ী করে বারবার বক্তব্য দিচ্ছিলেন। তিনি সরকারকে ব্যর্থ ও দেশকে অকার্যকর প্রমাণ করার যে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে এলেন, তা সত্য প্রমাণিত হোক– এটাই হয়তো চাচ্ছিলেন। তাই সন্ত্রাসের বিস্তারে তার উল্লসিত হওয়ারই কথা। কিন্তু যখন শীর্ষনেতারা ধরা পড়ল তখন স্বাভাবিক কারণেই তিনি খুশি হতে পারলেন না। সন্ত্রাস দমন হয়ে গেলে সরকার ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয় না। সন্ত্রাস দমনে সরকার সফল হলে তার আশা পূরণ হতে পারে না। দেশবাসী যত খুশিই হোক, তিনি মোটেই খুশি হতে পারলেন না। তাই এটাকে নাটক বলে আত্মতৃপ্তিবোধ করলেন।

বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে সার্ক সম্মেলনে তিনি মর্যাদার আসনই পেতেন; কিন্তু সার্ক সম্মেলনের সময় তিনি উত্তরবঙ্গে চলে গেলেন। সার্ক সম্মেলনে সাফল্যের কৃতিত্ব অন্য কেউ পাক, এটা তার সহ্য হলো না। একবার এ সম্মেলন মুলতবি করিয়ে তিনি সাফল্য লাভ করেছেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মেলন সফল হয়ে গেলে দুঃখ পাওয়ারই কথা। হিংসায় জ্বলে-পুড়ে তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হয়।

তার আজব ভূমিকা দেখে মনে হয়, তিনি ক্ষমতায় যেতে না পারলে বাংলাদেশ গোল্লায় যাক— তাতে তার কিছু আসে-যায় না। বাংলাদেশের সুনাম, কল্যাণ, উন্নতি তার নিকট বড় কথা নয়। তার ভূমিকা বিদেশে দেশের মর্যাদা কতখানি ক্ষুণ্ন করেছে তা উপলব্ধি করতে তিনি সক্ষম কি না, আল্লাহই ভালো জানেন। তিনি ২০০১ সাল থেকে যে ভূমিকা পালন করছেন, তা কি দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করে?

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনার অতি উর্বর মস্তিষ্ক

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তার অতি উর্বর মস্তিষ্কে এমন আজব ধরনের চিন্তা সৃষ্টি হয়, যা অন্য কারো পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজুদ্দীন আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বঙ্গভবনে গেলেন। পরের দিন রাষ্ট্রপতিকে চেকআপের উদ্দেশ্যে সিএমএইচে নেওয়া হলো। সেখানে তাঁর হার্টে সমস্যা ধরা পড়লে পরের দিনই তাঁকে সিঙ্গাপুরে অপারেশনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

শেখ হাসিনা মন্তব্য করলেন, 'প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের পরপরই হঠাৎ রাষ্ট্রপতি এমন অসুস্থ হলেন কেমন করে? নিশ্চয়ই তিনি রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়ে নির্বাচনে জয়ী হতে চান।'

সরকারি সকল ক্ষমতা তো প্রধানমন্ত্রীর হাতেই। তিনি রাষ্ট্রপতি হতে চাইবেন কোন্ দুঃখে? এটুকু আক্কল শেখ হাসিনার না থাকার কথা নয়। ঘায়েল করার জন্য কিছু তো বলতেই হয়। কিন্তু তার বক্তব্য হাস্যকর কি না, সে কথা বোঝার যোগ্যতাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েম করে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হীন উদ্দেশ্যে তাঁরই নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদুল্লাহকে সরিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। সে রকম কোনো দুরভিসন্ধি বেগম জিয়া করছেন বলে শেখ হাসিনা সন্দেহ করতে পারেন।

শেখ মুজিবের সময় তো গোটা জাতীয় সংসদ তাঁর পূর্ণ অনুগত ছিল। তিনি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদে কয়েক মিনিটের মধ্যে বাকশালী আইন পাস করিয়ে ফেললেন। সংবিধান সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার কায়েম করতে হলে বেগম জিয়াকে জাতীয় সংসদে সংশোধনী আনতে হবে। বেগম জিয়া এমন কোনো উদ্যোগ নেবেন বলে তাঁর চরম কোনো দুশমনও মনে করে না। তিনি প্রধানমন্ত্রী আছেন। মেয়াদ শেষ হলে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নির্বাচন করবেন। এ সময় তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ কোথায়? ড. ইয়াজুদ্দীন যদি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হওয়ার কারণে পদত্যাগ করেন বা আল্লাহ না করুন তিনি যদি ইন্তিকাল করেন, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী নতুন করে অন্য কেউ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। ড. ইয়াজুদ্দীনের অসুস্থ হওয়ার সাথে বেগম জিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ দখল করার কোনো দূরতম সম্পর্কও কেউ তালাশ করে পাবেন না। অথচ এমন একটা আজব কথা শেখ হাসিনা বলে ফেললেন।

হার্টের রোগটা এমনই যে, পূর্বে কোনো সমস্যা দেখা না গেলেও হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যেতে পারে। এ কথা শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই জানেন। এ অবস্থায় বেগম জিয়ার সাক্ষাতের পরের দিনই রাষ্ট্রপতির অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে তিনি যে হীন রাজনীতি করলেন, তাতে দেশবাসীর নিকট কি তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে?

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনা কি নির্বাচন চান?

২০০১ সালে শেখ হাসিনা কর্তৃক মনোনীত প্রেসিডেন্ট, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সেনাপ্রধানই নির্বাচনকালে দায়িত্বে ছিলেন। কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান কোনো দলের ছিলেন না। নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে তিনি নির্বাচনের দিন মিডিয়ার নিকট প্রকাশও করলেন; কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি খেপে গিয়ে আবোল-তাবোল বলতে থাকলেন। এখন প্রশ্ন হলো, ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি কোন্ ভরসায় অংশগ্রহণ করবেন? বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত, সম্ভাব্য কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান সাবেক প্রধান বিচারপতি হলেও এককালে বিএনপি করতেন, সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধান জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত।

নিজের নিযুক্ত লোকদের পরিচালনায়ই তিনি নির্বাচনে পরাজিত হলেন, জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পরিচালনায় তার বিজয়ী হওয়া কেমন করে সম্ভব হবে? তাই তিনি কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনের নামে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছেন।

তার দাবি হলো, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল নির্বাচন কমিশনার কাকে কাকে করা হবে, সে বিষয়ে তার সম্মতি নিতে হবে। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে কি এ বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেতার সম্মতি নিয়েছিলেন? এসব অযৌক্তিক দাবি তুলে তিনি নির্বাচনব্যবস্থার উপর আস্থাহীনতাই প্রকাশ করছেন।

জামায়াতে ইসলামীর উদ্ভাবিত নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ১৯৯৪ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত তার নেতৃত্বে আন্দোলন চলেছে। ১৯৯৬ সালে তিনি এ পদ্ধতির নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন হয়েছেন। ২০০১ সালে তার পরাজয় ঐ পদ্ধতির কোনো ত্রুটির কারণে হয়নি। পদ্ধতিতে কোনো ত্রুটি থাকলে তিনি ক্ষমতাসীন থাকাকালে সংস্কারের ব্যবস্থা করতে পারতেন। তার পাঁচ বছরের দুঃশাসনের কারণেই যে জনগণ তাকে পুনরায় ক্ষমতাসীন করেনি, সে কথা তিনি উপলব্ধি করতেও অক্ষম।

নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে তিনি হতাশ

তিনি নিশ্চয়ই ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ভোটের ব্যবধান বেশি নয়। আওয়ামী লীগ বহু আসনে অল্প ভোটে হেরেছে। তার পাঁচ বছরের শাসনে তিনি ইসলাম ও আলেম সমাজের সাথে যে আচরণ করেছেন, তাতে ইসলামপন্থিদের হাতেই 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' এসে গেছে। এ হিসাব কষে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য তিনি চারদলীয় জোটকে ভাঙার উদ্দেশ্যে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীকে বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন

www.bjilibrary.com

করার উদ্দেশ্যে জেএমবিকে জামায়াতের সন্ত্রাসীশক্তি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক অপপ্রচার চালিয়েছিলেন। এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে চারদলীয় জোট থেকে আরো বৃহৎ জোট বা মহাজোট গঠনের চেষ্টা চালালেন।

মাত্র চারদলীয় জোটের মোকাবিলায় তিনি চৌদ্দদলীয় মহাজোট কায়েম করলেন। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি ১৩ দলের মধ্যে বামপন্থি ১১ দলের কোনো গণভিত্তি নেই। ১৪ দলের সরকারবিরোধী আন্দোলনে জনগণ মোটেই শরীক হচ্ছে না। দলীয় ক্যাডারের বাইরে কেউ তাদের সংস্কার আন্দোলনে উৎসাহ পাচ্ছে না। কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারে জনগণের কোনো আগ্রহ থাকার কথা নয়।

১৪ দল যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বিদ্যুৎবিভ্রাট, পানিসংকট ইত্যাদি জনপ্রিয় ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করত তাহলে হয়তো জনগণ কিছুটা সাড়া দিত। তাদের রাজনৈতিক ইস্যু জনগণের মধ্যে সামান্য সাড়াও জাগাতে পারছে না।

শেখ হাসিনা ইসলামপন্থিদের ভোট ভাগ করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু দলকে তার জোটভুক্ত করার চেষ্টা করছেন, যারা ইসলামের নামে সংগঠন করা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। যদি তিনি এমন মহাজোট গঠন করতে পারেন, যার ফলে বিজয়ের আশা করা যায়, তাহলে তিনি নির্বাচন করবেন।

নির্বাচন বানচালের পরিকল্পনা

কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের যে দাবি তিনি করেছেন তা জোট সরকার মেনে না নিলে 'আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না'— বলাই তিনি যথেষ্ট মনে করেননি; বরং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতেই দেবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন। যে নির্বাচনে তার বিজয়ী হওয়া নিশ্চিত নয়, সে নির্বাচন হতে দিলে তার রাজনৈতিক মৃত্যুই ঘটতে পারে। তাই নির্বাচন যাতে হতে না পারে, তিনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পরিকল্পনাই হয়তো নিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জঙ্গিবাদী হরতাল, অবরোধ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে দেশে যে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে তা থেকে ধারণা হচ্ছে যে, তারা দেশে নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্ট করবে, যাতে তাদের বিরোধী জোট ক্ষমতায় আসার বদলে সশস্ত্র বাহিনী দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

দেশ শাসনের দায়িত্ব নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী দেশের কোনো সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম হবে না—এ কথা শেখ হাসিনাও বোঝেন। তখন দেশে গোপন সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রতিবেশী দেশ থেকে সশস্ত্র হামলারও আশঙ্কা রয়েছে। তাই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থে রাজনৈতিক সরকারের কোনো বিকল্প নেই। অথচ তিনি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে হলেও চারদলীয় জোটকে ঠেকাতে চাচ্ছেন।

www.bjilibrary.com

২৭৩.

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে কি ভারতের আধিপত্য চায়?

আওয়ামী লীগ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, তাদের মহান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আদর্শ এ দেশে চালু করতে হলে দেশের ইসলামী শক্তিকে দমন করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী শাসন, আল্লাহর আইন, আল্লাহর খেলাফত ইত্যাদির মুসিবত(!) থেকে বাঁচতে হলে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য তারা অপরিহার্য মনে করতে পারেন। তারা আরো বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতের আধিপত্য কায়েম না হলে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবেন না।

ভারত আমাদের বিশাল প্রতিবেশী দেশ। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিজীবনে যেমন নিজের সুখ-শান্তির প্রয়োজনেই প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় জীবনেও তা অত্যাবশক। বিভিন্ন স্বার্থ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথেই যুদ্ধ বাধে। দূরবর্তী রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধের আশঙ্কা থাকে না।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত সরকার এসেছে, সবাই ভারতের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছে। গায়ে পড়ে ভারতের সাথে ঝগড়া বাধানোর মতো কোনো পদক্ষেপ বাংলাদেশ কখনো নেয়নি। অবশ্য আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতাসীন হয়েছে তখনই ভারতের আধিপত্য মেনে নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থে হানি ঘটাতে দ্বিধা করেনি। যেমন– শেখ মুজিব আমলে ২৫ সালা চুক্তি, ফারাক্কা চুক্তি ও বেরুবাড়ি চুক্তি এবং শেখ হাসিনার আমলে পার্বত্য শান্তি চুক্তি ও ৩০ বছরের গঙ্গার পানিচুক্তি।

জনগণ ভারতকে কেন বন্ধু মনে করে না?

এ পর্যন্ত ভারতের কোনো সরকারই বাংলাদেশের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করেনি। এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে বন্ধু মনে করে না। তাদের উৎপন্ন পণ্য যে পরিমাণ বাংলাদেশে রপ্তানি করে, এর ২০ ভাগও বাংলাদেশি পণ্য তারা নিতে রাজি হয় না। এভাবে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বিরাট বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়ে গেছে। ফলে তাদের পণ্যের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে গিয়ে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমমূল্য পরিমাণের আমাদের পণ্য যদি তারা নিত তাহলে এ ক্ষতি হতো না।

এ দৃশ্য এ দেশের জনগণ গত ৩৫ বছর ধরে দেখে আসছে যে, বাংলাদেশের উজানে ভারত নদীতে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে তাদের দেশে সর্বত্র পানি সরবরাহ করায় শুকনা মৌসুমে বাংলাদেশ পানির অভাবে মহাবিপদে পড়ে, আবার বর্ষার মৌসুমে ভারতে যখন প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার উপক্রম হয়, তখন তারা বাঁধ ছেড়ে দিয়ে তাদের বন্যা বাংলাদেশে পাচার করে দেয়। এভাবে একসময় পানির অভাবে মারা, আরেক সময় বন্যার পানিতে মারা কি সৎ প্রতিবেশীর কোনো পরিচয় বহন করে?

বাংলাদেশের ৫৪টি নদী ভারত থেকে এসে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। যেসব নদী একাধিক দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়, সেসব নদীর পানির অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। এসব নদীর পানি কোনো এক দেশ

www.bjilibrary.com

একতরফাভাবে কাজে লাগিয়ে ভাটির দেশকে শুকিয়ে মারা ঐ আইনে নিষেধ। এর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে পানির হিস্যা নির্ধারণ করার আইন রয়েছে। কতক নদী নেপাল থেকে ভারতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে এসে পড়েছে। তাই এসব 'কমন' পানি বন্টনের ব্যাপারে নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ পরিকল্পনা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা সত্ত্বেও নেপালকে শরীক করতে ভারতকে সম্মত করা যায়নি। এর কারণও রহস্যজনক।

পাকিস্তান আমলে যখন ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করা শুরু হয়েছে তখনই জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পরে একসময়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লংমার্চ হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবের উপর চাপ সৃষ্টি করে ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল। পরীক্ষায় এ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ার পরও ফারাক্কা বাঁধ বন্ধ করা যায়নি।

বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রমত্তা পদ্মা নদীর নাম উজানে ভারতে গঙ্গা নামে পরিচিত। ফারাক্কা বাঁধের ফলে গঙ্গার পানিপ্রবাহ রুদ্ধ করায় স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশে পানির জোর কমে গেছে। এর ফলে পূর্বে পানির ঠেলায় যে পলিমাটি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ত তা জমে পদ্মায় চর পড়ে গেছে। উত্তরবঙ্গ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের তিন দিকই ভারত দিয়ে ঘেরা। বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝখানে পদ্মা নদী থাকায় রাজশাহী এলাকায় দুই দেশ নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তাই এখানে সীমান্ত সংঘর্ষ তেমন নেই– যেরূপ ঐসব এলাকায় আছে, যেখানে দুই দেশের মাঝখানে নদী নেই। এমনও আছে যে, বাড়ির সীমানা পার হলেই ভারত। সাধারণ মানুষ চলাফেরা ও হাট-বাজার করতে সবসময় টেরও পায় না যে, তারা ভারতের মাটিতে হাঁটছে। দুই দেশের মাঝখানে দেয়াল তুলে দেওয়া নেই বলে এ অবস্থা হতেই পারে। দূরে দূরে কিছু খুঁটি পোঁতা আছে মাত্র।

ভারতের সীমান্তপ্রহরী বিএসএফ (বর্ডার সিক্যুরিটি ফোর্স) এমন নির্মম যে, বর্ডারে তাদের হিসাবে কোনো বাংলাদেশিকে তাদের এলাকায় ঢুকে গেছে বলে মনে করলেই গুলি করে হত্যা করে। এভাবে প্রতি বছর শত শত বাংলাদেশি তাদের হাতে নিহত হচ্ছে। এটা কি সৎ প্রতিবেশীর লক্ষণ?

বাংলাদেশের সাথে ভারতের মিত্রসুলভ আচরণের অভাবে এ দেশের জনগণ ভারতকে বন্ধু মনে করে না। এমনকি ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলায়ও দেখা যায়, বাংলাদেশি কিশোর, তরুণ, যুবক ক্রিড়ামোদীরা ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে। এরা কি সবাই রাজাকার? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনের কারণে বাংলাদেশি সবারই পাকিস্তান টিমের বিরোধী হওয়ার কথা। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অবদানের কারণে ভারতীয় টিমের পক্ষেই বাংলাদেশিদের সমর্থন থাকা স্বাভাবিক ছিল।

তাহলে বাংলাদেশি জনগণ কি ভারতকে বন্ধু মনে না করার দরুন অকৃতজ্ঞতার অপরাধে দোষী? প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার

www.bjilibrary.com

এ দেশের সাথে যে 'আধিপত্যবাদী' ও বড় ভাইসুলভ আচরণ করে এসেছে তাতে এ দেশের জনগণ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছে যে, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার নিয়ত মোটেই বিশুদ্ধ ছিল না। তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশের মর্যাদা ভোগের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেনি। তারা তাদের চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভেঙে দুর্বল করার মহাসুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা দুটো বিরাট উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে– একদিকে পাকিস্তানকে দুর্বল করা, আরেকদিকে বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার করা। এ দুটো মহান উদ্দেশ্যই তারা সফল করতে সক্ষম হয়েছে।

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'-এর বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য

বাংলাদেশের জনগণ যে ভারতকে বন্ধু মনে করে না, সে কথা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ' অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ জয় করার পুরস্কারস্বরূপই জেনারেল মানেক শ' ফিল্ড মার্শাল উপাধি লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ভারতের প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতিতে সে কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন। ২৯ এপ্রিল প্রকাশিত ঐ বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

"যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করেছে, সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করেছি। বাংলাদেশিদের কখনো ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে।

আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশিদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল; কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।"

মানেক শ' রাজনীতিক ছিলেন না। নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে আন্তরিকতার সাথে তিনি বিষয়টা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। রাজনীতিবিদ হলে তিনি এ মহাসত্য এমন স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করতে পারতেন না। এত বড় সত্য কথাটা আজো ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

ভারতে হিন্দুদের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্ক

বর্তমানে (২০০৬) ভারতের জনসংখ্যা এক শ' কোটি। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে ১৫ কোটি। বাকি ৮৫ কোটির মধ্যে শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও অন্যান্য উপজাতি ১০ কোটি হতে পারে। মুসলিম জাতির মোকাবিলায় এ দশ কোটিও ৭৫ কোটি হিন্দুর রাজনীতির অনুসারী।

অবশ্য সকল হিন্দুই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পোষণ করে না। ভারতে সাম্প্রদায়িক হিন্দু শক্তি বিজেপির ব্যানারে ক্ষমতাসীন হয়েও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মন জয় করতে না পারায় বিগত ২০০৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে, গোটা ভারতের

www.bjilibrary.com

হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নয়। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি এতটা সংগঠিত ও সংহত যে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তারা যদি কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে তাদেরকে কেউ ঠেকাতে পারে না। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ যখন তারা ধ্বংস করেছে, তখন দিল্লিতে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। কংগ্রেস দলীয় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-এর কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ধর্মীয় সন্ত্রাস ঠেকাতে পারেনি বা ঠেকানোর চেষ্টা করেনি।

গুজরাটের আহমদাবাদ শহরে উগ্রপন্থি হিন্দু-প্রাদেশিক সরকার যে মুসলিম গণহত্যা চালিয়েছে, এর প্রতিবাদ করা বা নিন্দা জানানোর সাহসও কংগ্রেসের হয়নি। ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় না থাকলেও মুসলিম জাতির উপর নির্যাতন চালানোর ক্ষমতা রাখে। মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের মনোভাব স্পষ্ট। তাদের মতে, ভারতের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ হিন্দু। তারা সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছে। তাদেরকে শুদ্ধির মাধ্যমে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে হবে; নতুবা তাদেরকে আরব দেশে চলে যেতে হবে। গত ২০০৪ সালের নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের ফলে তাদের উগ্রতা আর বৃদ্ধি পায়নি।

ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ভারতে কমপক্ষে ১৫ জন। মুসলিমগণ দাবি করেন যে, তারা শতকরা ২০ জন। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি ও পেশায় তারা সর্বনিম্নে। সরকারি চাকরিতে উচ্চ পর্যায়ে তো নেই বললেই চলে। নিম্ন কর্মচারী পর্যায়েও শতকরা ২/৩ জনের বেশি নয়। শিক্ষায়ও তারা পশ্চাদপদ।

ভারতের সংবিধানের দোহাই দিয়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট সকল নাগরিকের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সকল ভারতীয় নাগরিকের বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি যেন আইনের মাধ্যমে একই রকম করা হয়, এ মর্মে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। Common Civil Code-এর দাবি মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ঠেকিয়ে রেখেছে। অন্যান্য জাতির নিকট এসব বিষয় শুধু আইন বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের নিকট তো এ সবই দীন ও শরীআতের বিধান এবং তাদের ঈমানের সাথে সম্পর্কিত। সুপ্রিম কোর্টের ঐ রায় মুসলিম জাতির উপর ঝুলন্ত তরবারি হয়ে বিরাজ করছে।

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার জন্য বহু বছর থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এটাও কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

এভাবে ভারতে মুসলিম জাতি কোনো রকমে সংগ্রাম করে তাদের জাতিসত্তার হেফাজত করে যাচ্ছে। শরীআতের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 'মজলিসে মুশাওয়ারাত' বা পরামর্শ পরিষদ নামে অত্যন্ত মযবুত ঐক্য সংগঠন রয়েছে। সুন্নি-শিয়া-আহলে হাদীস-বেরেলভী সবার ঐ মহাঐক্যই মুসলিম জাতির রক্ষাকবচ হয়ে আছে।

কারা ভারতকে পরম বন্ধু মনে করে?

ভারতের অব্যাহত বৈরী আচরণ সত্ত্বেও যারা ভারতকে বন্ধু মনে করে, তারা ভারতের কোনো দোষই দেখতে পায় না। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের

www.bjilibrary.com

জন্য সরকারকে নগ্নভাবে উসকিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে তারা মৃদু আপত্তি করাও কর্তব্য মনে করে না। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক কারণে কোনো হিন্দুর উপর সামান্য জুলুমও করা হয়নি। তবুও শেখ হাসিনা বড় গলায় বিদেশে প্রচার করছেন যে, বাংলাদেশে ব্যাপক হারে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। অথচ গুজরাটে মুসলমানদের পাইকারি হারে হত্যা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। এমন উদার মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে এ দেশেরই কতক মতলবি রাজনৈতিক ব্যক্তি এভাবে মিথ্যা প্রচার করতে সামান্য লজ্জাও বোধ করে না।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার বীনা সিক্রিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একটি হোটেলে আওয়ামী লীগপন্থি বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বামপন্থি একটি দলের নেতা স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমাদের স্বাধীনতা ভারতের অবদান। তাই ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং তাদের আধিপত্য মেনেই চলতে হবে।'

বাংলাদেশে ভারতপ্রেমিকের একটি শক্তিশালী মহল না থাকলে ভারত এতটা বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করত না। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, বাংলাদেশের উপর ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের জোর দাবি জানানো সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল ক্ষুব্ধ হওয়া তো দূরের কথা, লোকদেখানো ও দায়সারা আপত্তিও করছে না। নির্বাচনে শতকরা ৪০ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত বৃহৎ একটি দল যদি ভারতের আগ্রাসী ভূমিকা কামনা করে তাহলে তারা দাপট দেখাতে দ্বিধা করবে কেন?

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হুমকি

আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলোর চরম ইসলামবিরোধী মনোভাব ও ভারতপ্রীতির কারণেই শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে অবিশ্বাস্য রকমের দাবি তুলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আন্দোলনের হুমকি দিতে সাহস পাচ্ছে। দেশের ভেতরে বিরাট সমর্থক শক্তি আছে বলেই 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন করার মতো ধৃষ্টতা দেখানো সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছয়টি জেলা নিয়ে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে এ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশ্রয় না দিলে এ আন্দোলন এভাবে চলতে পারত না। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন ছুতোর, যিনি শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ করা হয়নি।

২০০২ সালের ১৪ জুলাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে তাদের দু'দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে। ঐ সম্মেলনে উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অবিলম্বে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বিসমিল্লাহর অনুচ্ছেদ বিলোপ করতে হবে।

২. বাঙালিদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'আলহাজ্জ' 'মুহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ সাম্প্রদায়িক। সুতরাং নামের সাথে ঐসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

৩. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী 'বিসমিল্লাহ' ও অষ্টম সংশোধনী (রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম) অবিলম্বে বাতিল করে '৭২ সালের বিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. জাতীয় সংসদে ৮০টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। যদি এসব দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দক্ষিণবঙ্গের ছয়টি জেলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ছয়টি জেলা হলো বরিশাল, পটুয়াখালী, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া এবং খুলনা। (দৈনিক ইনকিলাব : ২৯.১২.২০০০)

ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। এসব দাবির ধরন ও দাপটময় ভাষা প্রমাণ করে যে, ঐ দাবিদাররাই এ দেশের নিয়ন্তা বলে নিজেদেরকে মনে করেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঐ সংশোধনীতেই বিসমিল্লাহ সংযোজন করা হয়েছে। তারা গণভোটেরও পরওয়া করেন না। তাদের নির্দেশ গণভোটকেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এত বড় ধৃষ্টতা একমাত্র আওয়ামী লীগের জোরেই তারা দেখাচ্ছেন। কারণ, আওয়ামী লীগ গণভোটের মাধ্যমে উৎখাত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই তাদের আদর্শ বলে ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এ নির্দেশ দেওয়ার যোগ্যতাও রাখে যে, মুসলমানদের নামের আগে 'মুহাম্মদ' ও 'আলহাজ্জ' ব্যবহার করা চলবে না। তারা '৭২ সালের সংবিধান পুনরায় চালু করার দাবি করেন। ঐ সংবিধান শেখ মুজিবের আমলে চারবার সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধান-প্রণেতারাই সংশোধন করেছেন। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের ভদ্রলোকেরা কোন্ অধিকারবলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংশোধনী বাতিল করার দাবি করেন? চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিব যখন 'মহারাজা'র আসন গ্রহণ করেছেন তখন তারা কোথায় ছিলেন? কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন কি?

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিলের দাবিও তারা করেছেন। অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধান সংশোধনের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই তা করেছেন। এতে আপত্তি করার অধিকার তাদেরকে কে দিল? আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দল তাদের পেছনে আছে বলেই কি এত বড় দাপট?

আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক

আওয়ামী লীগ ও জাসদ নেতাদের এবং এ বলয়ের বুদ্ধিজীবীদের মুখে বহু দিন থেকেই আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন বলে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে। '৭১-এ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয়েছে; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে কার হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ প্রয়োজন, তা ঐ মহল ছাড়া অন্য কারো বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪ কোটি জনগণের মযবুত দখলে রয়েছে। কোনো ক্ষমতাসীন দলের সাধ্য নেই যে, মেয়াদের অতিরিক্ত একদিনও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারে। শেখ

www.bjilibrary.com

হাসিনাকেও গদি ছাড়তে হয়েছে। ২০০৬ সালে বেগম খালেদা জিয়াকেও ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। আবার একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনগণ অবাধে তাদের রায় দেওয়ার সুযোগ পাবে এবং তারা যাদেরকেই ক্ষমতায় বসাতে চায় তারা ছাড়া অন্য কারো গদি দখলের কোনো সুযোগ নেই। তাই নিঃসন্দেহে দেশ বর্তমানে নিরঙ্কুশভাবেই জনগণের দখলে। যারা মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন তাদের এ কথা মোটেই অজানা নয়।

তাহলে স্পষ্টই বোঝা গেল, তারা জনগণের দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যই যুদ্ধ করতে চান। প্রশ্ন হলো, তারা দেশটাকে কাদের দখলে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করার হুমকি দিচ্ছেন?

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা জনগণের রয়েছে। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিলেও ময়দানে কারা যুদ্ধ করেছে? সবাই জানে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংলাদেশি অফিসার ও জোয়ানদের যারা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন তারা এবং বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর বিদ্রোহীরাই সেনা অফিসারদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরই নেতৃত্বে মুক্তিপাগল যুবক-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছেন। ইসলামপন্থি দল ছাড়া অন্যান্য বহু রাজনৈতিক নেতা ও দল ঐ যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ একচেটিয়াভাবে দেশকে দখল করে নিয়েছে। চতুর্থ বছরে এসে তো শেখ মুজিব তার বশংবদ দলের সম্মতি নিয়ে গোটা সরকারি ক্ষমতা তার একক দখলে নিয়ে নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীতে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারাই শেখ মুজিবের গোলামি থেকে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট জনগণকে উদ্ধার করেছেন। তারই পরিণতিতে আজ দেশের দখলস্বত্ব জনগণ ভোগ করছে।

যারা এখন মুক্তিযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন তারা কি তাহলে জনগণ থেকে দখলস্বত্ব কেড়ে নিয়ে আবার শেখ মুজিবের কন্যার হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন? জনগণ তাকে ক্ষমতায় বসায়নি বলে ভিন্ন কৌশলে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা চলছে। আওয়ামী লীগ '৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে তা শতকরা এক শ' ভাগ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। আওয়ামী লীগের বর্তমান অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক আন্দোলনেও ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের কপাল খারাপ বলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, বর্তমান ঐ সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী বিডিআর ও পুলিশ তাদের কুমতলবের নতুন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। কারণ তারা জানেন যে, দেশের ক্ষমতা এখন সম্পূর্ণরূপে জনগণের হাতে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী মনস্তাত্ত্বিকভাবেই ভারতবিরোধী। সীমান্তপ্রহরী বিডিআরও তা-ই। আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে বাংলাদেশকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা কিছুতেই সম্মত হতে পারেন না।

www.bjilibrary.com

সশস্ত্র বাহিনী ও বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) প্রধানত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে জান দেওয়ার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রতিরক্ষা (Defence) বললেই বোঝায় আক্রমণকারী থেকে আত্মরক্ষা করা বা হামলা প্রতিরোধ করা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাদেরকে বিরোধীশক্তির মোকাবিলার জন্যই গড়ে তোলা হয়। Defence বললেই প্রশ্ন ওঠে, Defence against whom? অর্থাৎ, কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষা?

বাংলাদেশের চারপাশে যদি চার-পাঁচটি রাষ্ট্র থাকত তাহলে ঐ প্রশ্নের জবাব হতো, 'যে দেশ থেকেই আক্রমণ হবে, সে দেশের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ।' ঘটনাক্রমে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র দ্বারাই প্রায় চারদিকে ঘেরাও হয়ে আছে এবং যদি কখনো বিদেশি শক্তি এ দেশে হামলা করে, তাহলে তা যে একমাত্র ভারত– এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। তাই বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীই মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভারতবিরোধী। তারা ভারতকে বন্ধু মনে করতে অভ্যস্ত নয়। যদি ভারত এ দেশের প্রতি বৈরী আচরণ অব্যাহত না রাখত তাহলে ভারতকে তারা বড়জোর সৎ প্রতিবেশী মনে করত। এ কারণেই যারা ভারতের অব্যাহত বৈরী আচরণ সত্ত্বেও সে দেশকে গৌরবের সাথে বন্ধুদেশ বলে ঘোষণা করে এবং তাদের কোনো অন্যায় আচরণে সামান্য আপত্তিও করে না, তাদেরকে এ দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীও দেশপ্রেমিক হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারে না। সাবেক সেনাপতি লে. জেনারেল নাসিম ও লে. জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন বলে গোটা সশস্ত্র বাহিনী উল্লসিত। কারণ, তাদেরকে ভারতপন্থি বলে ধারণা করা হয়।

২৭৪.

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও শেখ মুজিবের ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণ, সশস্ত্র বাহিনী ও সকল ইসলামী মহল বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে বন্ধু হিসেবে কামনা করে। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা সবাই শঙ্কিত যে, যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা কখনো বিপন্ন হয় তাহলে একমাত্র ভারতের কারণেই হতে পারে। বাংলাদেশের প্রায় চারপাশেই ভারত। দক্ষিণ দিকেও বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ তাদের দখলে। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে যে মায়ানমার রাষ্ট্রটি রয়েছে এর সাথে যদি কোনো কারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবু ভারতের সম্মতি ছাড়া ঐ দেশ বাংলাদেশের উপর হামলা করার সাহস করবে না। বাংলাদেশের উপর যদি কোনো দেশ আক্রমণ করে তাহলে একমাত্র ভারতই করতে পারে। ভারতের বাইরের কোনো দেশ ভারতকে ডিঙ্গিয়ে এসে বাংলাদেশে আক্রমণ করবে না। ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশ থেকে এ দেশে হামলা হওয়ার আশঙ্কা নেই বললেই চলে।

এ কারণেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার কোনো প্রয়োজনবোধ করেননি। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যে যারা বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন তাদের সংখ্যা খুব নগণ্য হলে হয়তো সশস্ত্র বাহিনী বিলুপ্তই

www.bjilibrary.com

হয়ে যেত। পাকিস্তানে আটকেপড়া সকল অফিসার ও সিপাহি ফিরে আসার পর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীকে বহাল রাখতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু শেখ মুজিব এসব বাহিনীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা করেননি। এ কারণে তারা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছিলেন বলে ওয়াকিফহাল মহলের ধারণা ছিল।

শেখ মুজিব দেশরক্ষার ব্যাপারে মোটেই উদ্বিগ্ন ছিলেন না। কারণ, স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতই কায়েম করে দিয়েছে। ভারতই এ দেশকে রক্ষা করবে। ভারতের এ দেশে আক্রমণ করা মোটেই স্বাভাবিক নয় বলে শেখ মুজিব ধারণা করতেই পারেন। তখনকার পরিবেশে এমন ধারণা হতেই পারে। শেখ মুজিব তখন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন নিয়ে অস্থির ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৫ দফা চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করার চেয়ে দেশ গড়ার কাজেই সর্বশক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর ভারতীয় বাহিনীর প্রভুসুলভ আচরণে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রেখে যাওয়া বিশাল সামরিক সরঞ্জাম লুট করে ভারতে নিয়ে যাওয়া এমনকি শিল্পকারখানার মূল্যবান যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অপরাধে শেখ মুজিব তাঁকে গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মেজর জলিলের এ দাবি অত্যন্ত সঙ্গত ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর পরাজিত পাকবাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীরই প্রাপ্য।

ভারতীয় বাহিনীর এ ধারণা করাও অসঙ্গত ছিল না যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় কোনো অবদান নেই। তাই পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় তারা মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে সেখানে হাজির করা প্রয়োজন মনে করেনি। পাকবাহিনী কোনো যৌথ বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়নি, শুধু ভারতীয় বাহিনীর নিকটই পরাজিত হয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর এ ধারণার কারণেই বিজিত পাকবাহিনীর সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামে একমাত্র তাদেরই অধিকার। তাই তারা পাকবাহিনীর ৯৩ হাজার অফিসার ও সিপাহি এবং ঐ বাহিনীর সকল অস্ত্র, ট্রান্সপোর্ট ও যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রী ভারতে নিয়ে গিয়েছিল। শেখ মুজিব ঠেকাতে চাইলেও সক্ষম হতেন না; বরং মেজর জলিল বেয়াদবি(!) করায় তিনি তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ভারত ও মুজিববিরোধী চেতনার সূচনা

সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবিরোধী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার সূচনা হয়েছে। মেজর জলিল ভারতীয় বাহিনীর লুণ্ঠনের প্রতিবাদ করে একদিকে জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করেছেন, অপরদিকে জনগণের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। মেজর জলিলের মতো দুর্দান্ত সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী মুক্তিযোদ্ধাকে বেশি দিন বন্দি করে রাখা সম্ভব হয়নি।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে সমুন্নত রাখা ও জনগণকে সংগঠিত করে দেশ গড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধের সকল ফসল তাঁর দলের লোকদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে যেসব মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা পাননি, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেও যাঁরা সরকারিভাবে স্বীকৃতি পাননি, তাঁরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে মেজর জলিলের আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। মেজর জলিল আ স ম আবদুর রবদের মতো বামপন্থি নেতাদেরকেও আন্দোলনের সাথী হিসেবে পেয়ে গিয়েছিলেন।

এভাবেই মেজর জলিল ও আবদুর রবের নেতৃত্বে জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল ময়দানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ভারত ও মুজিববিরোধী রাজনৈতিক ভূমিকা অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনগণের কোনো সমস্যারই সমাধান শেখ মুজিব সরকার পেশ করতে সক্ষম না হওয়ায় আওয়ামী লীগের বাইরের সকল রাজনৈতিক নেতার সহানুভূতি জাসদের পক্ষে চলে গিয়েছিল এবং রাজনৈতিক কর্মীরা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল। এরপর শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হতে থাকে।

শেখ মুজিবের গদি রক্ষা বাহিনী

শেখ মুজিব দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনবোধ না করলেও তাঁর গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'রক্ষীবাহিনী' গঠন করা অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা মুজিববাহিনী নামে সংগঠিত ছিলেন এবং আরো যাদের উপর শেখ সাহেবের পূর্ণ আস্থা ছিল তাদের সমন্বয়ে রক্ষীবাহিনী নামে এক মযবুত সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছেন।

দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী শেখ মুজিবের এ ভূমিকায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা লক্ষ করেছেন যে, তাদের বদলে বিকল্প বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর চেয়ে রক্ষীবাহিনীকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের আগস্ট বিপ্লবে সশস্ত্র বাহিনীর কতক জুনিয়র অফিসার যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন তা গোটা প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করায় তিন বাহিনীর প্রধানগণও প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদের প্রতি বিনা দ্বিধায় আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

এ রক্ষীবাহিনীই শেখ মুজিবের গদি রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হাজার হাজার জাসদকর্মীকে হত্যা করেছে। কিন্তু আগস্ট বিপ্লব ঠেকানোর কোনো সুযোগই তারা পায়নি। ভারতের 'র', রাশিয়ার কেজিবি, মুজিব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দারা পর্যন্ত টের পায়নি। এটা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর রহস্য। মুজিবের স্বৈরশাসনের পতনে বাংলাদেশের সর্বমহলে যে আনন্দ-উল্লাস দেখা গিয়েছে, তাতে গোটা বিশ্ব হতভম্ব হলেও কেউ মুজিব হত্যার নিন্দা জানায়নি।

আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাকে কি জনগণ সাড়া দেবে?

শেখ মুজিবের পতনের পর তাঁর জনপ্রিয়তা যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও কতটুকু সফল

www.bjilibrary.com

হয়েছেন, তা জরিপের বিষয়। জনগণ কি তাঁকে জাতির পিতা হিসেবে মর্যাদা দিচ্ছে? এককালে তিনি জনগণের নয়নের মণি ছিলেন। তাঁরই ভ্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তের পরিণামে সে মর্যাদা তিনি হারিয়েছেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা শক্তি প্রয়োগ করে অর্জন করা যায় না।

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দোহাই দিয়ে থাকেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তারা কি বাকশাল ও এক ব্যক্তির স্বৈরশাসনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন? মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার কোনো চিহ্ন কি আওয়ামী লীগের মধ্যে অবশিষ্ট আছে? জনগণ কি আওয়ামী লীগকে ঐ চেতনার পতাকাবাহী বলে বিশ্বাস করে? শেখ মুজিবের কুশাসন ও শেখ হাসিনার দুঃশাসন কি ঐ চেতনার সামান্য পরিচয়ও বহন করে? জনগণ তাদের ডাকে সাড়া দিলে চারদলীয় জোট সরকারের কবেই পতন হয়ে যেত।

'৭১ সাল ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের চরম আবেগপূর্ণ সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার প্রায় সকল আসনে জয়ী হয়েছে। ইয়াহইয়া-ভুট্টো চক্র ব্যালটে বিজয়ী শক্তিকে বুলেট দ্বারা দমনের অপচেষ্টা চালিয়েছিল। নির্বাচিত আওয়ামী লীগ নেতারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা বিদ্রোহী হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছেন। উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতাপাগল যুবক-কিশোররা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়েছে। জনগণ তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে।

এ পরিবেশে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার পাকিস্তানকে ভাঙার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এবং পাকিস্তানের শত্রু সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা ও জনগণ অবশ্যই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে তাদের পূর্ণ আধিপত্য কায়েমের হীন উদ্দেশ্যেই ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা ভারতের জন্য এক মহাসুযোগই ছিল।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা আওয়ামী লীগ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকার সশস্ত্র সংগ্রাম করে ক্ষমতায় আসেনি। এটা ইয়াহইয়া সরকার নয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তক্রমেই চারদলীয় জোটকে সংসদের দু'তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী করে ক্ষমতাসীন করেছে। কোনো দলীয় সরকারের অধীনে ঐ নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় আওয়ামী লীগ কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শেখ হাসিনা কর্তৃক নিযুক্ত আমলা জনাব এম এ সাঈদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান কোনো সময় রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন বলে কেউ দাবি করেননি। এ নির্বাচনে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এসব বাহিনী কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নেই; বিশেষ করে সেনাবাহিনী রাজনীতির ধারে-কাছেও নেই।

www.bjilibrary.com

বিপুল জনসমর্থন পেয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এ সরকারকে আওয়ামী লীগ গত ৩০ এপ্রিল ২০০৪ তারিখে পদত্যাগে বাধ্য করার ঘোষণা দিয়েছিল। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকে মূলধন বানিয়ে সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টাও করেছিল। তাদের ডাকে জনগণ সাড়া দেয়নি। গণ-আন্দোলন করে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুমকি অব্যাহতভাবে তারা দিয়ে চলেছেন। গণভিত্তিহীন বাম দলগুলোকে সাথে নিয়ে তারা মরিয়া হয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শেখ হাসিনা এ সরকারকে তালেবান আখ্যায়িত করে আফগানী স্টাইলে বাংলাদেশে আক্রমণ করার জন্য আমেরিকাকে উসকে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তারা ভারতের দুয়ারে ধরনা দিয়ে চলেছেন। তারা টের পাচ্ছেন না যে, জনগণ ভারত সরকারকে এ দেশের বন্ধু মনে করে না। তাই ভারতের প্রতি তাদের আহ্বান তাদেরকে চরমভাবে গণবিচ্ছিন্ন করে ছাড়বে।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ

আওয়ামী লীগ বলয়ের লোকেরা দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দশক অতিক্রম করার পরও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের একচ্ছত্র কৃতিত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের মোকাবিলা করার আহ্বান জানাতে ক্লান্তিবোধ করেন না। ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের কুশাসন ও স্বৈরশাসন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত শেখ হাসিনার অপশাসন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে শেখ হাসিনার সংবিধান ও গণতন্ত্রবিরোধী রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জনগণ তাদেরকে স্বাধীনতার রক্ষক বলে মনে করে কি না, তা এখনো তারা যাচাই করতে পারেননি। বিশেষ করে তাদের অন্ধ ভারতপ্রেমের নগ্ন প্রমাণ পাওয়ার কারণে '৭৫-এর পর থেকে জনগণ তাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। '৯৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষমতায় বসিয়ে নতুন করে দেশবাসী তাদেরকে চিনে নিয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে তারা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দেশবাসীর এ কথা বুঝতে আর বাকি নেই যে, তারা বর্তমানে যে আজব রাজনীতি করছেন এর পরিণাম বাংলাদেশে ভারতের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের নিকট ভারত যেসব অন্যায় দাবি করছে সে বিষয়ে অন্য সকলে আপত্তি করলেও তারা কোনো সময়ই আপত্তি করেন না কেন? ভারত চায়, বাংলাদেশের চারপাশের রাজ্যসমূহে যারা দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে তাদের দমন করার জন্য বাংলাদেশের জলপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করতে দিতে হবে; চট্টগ্রাম বন্দর তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে; তাদের নিকট গ্যাস বিক্রি করতে হবে। এসব দাবি বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের প্রথম দাবিটি মেনে নিলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় কারা স্বাধীনতার পক্ষে এবং কারা বিপক্ষে, সে কথা বোঝার যোগ্যতা জনগণের আছে।

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায়

আওয়ামী লীগের আজব রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহের ভূমিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ থেকে

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সচেতন মহলে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে যে, আওয়ামী লীগ ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতায় দেশে ক্ষমতাসীন হতে আগ্রহী। এতদিন এ বিষয়টা ধারণা ও অনুমান হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছিল; কিন্তু ২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরের পর এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল।

২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এমপি স্পষ্ট ভাষায়ই ভারতকে বাংলাদেশের উপর হামলা করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবীনেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। উক্ত সভায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার বাবু সর্বজিত চক্রবর্তী রীতিমতো হুমকির ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে জনাব আবদুল জলিল যা বলেছেন তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের জোরে ক্ষমতায় যাওয়ার আশা ত্যাগ করেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। গত নির্বাচনে ক্ষমতা হারিয়ে তারা এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন যে, '৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ ভূমিকার পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভার খবর যেভাবে পত্রিকায় এসেছে

ভারতীয় পত্রিকা হিসেবে পরিচিত দৈনিক জনকণ্ঠ এমন নগ্ন ভারতপ্রেমের বক্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেনি। ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক ইনকিলাব নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশ করেছে :

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির অনুষ্ঠানে জলিল

যুগান্তর রিপোর্ট : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে কবর দিতে না পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনার পেছনে মূল লক্ষ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আজ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে, এমন বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎখাত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৩ বছরের লগ্নে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় ভিক্ষা করে, আর রাজাকারের গাড়িতে রক্তমাখা পতাকা ওড়ে। এজন্য স্বাধীনতা আসেনি।

আবদুল জলিল বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা

www.bjilibrary.com

বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী। বক্তৃতা করেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, জাসদের সহসভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত সর্বজিত চক্রবর্তী, ড. জাহিদ হাসান, কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সদস্য দিলীপ ব্যানার্জি, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম বেদু ও অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।

দৈনিক ইনকিলাবের খবর

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে
—আবদুল জলিল

ট্রানজিটের জন্য আর বেশি দিন অপেক্ষা করব না
—ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেছেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দিয়েছে।

তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে লালনকারী অপশক্তি আখ্যায়িত করে এই সরকারের সাথে নীতিগত কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্যও ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে আসা-যাওয়ার জন্য ট্রানজিট একটি অনিবার্য বিষয়। ভারতকে এই ট্রানজিট প্রদানের জন্য বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু একমাত্র পানিপথ ছাড়া অন্যান্য পথে ভারতকে এই ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ কালক্ষেপণ করে চলেছে। এ অবস্থায় ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্ষাকালসহ বছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা হচ্ছে ২০ হাজার কিউসেক। আর ভারতে

www.bjilibrary.com

তা ১ হাজার ৮০০ কিউসেক মাত্র। সুতরাং এই পানিও যদি বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে আর কতটা হলে পর্যাপ্ত হবে?

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বর্তমান সরকার ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আরো বলেন, আমরা আবার ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে তার সবই সমাধান করা হবে।

ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ, এ দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তা সারাজীবন আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এ দেশের ভারতবিরোধী অপপ্রচারের মধ্যদিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিহ্নিত মহলটির অপপ্রয়াস মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ দেশের সচেতন মানুষ ঐ অপপ্রচারে কখনো বিভ্রান্ত হয়নি বলেই তারা এখনো ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দুই দেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী।

আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনায় পার্থক্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। মুক্তিযোদ্ধাগণ এবং তাদের সহায়ক ও সমর্থক জনগণ অবশ্যই পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছেন।

আওয়ামী লীগনেতা আবদুল জলিল মুক্তিযুদ্ধের যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবদুল জলিল ও অন্যান্য সেক্টর কমান্ডার এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানী ঐ রকম উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না। আওয়ামী নেতারা ঐ উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা চেয়ে থাকলে আলাদা কথা। জনগণ তাদের ঐ উদ্দেশ্য জানলে হয়তো তাদেরকে সমর্থনই করত না।

জলিল সাহেবের বক্তব্যের তাৎপর্য

২০০১ সালের নির্বাচনের পর পূর্ণ তিন বছর জোট সরকারকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সরাসরি ভারত সরকারকে তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের এগিয়ে আসার পদ্ধতিটা কী? '৭১ সালে যেভাবে ভারত সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল, সেভাবেই বাংলাদেশে আক্রমণ করা ছাড়া এগিয়ে আসার কোনো বিকল্পই হতে পারে না। তাহলে আওয়ামী লীগ চায় যে, ভারত এ দেশটা দখল করে আফগানিস্তানের হামিদ কারজাইয়ের মতো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিক। এটাই তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রমাণ। এরপরও কি আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে স্বীকার করা সম্ভব?

www.bjilibrary.com

ডেপুটি হাই কমিশনারের ধৃষ্টতা

উক্ত সভায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী 'ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না' বলে যে সুস্পষ্ট হুমকি দিয়েছেন, এর জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী। আওয়ামী নেতারা তো শুধু হুমকিতেই সন্তুষ্ট নন। তারা তো চান যে, ভারত হামলা করুক। তাই ঐ হুমকিতে নিশ্চয়ই তারা পুলক অনুভব করেছেন। আওয়ামী লীগের মতো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের এমন নগ্ন আহ্বানে উৎসাহিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমার ধারণা, ভারত সরকার আওয়ামী নেতাদের মতো এতটা নির্বোধ নয় যে, বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দেবে।

২৭৫.

বিদেশ সফর

ইতঃপূর্বে লিখেছিলাম, ৩০ জুন ২০০৬ আড়াই মাসের জন্য আমি সস্ত্রীক ইংল্যান্ডে যাচ্ছি। যত দিন স্বাস্থ্যে কুলায় প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে আসতে হবে বলে মনে হয়। গত বছর ডিসেম্বরে (২০০৫) আমীন ও মোমেন সপরিবারে ঢাকা বেড়াতে গেল। মোমেন তো ১০ বছর পর গেল। এভাবেই মাঝে মধ্যে কেউ কেউ কয়েক বছর পরপর হয়তো যাবে। তাই সবার সাথে প্রতি বছরই কিছু দিন থাকার জন্য দু বুড়ো-বুড়িকেই ইংল্যান্ড আসতে হচ্ছে।

বড় ছেলে মামুনের সাথে বছরে একাধিক বার দেখা হয়। জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই তাকে বিভিন্ন দেশে সফরে যেতে হয়। ভারত বা সিঙ্গাপুর সফরে এলে একদিনের জন্য হলেও সে ঢাকা যায়।

দ্বিতীয় ছেলে আমীন ঢাকায় ঘন ঘন যাতায়াতের উদ্দেশ্যে তার গার্মেন্টস্ ফ্যাক্টরির কিছু জিনিস ঢাকায় উৎপাদনের চেষ্টা করছে। এ উদ্দেশ্যে গত মার্চ মাসে দুই সপ্তাহের জন্য এবং জুন মাসে দুই সপ্তাহের জন্য ঢাকা গেল।

আমি ও আমার স্ত্রী বিমানবন্দরে যে পরিমাণ পথ হাঁটতে হয় তাও হেঁটে চলতে পারি না। হুইল চেয়ারেই গত কয়েক বছর ধরে চলতে বাধ্য হচ্ছি। এ অবস্থায় কোনো সফরসঙ্গী ছাড়া আমাদের সফর করা সম্ভব নয়। তাই আমীন ব্যবসায়কে উপলক্ষ করে আমাদেরকে আনতে গেল। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে ঢাকা ফেরৎ যাওয়ার সময়ও তাকেই সাথে যেতে হবে।

সফরের বিবরণ

ঢাকা থেকে ম্যানচেস্টার সরাসরি সব বিমান যায় না। আরব আমিরাত ও কাতার এয়ারলাইন্স-এর বিমানই সরাসরি যায়। আমরা কাতার এয়ারলাইন্সেই রওয়ানা হলাম। ঢাকা থেকে সকাল সাড়ে আটটায় রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ম্যানচেস্টার পৌছার কথা। এখন ম্যানচেস্টারে পৌনে দশটায় মাগরিবের নামাযের সময়। গত বছর বাসায় পৌছে আসরের নামায পড়েছি। এবার বিমান দেড় ঘণ্টা দেরিতে পৌছায় বাসায় পৌছতে মাগরিবের সময় হয়ে গেল।

www.bjilibrary.com

ঢাকা থেকে এক ঘণ্টা বিলম্বে বিমান উড়ল। কাতারের রাজধানী দোহায় বিমান বদলের জন্য দুই ঘণ্টা বিমানবন্দরে পড়ে থাকতে হলো। সেখানেও এক ঘণ্টা বেশি দেরি হয়ে গেল।

ঢাকা থেকে দোহা ছয় ঘণ্টার পথ। দোহা থেকে ম্যানচেস্টার আট ঘণ্টার পথ। মোট চৌদ্দ ঘণ্টা আকাশে কাটল। ঢাকার বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে পাঁচটায় রওয়ানা হলাম। ম্যানচেস্টার আমীনের বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন ঢাকার সময় রাত আড়াইটা। সফরে একটানা ২১ ঘণ্টা লাগল।

হুইল চেয়ারে সমস্যা হয়। চেয়ারের চেয়ে যাত্রীসংখ্যা বেশি হলে অপেক্ষায় থাকতে হয়। চেয়ার পাওয়া গেলেও চালকের অভাব হয়। ঢাকায় কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু দোহা ও ম্যানচেস্টারে এক চেয়ার আমীনকে ঠেলতে হয়েছে।

সময়ের ব্যবধানে ঘুমের সমস্যা

ঢাকা থেকে ম্যানচেস্টার ৫০০০ মাইল পশ্চিমে। আমাদের বিমান ঘণ্টায় ছয় থেকে সাত শ' মাইল গতিতে চলল। আর সূর্য ঘণ্টায় ১০০০ মাইল গতিতে পশ্চিম দিকেই ধাবিত হয়। ফলে ৩০ জুনের দিনটি লম্বা হয়ে ঢাকা থেকে পাঁচ ঘণ্টা বেশি দীর্ঘ হয়ে গেল। ঢাকায় থাকলে রাত এগারোটায় বিছানায় যেতাম। সেদিন ঐ সময় আমরা বিমানে বসা। ম্যানচেস্টারে সাড়ে এগারোটায় এশার নামাযের পর ১২টায় যখন ঘুমাতে গেলাম তখন ঢাকায় ভোর পাঁচটা। অর্থাৎ যে সময়টা ঘুমে থাকার কথা তখন ঘুমানোর সুযোগ পেলাম না, যখন সুযোগ পেলাম তখন ঘুম থেকে জেগে উঠার সময়। এভাবেই লম্বা সফরে গেলে ঘুমের সমস্যা হয়। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কমপক্ষে দু-তিন দিন লেগে যায়।

এ বয়সে সফরে একটানা ২১ ঘণ্টা বসে থেকে এতটা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে, এ ধকল সামলাতে কয়েকদিন লাগল। ঢাকার বাড়ি থেকে যে সময় রওয়ানা হলাম সে সময় ফজরের পর ঘুমাতাম। দুপুরে খাওয়ার পর আবার ঘুমের অভ্যাস। রাত এগারোটায় আবার ঘুম। সফরে তিন-তিনবার ঘুমের সময় বসে থাকতে বাধ্য হলাম। তাই এত ক্লান্তি। দৈহিক ক্লান্তি সত্ত্বেও সবার সাথে দেখা হওয়ার আনন্দে সে কষ্ট দূর হয়ে গেল।

আড়াই মাসের কতদিন কার বাড়িতে থাকব

ইতঃপূর্বে ম্যানচেস্টারে যতবার এসেছি, আমীনের বাড়িতেই থাকা বেশি পছন্দ করেছি। ছেলেদের অন্য কারো বাড়িতে বেড রুমের এটাচড্ বাথরুম নেই। লেখাপড়া করার জন্য টেবিল-চেয়ার নিয়ে জানালার পাশে সুন্দর পরিবেশে বসার যে ব্যবস্থা এ বাড়িতে আছে, তা অন্য কোথাও নেই। অন্য ছেলেদের দাবি পূরণের প্রয়োজনে দুই-তিন দিন তাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। কিন্তু একটানা শুধু আমীনের বাড়িতেই থেকেছি। জানালার পাশে দোতলায় বসলে সামনে আমীনের সুন্দর সাজানো বাগান। আরো সামনে সবুজ প্রশস্ত খোলা পার্ক। আমীনের বাগানে বড় বড় লাল গোলাপ ফুটে আছে। আরো কয়েক রকম ফুল আছে। আর আপেল, আলু বোখারা, নাশপাতি ও চেরী গাছে ফল ধরে আছে। বাগান সাজানোর দায়িত্ব বৌমা ডালিয়াই পালন করে থাকে।

www.bjilibrary.com

এ দেশে রাস্তার দুই পাশে বাড়িগুলো একটার সাথে অন্যটা লেগে আছে। মাঝে কোনো ফাঁকা নেই। আমীনের বাড়ি এদিক দিয়েও ব্যতিক্রম। কোনো বাড়ি এর সাথে লাগানো নয়। শুধু এক দিকে আলাদা একটা বাড়ি আছে, অন্য সব দিকে খোলা।

এতদিন লন্ডনে এমন কেউ ছিল না, যেখানে থাকার জন্য যাওয়া যায়। বেড়ানোর মতো দীনী ভাইদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু কোনো উপলক্ষ ছাড়া সেখানে যাওয়া স্বাভাবিক নয়। গত বছর সংগঠনের প্রয়োজনে তিন বার এবং বিয়ে উপলক্ষে দুবার এবং নাতজামাইয়ের বাড়িতে বেড়াতে এক বার মোট ছয় বার লন্ডন গিয়েছি।

এবার ছোট ছেলে সালমান লন্ডন থাকায় ওর বাসায় থাকার জন্য যেতেই হবে। সালমানের দুই মেয়ে। সাড়ে নয় বছরের নাবা ও পাঁচ বছরের সাফা সম্পর্কে আগে বেশ কয়েকবার লিখেছি। এক কুড়ি নাতি-নাতনির মধ্যে শুধু এরা দুজনই জন্মের পর থেকে ২০০৫ সালের জুন পর্যন্ত আমার সাথে ছিল। গত বছর সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ওদেরকে ম্যানচেস্টার রেখে আমরা ঢাকা চলে গেলাম। বিদায়ের সময়কার করুণ বিবরণ পূর্বে লিখেছি। আমরা কেন চলে যাচ্ছি, সে কথা নাবা বুঝলেও সাফা বুঝতে পারেনি। বারবার মুখ ভার করে জিজ্ঞাসা করছিল যে, ওকে ফেলে কেন চলে যাচ্ছি। গত নয় মাস বারবার ফোন করে জানতে চেয়েছে যে, আমরা কবে আসব। দাদা-দাদুর জন্য ওরা যেমন পাগল, আমরাও ওদেরকে দেখার জন্য ব্যাকুল। তাই সিদ্ধান্ত হলো, দেড় মাস সালমানের বাসায় থাকব। আমীনের বাড়িতে এক সপ্তাহ থেকে ৭ জুলাই লন্ডন চলে এলাম। মোমেন নিজের গাড়ি চালাচ্ছিল। বিকাল সাড়ে আটটায় রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম। এশার নামাযের পর খেয়ে আলাপ-সালাপ করে ৩টায় ফজরের নামায শেষে ঘুমালাম।

সালমানের বাসা

রাত সাড়ে বারোটায় পৌঁছে দেখি নাবা অপেক্ষা করতে করতে সোফায়ই ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সাফা তখনো জেগে আছে। বাসায় ঢুকতেই দোতলা থেকে দৌড়ে এসে সিঁড়ি থেকেই দাদুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাদু ওকে চুমু দিতে থাকল। সে আমাদেরকে পেয়ে কয়েক দিন পর্যন্ত এমন আহ্লাদী ভাব দেখাল, যা স্বাভাবিক আচরণ থেকে কিছুটা ভিন্ন।

আমীনের বাড়ি থেকে সালমানের বাসায় পৌঁছলাম। ভাড়া বাড়িকে আমি বাসা বলি। নিজের বাড়ি হলে বাসা না বলে বাড়ি বলি। যে বাসায় দেড় মাস থাকব সে বাসাটা থাকার মতো কি না, এ বিষয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! খুবই চমৎকার বাসা। আমীনের সাজানো বাগান ছাড়া পরিবেশ তেমনই খোলামেলা। লেখাপড়ার জায়গা আমীনের বাড়ির মতোই।

গত নয় মাস লন্ডনে সালমান কম ভাড়ায় থাকতে চেষ্টা করে খুব কষ্ট পেয়েছে। লন্ডনে মূল শহরের ঘিঞ্জি এলাকা বাদ দিয়ে একটু দূরে মাসিক সাড়ে সাত শ' পাউন্ড ভাড়ায় যে বাসা পেয়েছে, শহরের ভেতরে এমন একটা বাসা বার শ' পাউন্ডের কমে পাওয়া যাবে না। মাত্র দেড় মাস পূর্বে এ বাসায় উঠেছে। চারদিকে সবুজের সমারোহ। যে গাছগুলো শীতকালে দেখলে মনে হয় যেন পুড়ে কালো হয়ে গেছে, সেসব গাছ এমন সজীব ও সবুজ যে দেখে চোখ জুড়ায়।

www.bjilibrary.com

সাফা আগামী সেপ্টেম্বরে স্কুলে যাবে। বাসার কাছেই খুব ভালো মানের প্রাইমারি স্কুল আছে। লন্ডনে কয়েক মাস নার্সারি স্কুলে যাতায়াত করে সে ইংরেজিতে কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাংলা বলতে চায় না। ওর দাদু যখন বাংলা বলার জন্য চাপ দেয় তখন একটু ভেবে-চিন্তে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে বলে। বাসায় ওর বাবা-মা বাচ্চাদের সাথে বাংলাকেই বলে। নাবাও বাংলা বলে; কিন্তু সাফা নতুন ভাষা শিখে সে ভাষাই বলতে থাকে। বাংলায় প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে জবাব দেয়। বাংলা বোঝে কিন্তু ইংরেজিতে বলতেই সহজ মনে করে। এর ফলে স্কুলে ভালো করবে বলে আশা করা যায়। বাসার সবাই বাংলায় কথা বললে সেও বলবে বলে ধারণা হয়। তবে চেষ্টা করে বাংলা বলতে পারলে সে খুশি হয়।

শেষ তিন সপ্তাহ

দশ সপ্তাহের মধ্যে এক সপ্তাহ আমীনের বাড়িতে থেকে সালমানের বাসায় ছয় সপ্তাহের জন্য এলাম। বাকি তিন সপ্তাহ ম্যানচেস্টারেই থাকার কথা রয়েছে এবং আমীনের বাড়ি থেকেই ঢাকা রওয়ানা হওয়ার আশা। শুধু শেষ সপ্তাহ আমীনের বাড়িতে থাকা হবে। দুই সপ্তাহ এবার মোমেনের বাড়িতে (বাসা নয়) থাকতে হবে। মোমেনের মায়ের এটাই সিদ্ধান্ত।

গত বছর মোমেনের বাড়িতে মাত্র দুই দিন ছিলাম। বেডরুমের নিকটে একমাত্র টয়লেট ও বাথরুম মোটেও ভালো ছিল না। আর নিচে ড্রইং রুমে বসলে টয়লেট করার জন্য দৌড়িয়ে উপর তলায় যেতে হতো। বেচারা অনেক টাকা খরচ করে নিচে বাথরুম বানিয়েছে এবং দোতলার বাথরুম আমীনের বাথরুমের মতোই প্রশস্ত ও সুন্দর করেছে। আমি মোমেনের বাড়িতে এক সপ্তাহ থাকব মনে করেছিলাম। মোমেনের মায়ের দুই সপ্তাহ থাকার সিদ্ধান্তই মেনে নিলাম।

আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যাম আমার আগেই ম্যানচেস্টার পৌঁছেছে। ওর বড় ছেলে সোহায়ল ওখানে থাকে। তার ছোট ছেলে ডা. ফায়সাল সপরিবারে কানাডায় চলে গেছে। সে একমাত্র মেয়ে প্রফেসর ডা. নাঈমার সাথেই ছিল। মেয়ে তার ছেলের সাথে মিলিত হতে অস্ট্রেলিয়া গেছে। ওর জন্য খুবই মায়া লাগে। স্ত্রীহারা হওয়ার পর নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হচ্ছে। নিজের বাড়িতে একা থাকবে কেমন করে? তাই তাকে ছেলে বা মেয়ের বাড়িতে থাকতে হয়।

দীনী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ

আমি কোথাও গেলে দীনী ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে অত্যন্ত আনন্দবোধ করি। আমি ৭ জুলাই লন্ডন আসছি জানতে পেরে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর প্রেসিডেন্ট ও লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির লেকচারার জনাব হাবিবুর রহমান ম্যানচেস্টারে ফোন করে দাওয়াত দিলেন যে, আমি যেন পরের দিন বিকেলে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে ফোরামের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে উপস্থিত হই। জেনে খুশি হলাম যে, লন্ডন পৌঁছার পরপরই দীনী ভাইদের সাথে দেখা হয়ে যাবে।

বিকেল ছয়টায় যথাস্থানে পৌঁছলাম। কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ের পর ফোরামের প্রেসিডেন্ট মজলিসে শূরার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ

www.bjilibrary.com

জানালেন। আমি বললাম :

১. রাসূল (স) ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে সাথীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করুন।' রাসূলুল্লাহ (স) যেসব বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ পেতেন না সেসব বিষয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন। রাসূল (স) সর্বপ্রথম বদর যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সেখানে যে জায়গায় ক্যাম্প করতে চাইলেন, যুদ্ধে অভিজ্ঞ সাহাবীগণ তা সঠিক মনে করেননি। তাঁরা জানতে চাইলেন, এ বিষয়ে ওহীর নির্দেশ আছে কি না। তিনি বললেন, এ বিষয়ে কোনো ওহী আসেনি। সাহাবীগণ যেখানে ক্যাম্প করতে পরামর্শ দিলেন সেখানেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

২. সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব যার উপর থাকে তিনিই সাধারণত করণীয় সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন। যা যা করণীয় বলে তিনি মনে করেন সেসব বিষয়ে মজলিসে শূরায় পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাঁর চিন্তা যতই সঠিক বলে তিনি মনে করেন না কেন, বিনা পরামর্শে তা সংগঠনের উপর চাপিয়ে দিলে সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হবে না। কারণ, সংগঠনের সাথীরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরীক না থাকায় তারা মনের দিক দিয়ে আন্তরিক ও সিরিয়াস হবেন না। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলে প্রত্যেকেই নিজের সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করবেন এবং বাস্তবায়নে আন্তরিক ও সিরিয়াস হবেন।

৩. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বেলায় বেশি সময় লাগলেও সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাসূল (স) বলেছেন, 'আমার উম্মত কোনো ভুল সিদ্ধান্তে একমত হবে না।' এটা বিরাট এক গ্যারান্টি। মাওলানা মওদূদী (র) মজলিসে শূরার ৫০ জন সদস্যের মধ্যে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তাকে সম্মত করার জন্যও চেষ্টা করতেন। আমি আজীবন এ নীতি অবলম্বন করে উপকৃত হয়েছি।

৪. যদি কোনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগুরুর মতামতের ভিত্তিতে গ্রহণ করতেই হয়, তাহলে সবাইকে তা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত বলেই মেনে নিতে হবে। তা না হলে সংগঠন অচল হয়ে পড়বে। যারা ভিন্নমত পোষণ করেন তারা সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোথাও মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না। অবশ্য যে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানেই পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারবেন।

ভিন্নমত পোষণকারী মজলিসে শূরার কোনো সদস্য যদি এমন থাকেন যিনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে নিজেকে অক্ষম মনে করেন, তাহলে তিনি সদস্য থাকা অবস্থায়ও সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন।

৫. মজলিসে শূরার বৈঠকে সবাই খোলা মন নিয়ে বসবেন। কোনো বিষয়ে মজলিসে শূরার বাইরে একাধিক সদস্য একমত হয়ে গ্রুপ হিসেবে কোনো সিদ্ধান্তের পক্ষে জোট বাঁধতে পারবেন না। সবাই আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে নিজের খালেস রায় পেশ করবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মজলিসে শূরার সভাপতিকে সাহায্য করবেন.

www.bjilibrary.com

এ কয়েকটি মূলনীতি পেশ করার পর আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে দেখালাম যে, যারা মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে সংগঠন ত্যাগ করেছেন বা বহিষ্কৃত হয়েছেন, তারা পরবর্তী সময়ে ইসলামী আন্দোলনে কোনো অবদান রাখতে পারেননি।

মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে দুজন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিবিরের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আজাদ ও সাবেক শিবিরনেতা মাওলানা আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ। মজলিসে শূরার বৈঠক থেকে বের হলে সাবেক শিবিরসভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুলের দেখা পেলাম। ঘটনাক্রমে এরা তিনজনই আপন ভায়রা। তাদেরই ছোট শালীর সাথে গত বছর আমার বড় নাতি নাবীলের বিয়ে হয়েছে। সে কথা 'জীবনে যা দেখলাম' ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিয়ের ফলেই আমি তাদের দাদার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি। আর তারা আমার নাতির পজিশনে পর্যবসিত হয়েছে।

এ দেশে উচ্চ ডিগ্রির জন্য আগত বাংলাদেশিদেরকে সংগঠিত করার দায়িত্ব ডা. মুকুল পালন করছে। এ মাসের শেষদিকে তাদের একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে আমাকে দুদিন দুটো বিষয়ে আলোচনার দাবি জানালে আমি সম্মত হতে বাধ্য হলাম।

মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে আরো যাদেরকে পেলাম–

১. একান্ত স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল কাইউম। আমার ঘনিষ্ঠ দীনী বন্ধু মরহুম মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহর জামাতা বলেই আমার স্নেহভাজন। তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের সুযোগ্য ও জনপ্রিয় খতিব।
২. মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন ফারাদী, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের সাবেক প্রেসিডেন্ট।
৩. মাওলানা সাঈদ আহমদ, ঢাকাস্থ তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল।

মজলিসে শূরা সদস্যগণের মধ্যে আর যারা আছেন তারা বাংলাদেশে বেশি পরিচিত নন বলে তাদের কথা উল্লেখ করলাম না।

মজলিসে শূরার বৈঠকের পর সোয়া ৭টায় ইস্ট লন্ডন মসজিদে আসরের নামাযে খতিব সাহেবই ইমামতি করলেন। নামাযের পর খতিব সাহেব একজন যুবককে মাইকে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করালেন। অনেক মুসল্লি নওমুসলিমের সাথে আবেগের সাথে কোলাকুলি করলেন।

৭/৭-এর ১ম বার্ষিকী

২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে আত্মঘাতী জঙ্গিদের বোমা হামলায় ৫২ জন নিহত ও প্রায় ৭০০ জন আহত হয়েছে। গত ৭ জুলাই শুক্রবার হতাহতদের স্মরণে ব্রিটেনের সর্বস্তরের জনগণ দুই মিনিট নীরবতা পালন করেছে। বেলা বারোটার পর দুই মিনিটের জন্য গোটা ব্রিটেন থমকে দাঁড়িয়েছিল।

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, বোমা হামলার বার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এক বিরাট সুযোগ করে দিয়েছে।

আত্মঘাতী চার জন মুসলিম যুবক বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক ছিল। তাই এর প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায় নানা রকমের বর্ণবিদ্বেষ ও বর্ণবাদী হামলার শিকার হয়েছে।

ঐ হামলাকারীদের একজন পাকিস্তান বংশোদ্ভূত শাহজাদ তানভীর। সম্প্রতি হামলার প্রাক্কালে তার রেকর্ড করা বক্তব্য সংবলিত একটি নতুন ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই হামলার জন্য ব্রিটিশ সরকারই দায়ী। শাহজাদ তানভীর দাবি করেছে যে, ইরাক, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ সরকারের নীতির কারণেই এ হামলা করা হয়েছে।

বেলা সাড়ে বারোটায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারে 'সেভেন/সেভেন' বিষয়ক আলোচনা সভায় বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্টজন অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সেক্রেটারি জেনারেল ও লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ডাইরেক্টর দেলাওয়ার হোসাইন খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর সেন্ট্রাল প্রেসিডেন্ট হাবিবুর রহমান, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী, লিস্টারের ইসলামিক স্কলার ইমাম ইবরাহীম মগা, পুলিশ সুপার ডাল বাবু ও মেয়র শফিকুল হক।

নিহতদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি মুসলিম যুবতী সাহারা ইসলামের মামা ড. কামরুল হাসানও বক্তব্য রেখেছেন। কী কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল, এর সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়ায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

গত বছর আমি পত্রিকা ও টিভিতে কয়েকবার সাহারা ইসলাম ও তার শ্মশ্রুমণ্ডিত দাদার ছবি দেখেছি এবং ইস্ট লন্ডন মসজিদে ঐ দাদাকে দেখে চিনেছি ও সমবেদনা জানিয়েছি।

ইউরোপের সর্ববৃহৎ ইসলাম এক্সপো

৬ থেকে ৯ জুলাই (২০০৬) লন্ডনের আলেকজান্দ্রা প্রাসাদে এক বিশাল অপূর্ব অনুষ্ঠানমালা হয়ে গেল। এটা ইউরোপের সর্ববৃহৎ ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী হিসেবে সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে।

খ্যাতিমান ইসলামিক চিন্তাবিদ, ব্রিটেনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনীতিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ক্বারী, শিল্পী, আবৃত্তিকার, কমেডিয়ানসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি, সাদা-কালো পুরুষ-মহিলা, শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাতে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাপ্তাহিক ইউরো-বাংলা পত্রিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। মুসলিম এ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিটেন জানিয়েছে, ইসলাম এক্সপো-তে নাট্যপ্রদর্শনী, পণ্যপ্রদর্শনী, সেমিনার, বিতর্ক, চলচ্চিত্র ও পারিবারিক বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম স্থান পেয়েছে।

www.bjilibrary.com

৬ জুলাই এর উদ্বোধন করেছেন লন্ডনের মেয়র কেন্ লিভিং স্টোন, লর্ড কুই ও বিখ্যাত ইসলামী কণ্ঠশিল্পী ইউসুফ ইসলাম। ইসলাম, খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্মসহ বিশ্বের ২২টি দেশের বক্তা এতে যোগদান করেছেন।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জামাল বাদাবী, মেয়র ক্যান্ লিভিং স্টোন, লর্ড নাজির আহমদ, ড. তারিক রামাদান, ড. আয্যাম তামিমী, প্রফেসর নরমেন ক্যাম্বার, প্রফেসর মারভেন কাভাচি, সাদিক খান এমপি, স্যার ইকবাল সাকরানী, ড. আবদুল বারী, তালেবানদের হাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মহিলা সাংবাদিক পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণকারিণী ইভন রিড্লি, বিবিসি লন্ডনের আসাদ আহমদ, রেসপেক্ট-নেত্রী সালমা ইয়াকুব প্রমুখ।

ইসলাম এক্সপো'র সমর্থনে ছিলেন লন্ডনের মেয়র, লন্ডন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, মুসলিম এসোসিয়েশন অব ব্রিটেন, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন। স্পন্সর করেছে ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রিটেন, ইসলামিক রিলিফ, হেল্পিং হ্যান্ডস্, দি কর্ডোভা ফাউন্ডেশন ও হিউম্যান আপিল ইন্টারন্যাশনাল। সহযোগিতা করেছে ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ফসিস, ফ্র্যান্ডস অব আল আকসা প্রভৃতি সংগঠন।

লন্ডনের মেয়র বলেছেন, ইসলাম এক্সপো আমাদেরকে মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পরস্পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে।

সাদিক খান এমপি বলেন, এ এক্সপো ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান করবে এবং ব্রিটিশ মুসলিমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

মুসলিম এসোসিয়েশন অব ব্রিটেন-এর মুখপাত্র আনাস আল তিকরিতি বলেন, শুধু ব্রিটেনের ১৮ লাখ মুসলমানই নয়, এ এক্সপো থেকে সব ধরনের মানুষই বুঝতে পারবে যে, ইসলাম হুমকির ধর্ম নয়।

৮ জুলাই বিকেলে 'এ উইম্যানস জার্নি টু ইসলাম' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, আর শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। এ সময় অনেকের মাঝেই ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছে। ইভন রিডলি আফগানিস্তানে তাঁর তালেবানের হাতে বন্দি ও মুক্তি পাওয়া এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ কাহিনী শোনালেন। তালেবানদের হাতে বন্দি অবস্থায় তাদের মানবিক আচরণে মুগ্ধ হয়েই তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন বলে জানালেন।

ইউরো-বাংলায় ইসলাম এক্সপো উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীসমূহের বিবরণ পড়ে চিন্তা করলাম, এটা দেখার সুযোগ পেলে অবশ্যই যেতাম।

www.bjilibrary.com

২৭৬.

লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ বৈঠক

১৪ জুলাই (২০০৬) লন্ডন মুসলিম সেন্টারে স্থানীয় কয়েকটি ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকটি মূলত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আগমন উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল। তখন ঢাকায় জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল। বিশেষ কোনো কারণে প্রধানমন্ত্রী নিজামী সাহেবকে সংসদে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে তিনি আসতে পারেননি।

ইউরোপের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা ড. কামাল হালওয়াভীর অনুরোধে বৈঠকটি বাতিল না করে চালু রাখা হয়। ড. কামাল ব্রিটিশ নাগরিক হলেও জন্মগতভাবে মিসরীয়। 'মুসলিম এসোসিয়েশন অব ব্রিটেন' নামে ইখওয়ানদের যে সংগঠন রয়েছে তিনি এর নেতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি গোটা ইউরোপের ইখওয়াননেতা।

এ বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা নয়, এমন কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ঐ সময় ইংল্যান্ডে উপস্থিত থাকায় তাঁদেরকেও দাওয়াত দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর নায়েবে আমীর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ ও সেক্রেটারি জেনারেল সাইয়েদ মুনাওয়ার হাসান ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম।

বিকাল সাড়ে ৭টায় পৌঁছলাম। প্রফেসর খুরশিদ আমাকে বললেন, আপনি আসবেন শুনেই আমি এলাম। তিনি ১০০ মাইল দূর লিস্টার থেকে এসেছেন। ড. কামাল আলিঙ্গন করে বললেন, আপনাকে পাব বলে তো আশা করিনি। বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই ড. কামাল ঘোষণা করলেন, 'বিবিসির চ্যানেল ফোর থেকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিবেশিত তথাকথিত একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম এখন প্রচারিত হচ্ছে। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ডাইরেক্টর জনাব দেলাওয়ার হোসাইন খান এ ডকুমেন্টারি ফিল্ম-এর ক্যাসেট সংগ্রহ করেছেন। ওটা দেখার পর আমাদের বৈঠক শুরু হবে।' সে অনুযায়ী সবাই একটি বড় পর্দায় আধা ঘণ্টায় ফিল্মটি দেখলাম।

ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রতিপাদ্য

উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্মের আলোচ্য বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে 'Who Speaks For British Muslims'. ইংল্যান্ডের ২০ লাখ মুসলমানের মধ্যে ১০ লাখই লন্ডনে বাস করে। এ ২০ লাখ মুসলমানের মুখপাত্র কারা? ব্রিটিশ সরকার কাদেরকে ব্রিটিশ মুসলিমদের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করবে? এটাই ঐ ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রতিপাদ্য।

ব্রিটিশ সরকার 'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন' (MCB) নামে এ দেশের মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একমাত্র বৃহৎ ফেডারেশনটিকেই ব্রিটিশ মুসলিমদের মুখপাত্র মনে করে। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ফেডারেশনটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মোট ৪২০টি সংগঠন

www.bjilibrary.com

ও প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ সংগঠনই মসজিদভিত্তিক। বিশ্বের বহু দেশ থেকে আগত মুসলমান যারা এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই কয়েক পুরুষ থেকে ব্রিটিশ নাগরিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই তাদেরকে সংগঠিত করেছে। নিজ নিজ দেশের মাতৃভাষায় ইসলামের জ্ঞানচর্চা ও জুমআর খুতবার প্রয়োজনেই দেশভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাদরাসাগুলোকে ভিত্তি করেও তারা সংগঠিত। এসব সংগঠনই MCB নামক বৃহৎ সংগঠনের সদস্য।

উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্মের আসল টারগেটই হলো MCB। তারা সরকারকে অবহিত করে দিচ্ছে, MCB সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্রিটিশ মুসলিমের প্রতিনিধিত্ব করে না। সাধারণ মুসলমানরা রাজনীতিবিমুখ। কিন্তু MCB-এর পেছনে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামী রয়েছে, যারা রাজনৈতিক ইসলামে বিশ্বাসী ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়। তাই MCB-এর সাথে সরকারের সম্পর্ক থাকা উচিত নয় এবং MCB-কে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতিনিধি গণ্য করাও মোটেই সঙ্গত নয়।

MCB-এর আরো একটি বড় অপরাধ(!) হলো, তারা কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে করে না। তাদের দাবি হলো, কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত MCB-কে সরকারের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত নয়।

MCB ও ব্রিটিশ সরকার

১৯৯৭ সালে MCB কায়েম হওয়ার পর থেকেই মুসলিম কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিটিশ সরকার এ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের পূর্ববর্তী সরকারের সময় তিনি MCB-এর এক বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন। ২০ লাখ মুসলিম কমিউনিটির যেসব সমস্যার সমাধান সরকারের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব এবং তাদের যাবতীয় অধিকার যা সরকার থেকে হাসিল করা প্রয়োজন সেসব দায়িত্ব MCB পালন করে থাকে। ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে মুসলমানদের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যাতে মুসলমান কমিউনিটি যথাযথভাবে পালন করে, সে বিষয়ে কমিউনিটিকে সজাগ ও সচেতন করে সরকারকে সাহায্য করার দায়িত্বও MCB পালন করছে। MCB এ উভয় প্রকার দায়িত্ব পালন করে সরকারের সুদৃষ্টি আকৃষ্ট করায় এর সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল সাকরানীকে গত বছর রানী এলিজাবেথ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে ভয়ঙ্কর বোমা হামলার পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যে প্রতিনিধিত্বমূলক সমাবেশ আহ্বান করেছেন, তাতে MCB-এর পক্ষ থেকে সেক্রেটারি জেনারেল স্যার ইকবাল সাকরানী ও ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী সেখানে বক্তব্য রেখেছেন। এ বছর MCB-এর নির্বাচনে ড. আবদুল বারী সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হয়েছেন।

www.bjilibrary.com

চ্যানেল ফোর তো বিবিসির একটি শাখা মাত্র। গত বছর বিবিসির মূল চ্যানেল থেকেই 'পেনোরামা' নামে একটি প্রোগ্রামে MCB-এর বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান চালানো হয়েছে। তখনো ব্রিটিশ সরকার বিভ্রান্ত হয়নি। আশা করা যায়, চ্যানেল ফোরও সরকারকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে না।

অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ

চ্যানেল ফোর-এর ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখার পর ড. কামাল হালওয়াভীর সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হয়েছে। ড. কামাল বৈঠকে কোন্ বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন জানি না, ঐ ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখার পর সেটাই আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। সভাপতি প্রথমে দাওয়াতুল ইসলামের সাবেক আমীর জনাব আবদুস্ সালামকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। তাঁর পর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন। এরপর আমাকে বলতে দিলে আমি বললাম, 'যত দিন ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল তত দিন ইহুদি-খ্রিস্টানদের তেমন কোনো আপত্তি ছিল না। ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামী ইসলামকে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' হিসেবে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন করায় স্বাভাবিক কারণেই বিরোধিতা হচ্ছে। অমুসলিমপ্রধান এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের বিরোধিতা করাই তো স্বাভাবিক। মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলাদেশেই আমরা এ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে আছি মুসলিম নামধারী একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতাদের কারণে।

আমি আরো বললাম, এ ডকুমেন্টারি ফিল্মে দাবি করা হয়েছে যে, MCB অধিকাংশ মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করে না। আপনারা প্রমাণ করুন, আপনারাই তাদের প্রতিনিধি। ডকুমেন্টারি ফিল্মে তথাকথিত 'সুফি মুসলিম কাউন্সিল' নামে যেসব সংগঠনকে মেজরিটি ব্রিটিশ মুসলিমের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে, তারা বাস্তবে এ দাবির প্রমাণ দিতে পারবে না।

ড. কামালকে আমি পরামর্শ দিলাম যে, ৪২০টি সংগঠনের ফেডারেশন হিসেবে MCB যদি আগামী রমজানকে স্বাগত জানিয়ে লাখ লাখ ব্রিটিশ মুসলিমের একটা মিছিল করে তাহলে সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে যে, কারা এ দেশের মুসলমানদের মুখপাত্র। ড. কালাম বললেন, আমরা অবশ্যই এটা করব।

বাংলাদেশে একই চিত্র

বেশ কয়েকটি মহল বহুদিন থেকে সরকারি দল হিসেবে বিএনপিকে পরামর্শ দিচ্ছে যে, তারা যেন জামায়াতে ইসলামীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ইসলামী দলকে সাথে নেয়। ইসলামী মুখপত্রের দাবিদার দৈনিক ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয়তে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জামায়াত বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী শক্তি নয়। ইসলামের নামে বেশ কয়েকটি দল পল্টন ময়দানে জনসভা করে জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে দৈনিক ইনকিলাব ও সকল আওয়ামীপন্থি পত্রিকায় খবরের শিরোনাম হয়েছে।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী এসব দলের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করেনি। নেতিবাচক কোনো কর্মসূচি পালন না করে ইতিবাচক কর্মসূচির মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির পল্টনে পৃথক পৃথক মহাসমাবেশ করে ইতিবাচক বক্তব্য রেখেছে। জামায়াত পল্টনে বিশাল ওলামা সমাবেশ করে প্রমাণ করেছে যে, আলেম সমাজের বিরাট অংশ জামায়াতের সাথে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়।

জামায়াতের রুকন সম্মেলনে বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও শিবিরের মহাসমাবেশে বিএনপি ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ শামিল হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা জামায়াতবিরোধী প্রচারণায় বিভ্রান্ত হননি।

উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্মে মাওলানা সাঈদী প্রসঙ্গ

উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্মের দৃষ্টিতে ইসলামী রাজনীতি করা ও ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালানোর অপরাধে আরব বিশ্বে ইখওয়ানুল মুসলিমুন এবং হিমালয়ান উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামী দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ দুই আন্দোলনের সাথে জড়িত লোকেরাই ব্রিটেনে MCB-এর নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় ইখওয়ান ও জামায়াতনেতারা এ দেশে এসে অরাজনীতিক মুসলমানদেরকে ইসলামী রাজনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন। আফগানিস্তান ও ইরাকের সন্ত্রাসী সরকারকে উৎখাত করে আমেরিকা ও ব্রিটেন যে জনগণের সরকার কায়েম করেছে, ঐ নেতারা এর বিরোধী। তারা তালেবান ও সাদ্দাম সরকারের সমর্থক বলেই গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের বিরোধী। তাই ব্রিটেনের হোম অফিস যেন এ জাতীয় নেতাদেরকে এ দেশে আসার জন্য ভিসা না দেয়, সে দাবিই করা হয়েছে।

তারা দুই আন্দোলনের নেতাদের মধ্য থেকে দুজনকে টারগেট করেছে। ইখওয়াননেতা মিসরীয় ড. শায়খ ইউসুফ আল কারযাভী ও বাংলাদেশের জামায়াতনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। ডকুমেন্টারি ফিল্মে ড. কারযাভীকে শুধু দেখানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে, হোম অফিস তাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল; কিন্তু লন্ডনের মেয়রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ভিসা পেয়ে গত বছর তিনি লন্ডন এসেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলা সমর্থন করেন। দুই বছর আগে লন্ডনে বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি সংগঠন কায়েম হয়েছে, যার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন ড. কারযাভী।

ডকুমেন্টারি ফিল্মে দেখানো হয়েছে মাওলানা সাঈদী অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দুই হাত নাড়িয়ে ইরাকের দখলদার আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। মনে হয় বাংলাদেশের কোথাও তাঁর বক্তৃতারত অবস্থার এ ছবিটি সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষায়ই বক্তৃতা করছিলেন। আমি তাঁর বক্তব্য যেটুকু শুনতে পেলাম তা হলো, 'হে আল্লাহ! ইরাকে আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর সবাইকে ঈমান আনার তাওফীক দাও, আর না হয় ইরাকের জমিনেই ওদেরকে দাফন করে দাও, একজনও যেন দেশে ফিরে যেতে না পারে।' কথাটি Symbolic, যেমন বলা হয়– 'সরকারকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া হবে।' এর অর্থ আক্ষরিক অর্থেই দাঁত ভেঙে দেওয়া নয়।

www.bjilibrary.com

ব্রিটেনে মাওলানা সাঈদী

মাওলানা সাঈদী বহু দেশই সফর করেন; তবে তিনি সবচেয়ে বেশি ব্রিটেনেই সফর করে থাকেন। ৩০ বছর ধরে প্রতি বছর ব্রিটেন সফর করছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর হার্টের চিকিৎসা লন্ডনেই হচ্ছে এবং বছরে কমপক্ষে একবার চেকআপ করার জন্য তাঁকে লন্ডন আসতে হচ্ছে। এবারও সে উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন।

বাংলাদেশে তাঁর মাহফিলে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নারী-পুরুষ সমবেত হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কণ্ঠকে যে জনপ্রিয়তা দান করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি যে শ্রোতাপ্রিয়তা পেয়েছেন তা অতুলনীয়। ব্রিটেনে বাংলাদেশের অনেক আলেম আসেন এবং প্রচুর ওয়ায-মাহফিল হয়। এখানেও তাঁর বক্তব্য শুনতে বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ হাজির হয়। ২০০৫ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলার পর তিনি সারা গ্রেট ব্রিটেনে বোমা হামলার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছেন। তিনি ব্রিটেনের অনেক প্রশংসা করে বলেছেন, সারা দুনিয়া থেকে রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত মানুষ নিজ দেশের সরকারের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্রিটেনে এসে আশ্রয় পায়। সকল ধর্মের মানুষ এ দেশে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। এমন একটি উদার দেশে কতক পথভ্রষ্ট মুসলিম যুবক বোমা হামলা করে গোটা মুসলিম কমিউনিটিকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং বর্ণবাদীদেরকে খেপিয়ে দিয়েছে।

মাওলানা সাঈদীর এসব বক্তব্যের রিপোর্ট সরকারের গোচরীভূত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ চ্যানেল ফোর এবার তাঁকেই টারগেট বানাল। ব্রিটেনের এমন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হয়েও তিনি রেহাই পেলেন না।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, চ্যানেল ফোর-এর অপপ্রচারে এখানকার বেশ কয়েকটি পত্রিকা বিভ্রান্ত হয়ে এ খবর প্রচার করেই ক্ষান্ত হয়নি। সম্পাদকীয় লিখে তাঁকে ব্রিটেনে আসার ভিসা না দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছে। দৈনিক টাইমস্ 'ইসলামিস্ট হার্ড লাইনার হেডস ফর ব্রিটেন' নামে বিরাট এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। অবজারভার পত্রিকাও তার বিরোধিতা করেছে। ট্যাবলয়েড সান পত্রিকা তো ভদ্রতার সকল সীমা লঙ্ঘন করে সম্পাদকীয়তে মাওলানাকে 'বিস্ট' বলতেও দ্বিধা করেনি। সম্পাদকীয়-এর হেডিং দিয়েছে 'Ban this Beast'. কী চরম হিংস্রতার প্রকাশ!

চ্যানেল ফোরের উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্মের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি যে দীর্ঘ লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন তা ইউরো-বাংলা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর ছবিসহ ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে; কিন্তু এ বক্তব্য কোনো ইংরেজি পত্রিকায় তো প্রকাশ করা হবে না।

MCB এর প্রতিবাদে যে বক্তব্য দিয়েছে তা কোনো কোনো ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চ্যানেল ফোর MCB-কে টারগেট করায়ই হয়তো তা প্রকাশ করতে হয়েছে। কিন্তু সাঈদী সাহেবের বক্তব্য তো ইংরেজি পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণ জানল না।

এ জঘন্য অপপ্রচার সত্ত্বেও হোম অফিস প্রভাবিত না হলে এবং ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাই কমিশন সাঈদী সাহেবকে ভিসা দিলে তিনি অবশ্যই এ দেশে আসতে পারবেন। যত দিন

www.bjilibrary.com

ভিসা না দেবে তত দিন হয়তো আসতে পারবেন না। তিনি সশরীরে এখানে না এলেও তাঁর বক্তৃতার ক্যাসেট বন্ধ করার সাধ্য কারো নেই।

মাওলানা সাঈদীর বিবৃতি

চ্যানেল ফোর-এর প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি নিম্নলিখিত বক্তব্য দিয়েছেন :

"বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। ভারতে যখন উগ্রপন্থি হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙে দিল তখন বাংলাদেশে আমার নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য দেশব্যাপী কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে আমার বক্তব্য ছিল বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিশোধ বাংলাদেশে নেওয়া যাবে না। ইসলাম একজনের অন্যায়ের শাস্তি অন্যকে দেয় না। আমার নির্বাচনী এলাকা পিরোজপুরে মোট ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজারের মধ্যে হিন্দু ভোটার ৬৫ হাজার, এদের অনেকেই আমাকে ভোট দেয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এ্যাডভোকেট শুধাংশু শেখর হালদার; তার থেকে আমি ৩৫ হাজার ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছি।

রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, ব্রিজ নির্মাণ, বিদ্যুতায়ন, স্কুল-কলেজ নির্মাণ ও এমপিওভুক্তকরণসহ আমার নির্বাচনী এলাকার হিন্দু অঞ্চলে আমি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। প্রায় একশত মন্দির সংস্কারে এবং পূজায় আর্থিক সাহায্য করেছি। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান ও পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী গত ২৯ মার্চ (২০০৬) আমার পিরোজপুর এলাকা সফর করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আমার উন্নয়নমূলক কাজ দেখে জনসভায় প্রশংসা করেছেন। আমার জনসভাগুলোতে হিন্দু নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে এবং আমাকে তারা নির্বাচনে ভোট দেয়। পিরোজপুর-১ আসনে তিনটি উপজেলা। পিরোজপুর জেলা সদরসহ তিনটি উপজেলা অফিসসমূহে যথেষ্ট পরিমাণ হিন্দু অফিসার কর্মরত আছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সেখানে অক্ষুণ্ন রয়েছে। যে কেউ আমার এলাকা সফর করে এসব কর্মকাণ্ড দেখে আসতে পারেন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে এমন কোনো বক্তব্য আমি দিই না আর এর কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। ডেনমার্কে নবী করীম (স)-এর ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করায় দুনিয়াব্যাপী প্রতিবাদ হয়েছে, ভাঙচুর হয়েছে, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা কোনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দিইনি। আমি বলেছি, আমরা এই জঘন্য ঘটনার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করব; কিন্তু কোনো দূতাবাসে হামলা, পতাকা পোড়ানো বা ভাঙচুর করার মতো কোনো ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে চ্যানেল ফোর-এর এই আয়োজন সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

আমি যতবার ব্রিটেন সফর করেছি এবং যত জায়গায় বক্তব্য রেখেছি, সর্বত্র আমার বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ব্রিটিশ সরকারের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা

www.bjilibrary.com

বলেছি, ট্যাক্স দিতে বলেছি, যুবকদেরকে ড্রাগ এডিক্টেড ও গ্যাং ফাইটার না হয়ে লেখা-পড়ার প্রতি মনোযোগী হতে বলেছি, নিয়মিত ও সঠিক সময়ে স্কুলে যেতে উপদেশ দিয়েছি। আমার বক্তব্যের ক্যাসেট এর সাক্ষী।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকতেই পারে। সে ব্যাপারে নিজস্ব মত ব্যক্ত করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। এর নামই তো গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবীয় অধিকার। যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহক তারা ইসলামের একাধিক বিবাহ, তালাক ও হুদুদের ব্যাপারে নানা ধরনের মন্তব্য করে থাকেন, এসব শুনতে শুনতে আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনো বিষয়ে কথা বলি তাহলে আমাদেরকে উগ্রপন্থি ধর্মান্ধ বলবেন কেন? গণতন্ত্রের অর্থ যদি পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা, মুক্ত চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা হয়, তাহলে আমাকে টারগেট বানানোর মূল হেতুটা কী?

আমরা ইহুদি-খ্রিস্টানদের আহলে কিতাব মনে করি। আমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে মর্যাদা দিই। তাঁর মাতা মারইয়ামকে সম্মান করি। ইনজিলকে আসমানি কিতাব হিসেবে শ্রদ্ধা করি। সুতরাং জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। আমাদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি নিরসন হলে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখালেখি বন্ধ হলে পৃথিবী হবে সত্যিকারার্থে শান্তির ঠিকানা। চ্যানেল ফোর আমার ব্যাপারে যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে তারা আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার বিরুদ্ধে চ্যানেল ফোর-এর ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও আরো কিছু পত্রিকায় প্রচারিত প্রতিবেদন হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতমূলক। তাদের বক্তব্যগুলো একপেশে, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের পাশাপাশি চ্যানেল ফোর-এর আমাকেও কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। এ সুযোগ না দিয়ে আমাকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, সাংবাদিকতার নিয়মবহির্ভূত, একপেশে ও অন্যায় আচরণ। আমি এই অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী আমি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হলে পৃথিবীর অর্ধশত দেশ সফর করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। দেশ-বিদেশে আমি যেখানেই বক্তব্য রাখি, আল্লাহর রহমতে সে জায়গাগুলোতে অনেক মত ও পথের এবং সকল ধর্মের লোকদের সমাগম হয় সর্বাধিক। বিগত ৩০ বছর ধরে আমি গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দাওয়াতে সফর করছি, বক্তব্য রাখছি। এতে করে অসংখ্য নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী আমার বক্তব্যের মাধ্যমে সুন্দর জীবনের সন্ধান পেয়েছে এবং নিজ ধর্ম পালনে অভ্যস্ত হয়েছে। যাদের কাছে মানুষের জীবনাচরণের এই পরিবর্তন অসহনীয়, তাদের কাছে আমি বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

আমার বক্তব্যের মধ্যে উগ্র ধর্মান্ধতা থাকে না, আমার বক্তৃতা শুনতে পুরুষের সাথে অসংখ্য মহিলারাও উপস্থিত থাকেন। কারণ, আমি নারীর অধিকারের কথা বলি, স্বামীদের অধিকার, শিশুদের অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মানবাধিকারের কথা বলি এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলে থাকি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম

www.bjilibrary.com

মহানগরীতে ৫ দিনব্যাপী আয়োজিত বিগত ২৭ বছর ধরে মাহফিল করে আসছি। এতে প্রায় এক মিলিয়ন লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। আমি সেখানে কী বলি যা শুনতে এত লোক পকেটের পয়সা খরচ করে সমবেত হয়, চ্যানেল ফোর জানতে চাইলে আমি সিডি ক্যাসেট সরবরাহ করতে পারি। আমার বক্তব্যের পূর্বাপর বাদ দিয়ে মাঝ থেকে অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন বক্তব্য প্রচার করলে মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে। এর নাম সাংবাদিকতা নয়। আমার ঐসব বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ সিডি টিভিপর্দায় প্রচার করার মতো সৎ সাহস চ্যানেল ফোর কর্তৃপক্ষের আছে কি?

আমেরিকার ২২টি রাজ্যে আমি প্রোগ্রাম করেছি। গ্রেট ব্রিটেনের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য শহর নেই, যেখানে আমি প্রোগ্রাম করিনি। সুতরাং ইসলামবিদ্বেষী লোকদের কাছ থেকে আমার ব্যাপারে ইন্টারভিউ না নিয়ে আমাকে দিয়ে যারা প্রোগ্রাম করেছিল, তাদের নিকট থেকে আমার বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করার জন্য চ্যানেল ফোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই। পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টার উদ্বোধনকালে এলাকার যুবকদের শিক্ষার উন্নতিতে, এন্ডারলি প্রজেক্ট, স্কুল ট্রুয়েন্সি, কর্মসংস্থান প্রকল্প, এন্টি সোস্যাল বিহ্যাভিয়র প্রজেক্ট গ্রহণের ব্যাপারে এলএমসিকে দেওয়া আমার ঐতিহাসিক বক্তব্য কমিউনিটিতে সাড়া জাগিয়েছিল এবং সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছিল।

ইসলামবিদ্বেষী কিছু হিংসুটে লোকদের বক্তব্য অনুযায়ী আমি 'এক্সট্রিম বিতর্কিত' ব্যক্তি হলে আমার জন্মস্থানের ভোটারবৃন্দ আমাকে ভোট দিয়ে দু-দুবার টানা দশ বছরের জন্য নির্বাচিত করে সংসদে পাঠাতেন না। আমি কী ধরনের লোক, তা জানার জন্য আমার দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাতের সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐসব সরকারের আহ্বানে তাদের দেশে সরকার কর্তৃক আয়োজিত বহু সংখ্যক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে আমি বক্তব্য রেখেছি।

সুতরাং চ্যানেল ফোর-এর মতো বিখ্যাত প্রচারমাধ্যমে কারো বিরুদ্ধে বা পক্ষে কিছু প্রচার করতে হলে দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীলদের মন্তব্য নেওয়া উচিত। তা না করে যে কারো মন্তব্য প্রচার অত্যন্ত দুঃখজনক। গণতন্ত্রের লালনাগার নামে খ্যাত গ্রেট ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে কারো বাকস্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা শুধু দুঃখজনকই নয়, অনাকাঙ্ক্ষিতও বটে।"

ইসলামের বিরোধিতার পদ্ধতি সর্বত্র একই

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে যারাই ইসলামের বিরোধী, তাদের কর্মপদ্ধতি একই। ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণাত্মক ভাষা বই-পুস্তকে প্রকাশিত হলেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে তা করা হয় না। তাদের পদ্ধতি হলো ভিন্ন। তারা ইসলামকে মন্দ বলেন না। তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন অভিধায় বিভক্ত করেন। যারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে পালন করে তারাই 'মডারেট ইসলাম'-এর পতাকাবাহী। এরাই তাদের নিকট খাঁটি মুসলিম।

যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও সভ্যতার ধারক হিসেবে প্রচার করেন তাদের ইসলামকে তারা 'পলিটিক্যাল ইসলাম' নামে অভিহিত করেন।

www.bjilibrary.com

যারা জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন করেন তাদের ইসলাম হলো 'মিলিট্যান্ট ইসলাম'। এ জাতীয় মুসলমানদেরকে তারা তাদের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার জন্য প্রধান হুমকি বলে মনে করেন।

আমেরিকার হার্বার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটন তাঁর বহুল প্রচারিত 'Clash of Civilization : The Remaking of World Order' নামক প্রখ্যাত বিরাট গ্রন্থে ইসলামী সভ্যতার উত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মার্কিন প্রশাসনকে পরামর্শ দিয়েছেন। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশের পিতা সিনিয়র বুশ প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই ঐ মহান পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামকে প্রতিহত করা শুরু হয়েছে। তাঁর আমলেই গালফওয়ারকে উপলক্ষ করে ১৯৯০ সালে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য কায়েম করে।

উক্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা করে আমার লেখা বই 'ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আমার ছোট ছেলে ড. সালমান ইংরেজিতে বইটি অনুবাদ করছে। প্রফেসর হান্টিংটন বলেছেন, 'পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামী মৌলবাদ সমস্যা নয়। ইসলামই আসল সমস্যা, যা একটি ভিন্ন সভ্যতা। এর জনগণ তাদের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং ক্ষমতার দিক দিয়ে তারা পেছনে পড়ে আছে বলে আবেগতাড়িতভাবে সচেতন।' এ কথাটি আমি সালমানের লন্ডনস্থ বাসায় বসেই লিখলাম।

মুসলিম উম্মাহর দুশমনদের নিকট কাদিয়ানীরা এত প্রিয় কেন?

এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ইসলামের দুশমনদের নিকট কাদিয়ানীরা এত প্রিয় কেন? চ্যানেল ফোর-এর প্রতিবেদক সরকারের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন যে, কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত যেন MCB-এর সাথে সম্পর্ক না রাখে।

বাংলাদেশে সেক্যুলার ও বামপন্থিরা কাদিয়ানীদেরকে খাঁটি মুসলমান মনে করে এবং তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবির ঘোর বিরোধিতা করে। ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকগণও কাদিয়ানীদের নিষ্ঠাবান পৃষ্ঠপোষক। বিদেশ থেকে বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে সরকারি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে গেলে কাদিয়ানীদের ব্যাপারে খুবই দরদ প্রকাশ করে, যাতে তাদেরকে বিরক্ত করার সাহস কারো না হয়।

বাংলাদেশি মুসলমানগণ কাদিয়ানীবিরোধী নয়

বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং বিভিন্ন অমুসলিম উপজাতির লোক মুসলমানদের প্রতিবেশী হিসেবে অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে বসবাস করছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্ম বিনা বাধায় পালন করে যাচ্ছে। কাদিয়ানীরা তাদের আহমদী ধর্ম পালন করতে মুসলমানরা আপত্তি করবে কেন? মুসলমানদের আপত্তি এখানেই যে, তারা মুসলমান নয়, অথচ বাইরের শক্তির দাপটে মুসলিম বলে দাবি করে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

ভারতীয় এলাকার পূর্ব পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক স্থানের জনৈক গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে তারা নবী বলে বিশ্বাস করে। তাই স্বাভাবিক কারণেই যারা তাদের নবীকে

www.bjilibrary.com

মানতে রাজি নয় তারা তাদের দৃষ্টিতে কাফির। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন তাঁরা কাফিরদেরকে মুসলিম বানানোর চেষ্টা করেছেন। একমাত্র কাদিয়ানী এর ব্যতিক্রম। তিনি মুসলমানদেরকে কাফির ঘোষণা করতে এসেছেন। বিশ্বের সকল মাযহাব ও ফিরকার আলেমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী। এরপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে নবী বলে কেউ বিশ্বাস করলে সে মুসলমান নয়।

বাংলাদেশের মুসলমানদের দাবি শুধু এটুকুই যে, সরকার কাদিয়ানীদেরকে অন্যান্য অমুসলিম সংখ্যালঘুর মতো অমুসলিম ঘোষণা করুক। গোলাম আহমদের উম্মত হিসেবে তারা নিজেদেরকে আহমদী বলে থাকে। তারা তাদের আহমদী ধর্ম পালন করুক; মুসলিম পরিভাষা পরিত্যাগ করুক; মসজিদ, আযান, নামায ইত্যাদি পরিভাষা বর্জন করুক। মুসলমানদের থেকে পৃথক ধর্ম পালনকারী হিসেবে কাদিয়ানী বা আহমদী হিসেবে তারা নিজেদের পরিচয় দিক; মুসলমান পরিচয় দিয়ে প্রতারণা না করুক।

মুসলমানদের সর্বসম্মত এ দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে কেন ভয় পায়? ইউরোপ ও আমেরিকার ভয়? এ বিষয়ে তাদের রায় দেওয়ার অধিকার কেন মেনে নিতে হবে? মুসলিম উম্মাহ্ কাকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করবে, তা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এ ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে নাক গলানোর অধিকার কে দিল?

কাদিয়ানী নামেই তারা পরিচিত। ইউরোপ ও আমেরিকা যখন তাদের পক্ষে কথা বলে তখনো 'কাদিয়ানী' শব্দই ব্যবহার করে। মুসলিম উম্মাহ থেকে তো তারা আলাদা নামেই পরিচিত। তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করতে বাইরে থেকে কেন চাপ দেওয়া হচ্ছে? বাংলাদেশ সরকারই বা কেন এ চাপকে ভয় পায়?

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন চলাকালে তথাকথিত কাদিয়ানী নবীর আবির্ভাব হয়। মুসলমানরা যখন ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম করছে তখন কাদিয়ানী নবী ইংরেজ শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে ইংরেজরাই তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। সুতরাং এ নবী ইংরেজদেরই সৃষ্ট। এ কারণেই ইংরেজদের সহযোগী সকল অমুসলিম শক্তি কাদিয়ানী নবীকে মেনে নিতে বাধ্য করতে চায়।

বাংলাদেশ সরকার যদি কাদিয়ানীদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে, তাহলে কাদিয়ানীবিরোধী সকল বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে যাবে। সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানদের মতো নিরাপত্তা ভোগ করবে। কেউ তাদের আস্তানায় হানা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করবে না। সরকার তাদের প্রকাশিত পুস্তাকাদি বে-আইনি ঘোষণা করায় যেমন কোনো সমস্যা হয়নি, তেমনি তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করলেও কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে না। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যায় চাপের মুখে সরকার কেন নতিস্বীকার করছে, সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। এ অযৌক্তিক দুর্বলতা ত্যাগ করে সরকার এ ঘোষণা দিলে কাদিয়ানী সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে। সরকার কি মুসলিম জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে অমুসলিমদেরকে সন্তুষ্ট করতে চায়?

www.bjilibrary.com

২৭৭.

চ্যানেল ফোর ও ব্রিটেনের বাংলা পত্রিকা

ব্রিটেনে সাতটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা আছে। এর মধ্যে একটি সুস্পষ্টরূপে আওয়ামীপন্থি, একটি ইসলামী আন্দোলনবিরোধী হলেও দলনিরপেক্ষ। একটি মাত্র পত্রিকা ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে। এর নাম ইউরো-বাংলা। ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ তো ইউরোপের সকল দেশেই আছে। তাই এ পত্রিকা সারা ইউরোপেই চলে। এটাকে ইউরোপে ইসলামী আন্দোলনের মুখপত্র বলা যায়। উপরিউক্ত ৩টি পত্রিকাই বাংলাদেশিদের মধ্যে জনপ্রিয়।

চ্যানেল ফোর-এর উক্ত ডকুমেন্টারি ফিল্ম যে উদ্দেশ্যে প্রচারিত সে উদ্দেশ্যেই উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে দুটোতে তা প্রকাশ করা হয়েছে। একমাত্র ইউরো-বাংলায় ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ঐ পত্রিকার রিপোর্ট থেকে বেশ কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : রিপোর্টটির প্রধান শিরোনাম হলো, 'ব্রিটেনে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র'। দ্বিতীয় শিরোনাম 'ইসলাম বিদ্বেষী মহলের সিন্ডিকেট মিডিয়া আগ্রাসন'। সাবহেডিং হিসেবে কয়েকটি কথার মধ্যে প্রধান হলো 'কে এই মার্টিন ব্রাইট'– যিনি এর আগে তার প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে সন্দেহপোষণকারী বিভিন্ন লেখকের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করেন, কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান ঘোষণা না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের এমসিবি-র সাথে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত নয়।

এখানে এরপর যা লিখছি, এর সবটুকুই ইউরো-বাংলার উদ্ধৃতি। এতে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

"মোজ্জাম্মেল হোসেইন : ব্রিটেনের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাকারী বৃহত্তম সংগঠন মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন (এমসিবি)-এর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে চরমপন্থি প্রচারণা। ইসলামবিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত একটি গ্রুপ অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মুসলিম কমিউনিটিকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। কতিপয় অখ্যাত ব্যক্তিকে মুসলমানদের প্রতিনিধি সাজিয়ে ব্রিটেনের বৃহত্তম চার শ'রও অধিক মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী এমসিবিকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরই অংশ ছিল চ্যানেল ফোরে গত শুক্রবারের মার্টিন ব্রাইট-এর তৈরি ডকুমেন্টারি Who speaks for British Muslim. ডকুমেন্টারিতে বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইউসুফ আল কারযাভী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ভিসা প্রদান করায় সমালোচনা করা হয়েছে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

কেন এমসিবি এদের টার্গেট

ইরাকে যুদ্ধবিরোধী জনমত গঠনের মধ্যদিয়ে এমসিবি মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলের প্রতিনিয়ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ

www.bjilibrary.com

মানুষকে সচেতন করে তুলতে এমসিবি প্রায়শ মিডিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে। জাতীয় রাজনীতিতে এর নিরপেক্ষতার কারণে অমুসলমানদের নিকট বেড়ে চলেছে এর গ্রহণযোগ্যতা। ২০০ সদস্য সংগঠন নিয়ে যাত্রা শুরু করা এমসিবির সদস্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০-এ। জাতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা, যুবউন্নয়ন, পরিবার গঠন– এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও সমন্বয় সাধন করে যাচ্ছে এ ছাতা সংগঠনটি। কিন্তু মুসলমানদের এ উন্নয়ন একশ্রেণির সাম্প্রদায়িক শক্তি সহ্য করতে পারেনি। এমসিবি তার স্বাভাবিক গতিতে কাজ করতে থাকলে ব্রিটেনে মুসলমানরা একটি প্রভাবশালী কমিউনিটি হিসেবে অদূরভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে যাবে তা জায়োনিস্ট লবির জন্য অসহনীয়। ৭/৭-এর ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার একের পর এক সন্ত্রাস দমন আইন করে মুসলিম যুবকদের দৈনন্দিন কার্যক্রম অসহনীয় করে তোলেন। স্টপ এন্ড সার্চ, বিনা বিচারে ডিটেনশন চলছে অনবরত। এর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয় এমসিবি। সরকারকে সন্ত্রাস দমনের নামে সাধারণ মুসলমানদেরকে হয়রানি বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ আগে ফরেস্ট গেইটে একজন বাংলাদেশি মুসলমানকে টেরোরিস্ট গ্রেফতারের নামে গুলি করা হয়েছে। এমসিবির নতুন সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং সরকারের নিকট এ ধরনের হয়রানি বন্ধের জন্য জোর আবেদন জানিয়েছেন। এমসিবির চাপের মুখে দায়িত্বরত পুলিশ কমিশনার মুসলমানদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর এতে গা জ্বালা দিয়ে উঠে মুসলিমবিদ্বেষী টোরি এমপি, শ্যাডো মিনিস্টার মাইকেল গোব-এর। তিনি টাইমসে To allow Islamists to direct the post 7/7 debate was a disaster শিরোনামে এমসিবির মতামত অগ্রাহ্য করে পুলিশি অভিযানকাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান সরকারের প্রতি। স্টপ ও সার্চ-এর মাধ্যমে মুসলমানদের উপর হয়রানি চালানোর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করুক মাইকেল গোব তা ভালোভাবে দেখেন না। একজন নির্দোষ মুসলিম যুবক পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হওয়ার পর মুসলমানরা তার প্রতিবাদ করুক এটি মাইকেল গোব-এর পছন্দনীয় নয়। এ দেশে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী মুখপাত্র থাকা তার মতে Disaster. আর এ মাইকেল গোবকেই নিয়ে আসা হয় চ্যানেল ফোর-এর ডকুমেন্টারিতে। এতে একটি তথাকথিত সুফি কাউন্সিলের নেতাকে ব্রিটেনের অধিকাংশ মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ লোকটি গত সপ্তাহে রেডিও ফোর-এর ডকুমেন্টারিতে একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, তার সংগঠনটি বেশ কিছু অমুসলিম প্রতিষ্ঠান দ্বারা সমর্থিত। এর মধ্যে রয়েছে The Board of Deputies of British Jews. এখন পাঠকরাই বুঝবেন তিনি মুসলমানদের কেমন প্রতিনিধি। এ ডকুমেন্টারি ইতিহাসের একটি ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের সময় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতিনিধি বানায় গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানীর পিতাকে, যিনি ঐ সময় ব্রিটিশ উপনিবেশের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। মি. কাদিয়ানী তার বাবার এ ভূমিকাকে অত্যন্ত গৌরবভরে স্মরণ করতেন। আমাদের কমিউনিটিতে এ ধরনের প্রতিনিধি বানাতে পারলে জায়োনিস্ট আদর্শ বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

www.bjilibrary.com

গত বছরের ডকুমেন্টারি

চ্যানেল ফোর-এ প্রদর্শিত ডকুমেন্টারিটি প্রথম নয়। গত বছর ২১ আগস্ট বিবিসিতে জন ওয়ার-এর তৈরি যে প্যানারোমাটি প্রদর্শিত হয়েছে তাও ছিল চরম মুসলিমবিদ্বেষী একটি অনুষ্ঠান। এ প্রোগ্রামে এমসিবির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও একপেশে প্রচারণা চালানো হয়েছে— যা শুধু মুসলমানদের নয়, অমুসলমানদেরকেও আহত করেছে। ২২ আগস্ট ২০০৫ গার্ডিয়ানে ম্যাডেলিন বান্টিং 'মুসলমানদের উপর কাদা নিক্ষেপ' শিরোনামে একটি লেখায় এ ধরনের মুসলিমবিদ্বেষী প্রপাগান্ডার নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেছেন, A campaign is being orchestrated through the media to destroy the credibility of many of the most important Muslim institution in Britain, including the Muslim Council of Britain (MCB).

কে এই মার্টিন ব্রাইট?

মার্টিন ব্রাইটের The Great Koran Con Trick যারা পড়েছেন তারা জানেন তার ঔদ্ধত্যের কথা। তিনি তার প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে সন্দেহপোষণকারী বিভিন্ন লেখকদের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। John Wansbrough, Michael Cook, Patricia Crone, Andrew Rippin and Gerald Hawting-এর গবেষণা নিয়ে ছিল তার এ কাভার স্টোরি। এরা কুরআন-হাদীসের বিশুদ্ধতা ও হাজার বছরের ইসলামের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে নতুন করে ইসলামের ইতিহাস লিখেছেন। এদের বিকৃত গবেষণা হচ্ছে, কুরআন রাসূল (স)-এর সময় লেখা হয়নি। প্রবন্ধে Professor John Wansbrough-এর গবেষণার উদ্বৃতি দিয়ে বলা হয়, They concluded, tentatively, that in the form that survives, the Koran was compiled, if not written, decades after the time of Mohammad, probably by converts to Islam in the Middle East, who introduced elements from the religions previously dominant in the region.

তিনি তাদের রেফারেন্স দিয়ে আরো বলেন, They found that Islam, as represented by admittedly biased sources, was in essence a tribal conspiracy against the Byzantine and Persian empires with deep roots in Judaism.

তার সম্প্রতি প্রকাশিত বুকলেটে সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়েছে, কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান ঘোষণা না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের এমসিবির সাথে কোনো যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত নয়। এ ধরনের এক ইসলামবিদ্বেষী লেখকের পক্ষ থেকে মুসলিম কমিউনিটির ব্যাপারে নিরপেক্ষ রিপোর্ট আশা করা অনুচিত। প্রতিটি সাধারণ মুসলমান ভালো করেই বোঝেন যে, রাসূল (স)-কে শেষ নবী মানা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর পৃথিবীর সকল ইসলামী চিন্তাবিদ ও শায়খ একটি বিষয়ে একমত যে, কাদীয়ানীরা মুসলিম নয়। অথচ মি. ব্রাইট কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান ঘোষণা করে তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিনিধি বানাতে চান। কিন্তু এমসিবি সর্বসম্মত মতামতের

www.bjilibrary.com

ভিত্তিতে কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে করে না। আর এ জন্যই তিনি ও তার সহযোগীরা এমসিবির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছেন।

মুরাদ কোরেশী ও তার সংশ্লিষ্টতা

যারা কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান করার দাবি তুলেছে, কাদিয়ানী পুস্তকাদি বাংলাদেশে ব্যাপক বিলির জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করছে তাদের দলে এবার যোগ দিয়েছেন লন্ডন এ্যাসেম্বলি মেম্বার মি. মুরাদ কোরেশী। তিনি এ মাসে বাংলাদেশ সরকারবিরোধী প্রচারণায় নেতৃত্ব দানকারী 'দৃষ্টিপাত'-এর লন্ডন শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেছেন। কতিপয়ের উৎসাহ ও সমর্থন নিয়ে নিউইয়র্কভিত্তিক এ সংগঠনটি লন্ডনে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছে। দৃষ্টিপাতের প্রথম এসাইনমেন্ট ছিল মাওলানা সাঈদী। চ্যানেল ফোর-এর মতো নামকরা টিভিতে Who speaks for British Muslim নামে যে অনুষ্ঠানের প্রচারণা করা হয়েছে তাতে মাওলানা সাঈদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য মি. ব্রাইটকে বাংলাদেশ সফরে যেতে হয়নি। দৃষ্টিপাত নামক মুসলিমবিদ্বেষী সংগঠনটি ছিল খবরদাতা। দৃষ্টিপাত-এর ওয়েবসাইটে মাওলানা সাঈদী সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তা থেকে কোনো দাঁড়ি-কমা বাদ না দিয়েই রিপোর্ট করেছেন মার্টিন ব্রাইট। এমনকি গত শনিবারের সান পত্রিকায় বাংলাদেশ হাইকমিশনারের উপর বোমা হামলার জন্য মাওলানা সাঈদীকে দায়ী করা হয়েছে। সান কোথায় পেল এ সংবাদ? দৃষ্টিপাত দেখুন। 'মাওলানা সাঈদীর উৎসাহে বোমা হামলা করা হয়েছে'– এ দাবি বাংলাদেশের কোনো সাংবাদিক, পুলিশ বা ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নয়।"

উক্ত ডকুমেন্টারি সম্পর্কে ইউরো-বাংলায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করার পর আরো কিছু তথ্য দিচ্ছি। ডকুমেন্টারিতে যাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তাদের পরিচয় নিম্নরূপ :

১. মাইকেল গ্রোভ : তিনি কনজারভেটিভ পার্টির এমপি। তিনি ইহুদীবাদী জায়নিস্ট এবং চরম মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

২. চেইটন ভাট : তিনি গোল্ডস্মিথ কলেজের একজন হিন্দু লেকচারার।

৩. মুরাদ কোরেশী : তার পিতা মুশতাক কোরেশী ব্রিটেনে আওয়ামী লীগনেতা।

এমসিবির বিবৃতি

চ্যানেল ফোর কর্তৃক প্রচারিত ডকুমেন্টারির প্রতিবাদে এমসিবি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছে :

"ডিভাইড এন্ড রোলের উদ্দেশ্যে চ্যানেল ফোর-এ এই ডকুমেন্টারি দেখানো হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে বিভক্ত করা নিয়ে প্রচারিত নানা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে এটা দেখানো হয়েছে। আমরা দেখেছি, অতীতের এ জাতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং আমরা আশা করি এবারেরটিও ব্যর্থ হবে।

www.bjilibrary.com

চ্যানেল ফোর-এ প্রচারিত ডকুমেন্টারির প্রেজেন্টার মার্টিন ব্রাইট ইসলামবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ব্রিটিশ মুসলমানদের কাছে চিহ্নিত হয়ে আছেন। ব্রাইটের এবারের ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন মুসলিম লিডারশিপ আরোপ করা, যারা প্রো-ইসরাইলি। কিন্তু তাদের কথা বলার বৈধ অধিকার নেই। মার্টিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে, মুসলিম দুনিয়ার জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক ইসলামিক গ্রুপের সাথে ব্রিটিশ সরকারের কথা বলা ভুল। আমরা এ ধরনের কল্পনায় বাধাগ্রস্ত হয়েছি। আমাদের মুসলিম দুনিয়ার সাথে শান্তিপূর্ণ সুসম্পর্ক রাখা উচিত। কোনোক্রমেই সম্পর্কচ্ছেদ করা ঠিক নয়। এমসিবির লিডার ড. আবদুল বারী ব্রিটিশ মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে তথাকথিত 'সুফি মুসলিম কাউন্সিল'কে দাবি করায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারা মিডিয়ায় আরো বলেছেন, তাদেরকে বোর্ড অব ডেপুটিজ অব ব্রিটিশ জিউজ-এর মতো অন্যান্য নন-মুসলিম সংগঠনও সমর্থন করেছে। মার্টিন ব্রাইট ইসলামবিদ্বেষী আরো কমেন্টেটর যেমন– নিক কোহেন, মাইকেল গ্রোভ, জন ওয়ের এবং মেলানি ফিলিপস্ এর অন্তর্ভুক্ত যারা বিগত ৭/৭-এর নৃশংসতার পর চেয়েছিল মুসলিমবিরোধী প্রচারণায় সুযোগ নিতে।

এই সাম্প্রতিক আক্রমণাত্মক প্রচারণায় আমরা ভীত হবো না, যেমন হইনি গত বছরের জন ওয়ারের প্যানারোমা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আমরা জাস্টিস এবং নিরপেক্ষ ট্রিটমেন্টের জন্য আমাদের ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাব। এটা আমাদের একটি ইসলামিক বাধ্যবাধকতা এবং নাগিরক কর্তব্য যে, আমরা এ দেশের সকল মানুষ মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ কামনা করি।"

ইস্ট লন্ডন মসজিদের বিবৃতি

এমসিবির সেক্রেটারি জেনারেল ড. আবদুল বারী ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান। মাওলানা সাঈদী প্রতি বছরই এ মসজিদে অনুষ্ঠিত মাহফিলে বক্তব্য রাখেন। তাই চ্যানেল ফোর-এর ডকুমেন্টারির প্রতিবাদে মসজিদের পক্ষ থেকেও নিম্নরূপ বক্তব্য দেওয়া হয় :

"মুসলমানদের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে একের পর এক মিডিয়ার আক্রমণ অত্যন্ত দুঃখজনক। চ্যানেল ফোরে প্রচারিত মার্টিন ব্রাইটের ডকুমেন্টারি ছিল মিডিয়ার ধারাবাহিক আক্রমণের একটি উদাহরণ।

মার্টিন ব্রাইট তার ডকুমেন্টারিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য ও খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ব্রিটেন সফরের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অথচ গত ৩০ বছর ধরে তিনি নিয়মিত ব্রিটেন সফর করছেন এবং এখানকার কমিউনিটির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইস্ট লন্ডন মসজিদ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট যে, ফরেন অফিস তাকে ব্রিটেন সফরের ভিসা দিয়েছে, যদিও মসজিদ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো অনুরোধ জানায়নি। ইস্ট লন্ডনে মুসলিম-অমুসলিম সকল ধরনের বক্তারা আসেন এবং তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়। তবে উত্তেজনা বা ঘৃণা সৃষ্টিকারী কোনো বক্তব্য কখনো মসজিদ থেকে দেওয়া হয়নি। মসজিদে গঠনমূলক মূল্যবোধের চর্চা করা হয়, যা ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গঠনে আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

www.bjilibrary.com

মার্টিন ব্রাইট তার ডকুমেন্টারিতে মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনকে অবমূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। তবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ এমসিবির সদস্য হিসেবে অধিভুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত। এটি আমাদের জন্য আনন্দদায়ক যে, ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আবদুল বারী এমসিবির সেক্রেটারি জেনারেল। যদিও এমসিবি ব্রিটেনের সকল মুসলমানের মুখপাত্র দাবি করে না; কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শ গ্রহণের মধ্যদিয়ে এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এমসিবি মুসলমানদের বহুলাংশের সমর্থিত একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেক্রেটারি আইয়ুব খান বলেন, এমসিবিকে চরমপন্থিদের সাথে চিহ্নিত করে প্রদর্শিত এ ডকুমেন্টারি অত্যন্ত দায়িত্বহীন ও ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা। যারা এমসিবির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলে, তারা মূলত আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও কমিউনিটির ঐক্যকে বিনষ্ট করতে চায় এবং এভাবে বর্ণবাদ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে চায়। তিনি ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ চ্যানেল ফোর-এর বিকৃত ডকুমেন্টারি দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান।

ইসলাম এক্সপো

ইতঃপূর্বে ২৭৫ নং কিস্তিতে লিখিত কিস্তিতে 'ইসলাম এক্সপো' সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে লিখেছি। সাপ্তাহিক ইউরো-বাংলার পরবর্তী সংখ্যায় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা পড়ে সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজনবোধ করছি। এর লেখক বাংলাদেশেও কলামিস্ট হিসেবে সুপরিচিত। দৈনিক সংগ্রাম, ইনকিলাব ও দিনকালে তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি পেশায় ডাক্তার। নাম ড. ফিরোজ মাহবুব কামাল। তিনি কুষ্টিয়ার প্রখ্যাত আইনজীবী এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদের জামাতা; তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়।

৬ থেকে ৯ জুলাই (২০০৬) চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত 'ইসলাম এক্সপো'তে তিনি চার দিনই উপস্থিত হয়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। তাঁর লেখা থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করতে চাই।

এক্সপো (Expo) শব্দটি ডিকশনারিতে নেই। মনে হয় Exposition শব্দটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে চালু করা হয়েছে। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে Exposition অর্থ লেখা হয়েছে **'A large exhibition, a full account and explanation of a theory'** অর্থাৎ, বিশাল প্রদর্শনী, কোনো মতবাদের পূর্ণ পরিচয় ও ব্যাখ্যা। এখন ড. ফিরোজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

প্রবন্ধটির হেডিং 'বিলেতের মুসলিম ইতিহাসে অবিস্মরণীয় আয়োজন'।

অনুষ্ঠানস্থল

গত ৬ জুলাই থেকে ৯ জুলাই লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো চার দিনব্যাপী ইসলাম এক্সপো। যেকোনো বিচারে বিলেতে মুসলিম ইতিহাসে এটি অনন্য। আয়োজনটি হয়েছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা উত্তর লন্ডনের পাহাড়ি টিলা মুযওয়েল হিলের উপর অবস্থিত বিখ্যাত আলেকজান্ডার প্যালেসে। প্যালেসের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল গাছপালায়

www.bjilibrary.com

ঢাকা পড়ে আছে বিশাল লন্ডন শহরটি। ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি মারছে কিছু স্কাইস্ক্রাপার। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল বিবিসির প্রথম টিভি সম্প্রচার। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সাথে এখানে সংমিশ্রণ ঘটেছিল ব্রিটিশ আভিজাত্য ও বর্ণাঢ্য ইসলামী সভ্যতার। ভেতরের ডিজাইনটি ছিল চমৎকার। শোভা পাচ্ছিল অসংখ্য মিনার, ক্যালিগ্রাফি, গম্বুজ ও তোরণ। বৃহদাকারের বহু রঙিন পর্দায় ধ্বনিত হচ্ছিল ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের ধারা বিবরণী। গার্ডিয়ানের কলামিস্ট লিখেছেন, 'দেখে মনে হচ্ছিল এ যেন উত্তর লন্ডন নয়, যেন উত্তর দামেস্ক। আলেকজান্ডার প্যালেস মসজিদ নয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল মসজিদ।' অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লন্ডনের মেয়র ক্যান লিভিংস্টোন (Livingstone)।

ইসলাম এক্সপোর মূল লক্ষ্য

এর মূল লক্ষ্য ছিল ডায়ালগ ও আন্ডারস্টান্ডিং। মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন নিয়ে মতবিনিময় ও বোঝাপড়া। গড়া হয়েছিল অসংখ্য স্টল। বসেছিল বইয়ের মেলা। ইসলামী ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থা নেমেছিল তাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে। ইরান, সিরিয়া, কাতার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় অনেক মুসলিম দেশই এখানে স্টল লাগিয়েছিল তাদের নিজ দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস তুলে ধরতে; কিন্তু নজরে পড়েনি বাংলাদেশের কোনো স্টল। নানা ভাষাভাষী ও নানা বর্ণের হাজার হাজার মানুষের মেলা জমেছিল এ অনুষ্ঠানে। অনেকে এসেছিল ইউরোপের মূল ভূমি থেকে। বিশাল ভিড় লেগেছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। তারা এসেছিল স্কুলের পক্ষ থেকে।

অনুষ্ঠানের সেমিনার

অনুষ্ঠানের বড় আকর্ষণ ছিল সেমিনার। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত এগুলো। একই সময় বিভিন্ন হলে আলোচনা হতো বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে। কোনো বিষয় ভালো না লাগলে অন্য আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ ছিল। বিষয়গুলোও ছিল অতিপ্রাসঙ্গিক। বিলেতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপ থেকে আগত বেশ কিছু একাডেমিক, কলামিস্ট, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। অতিপরিচিত একাডেমিকদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর জন এসপজিটো, প্রফেসর তারিক রামাদান, প্রফেসর জামাল বাদাভি, প্রফেসর আব্দুল ওহাব আলমিসরি, ডক্টর আয্যাম তামিমী, আনাস তাকরিতি, জন রিস প্রমুখ। এসেছিলেন আলোড়ন সৃষ্টিকারী তুরস্কের সাবেক মহিলা এমপি মার্ভে কাবাকচি, যাকে নিছক পর্দা করার অজুহাতে সে দেশের সেক্যুলার সরকার পার্লামেন্টে ঢুকতে দেয়নি। এখন তিনি এক মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সফটওয়্যারের অধ্যাপক। সাংবাদিক ও কলামিস্টদের মধ্যে ছিলেন বিবিসির সিকিউরিটি বিষয়ক প্রধান সংবাদদাতা ফ্রাংক গার্ডনার, আল জাজিরার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওয়াদাহ খানফার, দৈনিক আল কুদস আল আরাবিয়ার সম্পাদক আব্দুল বারী আতওয়ান, গার্ডিয়ানের কলামিস্ট জনাথান ফ্রিডল্যান্ড, ব্রিটিশ সাংবাদিক ও নওমুসলিম ইভন রিড্‌লে এবং আল জাজিরার সাংবাদিক খাদিজা বিংগানা। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য থেকে এসেছিলেন লন্ডনের মেয়র ক্যান

www.bjilibrary.com

লিভিংস্টোন, রেসপেক্ট পার্টির জর্জ গ্যালওয়ে এমপি, লেবার পার্টির জেরিমি করবিন এমপি, স্টপ দি ওয়ার কোয়ালিশনের কো-চেয়ারম্যান এন্ড্রো মারে এবং লিন্ডসে জারমান। এসেছিলেন বেশ কয়েকজন অর্থডক্স ইহুদী রাব্বাই। জনৈক ইহুদী রাব্বাই তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন যে, ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাই ইহুদী ধর্মমতের বিরোধী। ফিলিস্তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনের প্রতীকরূপে তারা বুকে ঝুলিয়েছেন ফিলিস্তিনের পতাকা। তারা নিজেরাও যে জায়োনিস্ট ইসরাইলিদের সন্ত্রাসের শিকার, সে অভিযোগও করলেন।

সেমিনারে আলোচিত বিষয়গুলো ছিল কুরআনে জিহাদের নির্দেশ ও তার প্রেক্ষাপট, ইহুদী আগ্রাসন এবং ফিলিস্তিনের মুক্তিযুদ্ধ, সন্ত্রাস ও ইসলাম, ইরাক দখলের তিন বছর, পাশ্চাত্যে মুসলিম আতঙ্ক, বিলেতের রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণ, ইউরোপে হিজাব (পর্দা) সংকট, বামপন্থিদের সাথে মুসলিম কোয়ালিশন, পাশ্চাত্য মিডিয়ায় ইসলাম প্রসঙ্গ, নওমুসলিমদের সমস্যা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। প্রায় প্রতিটি আলোচনাই ছিল জমজমাট। আলোচকদের সাথে ফ্লোর থেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন শ্রোতাগণও। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিল অল্পবয়সী নারী-পুরুষ, যাদের বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বা প্রফেশনাল। প্রায় অর্ধেকই ছিল মহিলা। অতিশয় বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ছিল হাস্যরসের আয়োজন। সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন দুজন কমিডিয়ান। ছিল তুর্কি রীতিতে ঘূর্ণায়মান সুফীদের যিকর, যা প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটিয়েছিল। ছিল নলেজ জোন, সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল খণ্ডনাট্য। প্রচুর দর্শক পেয়েছে সেগুলোও। ইরান ও আরব দেশ থেকে আগত শিল্পীগণ ক্যালিগ্রাফির সবক দিচ্ছিলেন। কেউ কেউ তাদের দিয়ে আরবী অক্ষরে নিজেদের নামও লিখিয়ে নিচ্ছিল।

বিলেতে মুসলিমদের অবস্থা

বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দাড়ি ও পর্দাধারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা এখন অনেক। চলছে নানারূপ হালাকা, স্টাডি সার্কেল ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ইসলামিক সোসাইটি। নানা ভাষা ও বর্ণের ছাত্রছাত্রীরা এখানে একত্রে কাজ করে। অধিকাংশ ক্যাম্পাসে, অফিসে ও হাসপাতালে নামাযের জামায়াত হয়। জুমুআর নামাযও হয়। ইসলামের প্রতি নতুন প্রজন্মের এই যে অঙ্গীকার সেটির প্রতিফলন ঘটেছে ইসলাম এক্সপোতেও। নানা দেশের হয়েও তারা প্রমাণ রেখেছে এক অভিন্ন প্যান-ইসলামিক চেতনার। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কাজ করছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, আফ্রিকা ও আরব দেশ থেকে আগত শত শত মুসলিম নারী-পুরুষ। এদের অধিকাংশই বেড়ে উঠেছে বিলেতে। বিলেতের মুসলিম ইতিহাসে এজন্যই এটি এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

বিলেতে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ হলো পাকিস্তানি, ১৭ ভাগ বাংলাদেশি, ৯ ভাগ ভারতীয়, ৮ ভাগ আফ্রিকান, ৪ ভাগ শ্বেতাঙ্গ এবং বাকি ২১ ভাগ হলো তুর্কি, কুর্দি, আরব, সোমালিয়ান ও অন্যান্য। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত থেকে যেসব মুসলমান এদেশে এসেছে তাদের অধিকাংশই এসেছে

www.bjilibrary.com

রোজগারের তালাশে। তাদের অধিকাংশই ব্যস্ত ক্ষুদ্র চাকরি-বাকরি, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বা দোকানদারি নিয়ে। বুদ্ধিবৃত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড চোখে পড়ার মতো নয়।

আরবদের অবস্থা ভিন্ন

আরব দেশ থেকে যারা এসেছে তাদের অনেকে এসেছে মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির সুযোগ না পেয়ে। তারা এসেছে ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, লিবিয়া, সিরিয়া ও মিসরের স্বৈরাচারকবলিত দেশ থেকে। দেশত্যাগ ছাড়া স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার সুযোগই তাদের ছিল না। ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত যতজন পিএইচডিধারী ব্যক্তির বাস ইউরোপ-আমেরিকায়, শিল্প-বিপ্লবের শুরুতে জাপানে তা ছিল না। অনেকে শিক্ষকতা করছেন এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এরা যেমন পত্রিকা বের করছেন, তেমনি বই লিখছেন এবং বহু গবেষণাপ্রতিষ্ঠানও গড়েছেন। বিলেতে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব এখন তাদেরই হাতে। তাদের বিপুল অংশ সাইয়েদ কুতুবের লেখনী দ্বারা অনুপ্রাণিত। তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন অন্যভাষী মুসলমানদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানের বিকাশেও। ব্রিটিশ বামপন্থি বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট ও রাজনীতিবিদদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতেও তারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। এখানে বসে তারা আল জাজিরা, আল আরাবিয়া ও আল আলামের ন্যায় টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে আন্দোলিত করছেন মধ্যপ্রাচ্যকেও। বামপন্থিদের সাথে মিলে এরাই ইরাকের উপর হামলা রোধে ২০ লাখ মানুষের যুদ্ধবিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বলা যায়, এদের কারণেই বিলেতে মুসলমানদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির হাওয়া দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

বিলেতে মুসলমানদের রাজনৈতিক কৌশল

বিলেতে মুসলমানদের রাজনৈতিক কৌশল কী হবে, সেটি ছিল আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিত্র হিসেবেই বা কাদের গ্রহণ করবে, এগুলো ছিল অতি বিতর্কিত বিষয়। অমুসলিমদের সাথে যেকোনো রাজনৈতিক সমঝোতাকে অনেকেই হারাম মনে করে। হারাম মনে করে গণতন্ত্র ও ভোটদানকেও। নাস্তিক-বামপন্থিদের সাথে সম্পর্কের কথা অনেকে ভাবতেই পারে না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন ড. আয্যাম তামিমী এবং জনাব আনাস তাকরিতি। তাদের বক্তব্য ছিল, যারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে না এবং তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বেরও করে দেয় না তাদের সাথে সমঝোতা করায় পবিত্র কুরআনে কোনো বাধা নেই। তাদের আরো যুক্তি ছিল, বিলেতে যেহেতু মুসলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য, তাই নিজেদের স্বার্থেই অন্যদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু খুঁজতেই হবে। নইলে তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ থাকবে না। বামপন্থিরা যে এ দেশে মুসলমানদের ভালো বন্ধু হতে পারে, সে যুক্তি তারা তুলে ধরেন। ইরাকে হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিছিলটি যে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিকে তারা এ স্ট্র্যাটেজির সফলতা হিসেবে পেশ করেন। বামপন্থিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন স্টপ দি ওয়ার কোয়ালিশনের চেয়ারম্যান অ্যান্ড্রু মারে, লেবার পার্টির এমপি জেরিমি করবিন এবং লন্ডন মেয়রের জনৈক উচ্চপদস্থ সহকারী। তাদের কথা.

www.bjilibrary.com

আমাদের ও মুসলমানদের শত্রু অভিন্ন। তা হলো, নব্য উপনিবেশবাদ, যুদ্ধ, জবরদখল এবং ইসলাম আতঙ্ক। ইসলাম আতঙ্ককে তারা চিত্রিত করেন কট্টর বর্ণবাদরূপে। এ অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলমানদের সাথে বামপন্থিদের কোয়ালিশন গড়তেই হবে। বিজেপিকে রুখতে ভারতীয় মুসলমানগণ যেমন পশ্চিম বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও কেরালায় বামপন্থিদের সাথে কোয়ালিশন গড়েছে সে কৌশলটি এখানেও গুরুত্ব পাচ্ছে। বামপন্থিদের আরো যুক্তি হলো, লন্ডনের শতকরা ১০ ভাগ মানুষই মুসলমান। এ লড়াইয়ে মুসলমানদেরকে সাথে না নিলে লাভবান হবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দুর্বল হবে ন্যায়ের লড়াই।

ফিলিস্তিনের ওপর সেমিনার

দীর্ঘ সেমিনার ছিল ফিলিস্তিনের ওপর। এখানে মূল উপস্থাপক ছিলেন ড. আয্যাম তামিমী। তিনি নিজেও একজন ফিলিস্তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, ইহুদীদের সমস্যাটি ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সমস্যা। সেটিকে তারা পরিকল্পিতভাবে স্থানান্তরিত করেছে মধ্যপ্রাচ্যে। যারা বসনিয়ার মতো একটি ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে ইউরোপের একপ্রান্তে মেনে নিতে রাজি নয় তারা মুসলিম ভূমির মধ্যখানে বসিয়েছে একটি ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীকে। এর লক্ষ্য দুটি– এক. ইহুদীদের থেকে ইউরোপের মুক্তি; দুই. ইসরাইলের মারফতে আরব বিশ্বের উপর আধিপত্য। লক্ষ্য, সম্পদ লুণ্ঠন। ইহুদী অধ্যাপক জন রিস বলেন, 'ইংরেজ রাজনীতিক মি. বালফোর, যিনি ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি ইহুদীদের বন্ধু ছিলেন না। ইহুদীদের বিপদের দিনে তিনিই বিলেতে ইহুদীদের প্রবেশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তিনি বিভক্ত ইহুদী পরিবারের আপনজনদেরও বিলেতে প্রবেশের অনুমতি দেননি। ইসরাইল গড়া হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখতে।' ইসরাইলের স্বীকৃতির প্রশ্নে জনাব তামিমি বলেন, 'এটি হবে একজন ধর্ষিতা নারীর মুখ থেকে ধর্ষণকে ন্যায্য বলে স্বীকৃতি আদায় করা। তা কখনোই হতে পারে না।' তিনি আরো বলেন, 'অধিকৃত ফিলিস্তিনের বিষয়টি নিছক ফিলিস্তিনিদের একার নয়। এটি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর। এখানে রয়েছে মসজিদে আকসা, যা ছিল মুসলমানদের প্রথম কিবলা। এখান থেকেই প্রিয় নবী (স) মি'রাজে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কা থেকেও মিরাজে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁকে এ পবিত্র গৃহে নিয়ে আসেন। মিরাজে যাওয়ার পূর্বে নবীজী (স) সেখানে নামায আদায় করেছেন। মসজিদে আকসাকে এভাবে সম্মানিত করেছেন আল্লাহ তাআলা নিজে। বায়তুল্লাহ কাবা ও মদীনার মসজিদে নববীর পর যে স্থানটির যিয়ারত ইসলামে গুরুত্ব পেয়েছে সেটি হলো মাসজিদুল আকসা। ইসলামের এমন একটি পবিত্র স্থান ইসরাইলের জবরদখলে থাকবে, সেটি কি কোনো মুসলমান মেনে নিতে পারে? যে আল্লাহ তাআলা নিজে মাসজিদুল আকসাকে সম্মানিত করলেন, মুসলমানরা কি সে মসজিদের অসম্মান বাড়াবে ইহুদীদের পদানত হতে দিয়ে? এটি কি চিহ্নিত হতে পারে শুধু ফিলিস্তিনি সমস্যারূপে? অধিকৃত এ পবিত্র ভূমির মুক্তির লড়াই কি চিহ্নিত হতে পারে সন্ত্রাসরূপে?'

www.bjilibrary.com

ইরাক দখলের তিন বছর

অতিশয় উত্তপ্ত আলোচনা হয়েছে 'ইরাক দখলের তিন বছর' বিষয়ক সেমিনারে। এখানে জোরালো বক্তব্য রাখেন জনাব আনাস তাকরিতি এবং হাইফা জানাগানা। তারা দুজনই ইরাকি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সেখানে কীভাবে গণহত্যা চলছে, ধর্ষণের পর কীভাবে ধর্ষিতা মহিলার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে চিত্র তারা তুলে ধরেন। অতি বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন জর্জ গ্যালওয়ে এমপি। তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের বক্তৃতার সূত্র ধরে। টনি ব্লেয়ার সম্প্রতি বলেছেন, 'মুসলমানদের উচিত পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা ক্ষোভগুলোকে পরিহার করা।' জর্জ গ্যালওলের প্রশ্ন হলো, যে পাশ্চাত্য ইরাকে অন্যায্য যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর একটি গণহত্যা উপহার দিল, সে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভ মিথ্যা হয় কী করে? পাশ্চাত্যের অর্থ, অস্ত্র ও সমর্থন নিয়েই ইসরাইল যুদ্ধ ও গণহত্যায় নেমেছে আরবভূমিতে। ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করেছে ফিলিস্তিনি আদিবাসীদের। পাশ্চাত্যের সম্মিলিত সেনাবাহিনী শুধু ইরাক ও আফগানিস্তানই দখলে নেয়নি, দখলে নেওয়ার ফন্দি আঁটছে ইরান ও সিরিয়া। লন্ডনের ২৫০ জন পুলিশ সম্প্রতি হামলা করেছে ফরেস্ট গেটে মুসলিমগৃহে। দুজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। একজনকে গুলিবিদ্ধও করেছে। বিলেতের জেলে বিনা বিচারে বন্দী ১ হাজারেরও বেশি মুসলমান। এরপরও টনি ব্লেয়ার মুসলমানদের ক্ষোভকে কি মিথ্যা বলতে চান? সে ক্ষোভকে তিনি শুধু মিথ্যাই বলেননি, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছেন। তিনি মানতেই রাজি নন, লন্ডনের পাতাল ট্রেনে ও বাসে বোমা হামলার কারণ ব্রিটেনের আগ্রাসী বিদেশনীতি, যা আগুন ধরিয়েছে মুসলিমমনে। টনি ব্লেয়ার যে কতটা মানসিক বিকলাঙ্গতায় ভুগছেন, এ হলো তার প্রমাণ। তার বিশ্বাস, পাশ্চাত্যের সেনাবাহিনীর মুসলিম দেশে গণহত্যা উপহার দেবে, লুণ্ঠন বা ধর্ষণে নামবে সেটি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। মুসলমানদের উচিত, ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা। অতীতে যেমন মীরজাফর করেছে এবং আজ করছে হামিদ কারজাইয়েরা, কিন্তু মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধ তাদের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভাবতেও পারিনি ইরাক ও আফগানিস্তানে তারা এমন প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে।

ইসলাম এক্সপোর তাৎপর্য

ইসলাম এক্সপোর চার দিনব্যাপী সম্মেলন পাশ্চাত্যের আগ্রাসী নীতির পর্যালোচনার অপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে এ নিয়ে নানা মতের মানুষের মাঝে সংলাপের। এতে যেমন আত্মবিশ্বাস বেড়েছে মুসলমানদের, তেমনি বেড়েছে অন্যদের সাথে পরিচিতি। বহু ভাষা ও বহু ধর্মের একটি দেশে এমন সংলাপ ও পরিচিতি অপরিহার্য। নইলে পাশাপাশি বসবাস সত্ত্বেও মানুষ বেড়ে ওঠে পারস্পরিক অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস নিয়ে। তখন নিজেদের মহৎ উদ্দেশ্যগুলো যেমন অন্যকে জানানো যায় না, তেমনি জানা হয় না অন্যদের মহৎ গুণগুলোও। তখন পরিচর্যা পায় পারস্পরিক ঘৃণা ও সংঘাত। ইহুদীদের বিচ্ছিন্ন ঘেটো জীবন এ জন্যই অতীতে বিপদ ডেকে এনেছিল। এমন একটি অবস্থা মুসলমানগণ সযত্নে পরিহার করতে চায়। ইসলাম এক্সপোর অনুষ্ঠানমালায় তেমন একটি উদ্দেশ্যই দৃশ্যমান হয়েছে।

লেখকের বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত হলো।

www.bjilibrary.com

উপরে জর্জ গ্যালওয়ে এমপির ইরাকে ব্রিটিশনীতির বিরুদ্ধে এমন বলিষ্ঠ উচ্চারণ সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি টনি ব্রেয়ারের লেবার পার্টিরই অন্যতম নেতা ছিলেন। ব্রেয়ারের ইরাকনীতির প্রতিবাদে তিনি দল থেকে পদত্যাগ করে বিগত পার্লামেন্ট নির্বাচনে টাওয়ার হেমলেট এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের শতকরা ৬০ জন বাংলাদেশি। তাই তিনি নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশে সিলেটসহ বিভিন্ন জেলা সফর করেছেন।

গত বছর ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা হামলার পর মুসলিম কমিউনিটি যে বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে তা সত্ত্বেও লন্ডনে 'ইসলাম এক্সপো'র মতো একটি অনুষ্ঠান এমন বিরাট সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। লন্ডনের মেয়র ক্যান লিভিংস্টোন ও জর্জ গ্যালওয়ে এমপির মতো উদারপন্থিদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ সাফল্য কিছুতেই সম্ভব হতো না। ব্রিটিশ মুসলিমদের মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

২৭৮.

বাংলাদেশে গণতন্ত্র

১৯৭৫ সালের শুরুতেই শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন। ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রকে পুনর্বহালের উদ্যোগ নিয়েছেন। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের শুভ সূচনা হয়েছে; কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা বহাল থাকায় গণতন্ত্র বিকাশে অন্তরায় থেকে গিয়েছিল। শেখ মুজিবই বাকশাল কায়েমের সাথে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি চালু করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কোথাও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি ও গণতন্ত্র একসাথে চলেনি। সর্বত্রই স্বৈরশাসকেরা আমেরিকান দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিকে গণতন্ত্রের নামে চালু রাখার অপচেষ্টা চালিয়েছে।

১৯৮২ সালে সেনাপতি জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে গণতন্ত্রকে দ্বিতীয় বার হত্যা করেছেন। দীর্ঘ নয় বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে স্বৈরশাসক এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

কোনো রাজনৈতিক দলীয় সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত নয় বলে ১৯৮৩ সালে জামায়াতে ইসলামী নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব রাজনৈতিক ময়দানে পেশ করেছে। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে সকল রাজনৈতিক দল ঐ প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করার ফলে ১৯৯১ সালে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশি ও বিদেশি সকল পর্যবেক্ষকের মতে ঐ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী না হওয়ায় একমাত্র শেখ হাসিনা নির্বাচনে 'সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন। অন্য কোনো মহলই শেখ হাসিনার মন্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করেনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐ নির্বাচনই প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন বলে সকল মহলই স্বীকার

www.bjilibrary.com

করেছে। এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দলনিরপেক্ষ অরাজনৈতিক সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচন কমিশন বিনা বাধায় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে।

১৯৯১-এর নির্বাচনের পর–

এমন একটি চমৎকার নির্বাচনের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নবযাত্রার পথে সরকারপদ্ধতি নিয়ে মতভেদের কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরোধ নিরসনে জামায়াতে ইসলামী বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় সরকারপদ্ধতি (Parliamentary Form of Government) চালু করা হয়েছে।

ঘটনাক্রমে ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে সরকার গঠনের ব্যাপারে মাত্র ১৮ সদস্যবিশিষ্ট জামায়াতে ইসলামীর হাতে ব্যালান্স অব পাওয়ার এসে যায়। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় শরীক হতে চাইলে চার থেকে পাঁচটি মন্ত্রণালয় দাবি করতে পারত, কিন্তু জামায়াত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র গণতন্ত্রের স্বার্থে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিএনপিকে সরকার গঠনের জন্য সমর্থন দিয়েছে এবং সংসদে বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সর্ববৃহৎ বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগনেত্রী শেখ হাসিনা লিডার অব দি অপজিশনের মর্যাদা পেয়েছেন। তারই নেতৃত্বে সংসদে এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেছে।

সরকারপদ্ধতির ব্যাপারে সর্বদলীয় সিদ্ধান্তের ফলে যে চমৎকার রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, সংসদে সরকার ও মযবুত বিরোধী দল যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকায় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে বলে আশার সঞ্চার হয়েছিল।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথে নতুন সমস্যা

বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সকল দল কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি কায়েমের দাবিতে একমত হওয়ার কারণেই তো এরশাদের পতন হয়েছে। এরশাদের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ১৯৯১ সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে কিছুতেই বিএনপি ক্ষমতাসীন হতে পারত না। বেগম জিয়ার সরকার কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিরই প্রত্যক্ষ ফসল। পরবর্তী নির্বাচনও যাতে এ পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হয়, সে উদ্দেশ্যে এ পদ্ধতিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাই জামায়াতে ইসলামী এ উদ্দেশ্যে সংসদে উত্থাপনের জন্য বিল জমা দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি অনুরূপ বিল জমা দিয়েছে। সরকারি দলের সিদ্ধান্ত ছাড়া সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে না। সংবিধান সংশোধনের মতো বিল সরকারি দলের উদ্যোগেই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো রহস্যজনক কারণে বিএনপি এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা তো দূরের কথা, সংসদে এ সম্পর্কে আলোচনা করতেও অনীহা প্রকাশ করেছে।

www.bjilibrary.com

এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায়ই দলীয় সরকারের পরিচালনায় পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। তারা কেমন করে এ ধারণা করতে পারলেন যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের এ অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। বিএনপির এ ভূমিকা সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতির পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন

নির্বাচনের পর সংসদীয় গণতন্ত্র যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল তাতে আশা করা হয়েছিল যে, স্বাভাবিক নিয়মেই বিএনপি সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে এবং বিরোধী দল সংসদে স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব পালন করবে। সরকার যদি নিজেই কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিত, তাহলে গণতন্ত্র স্বাভাবিক গতিতেই অগ্রসর হতো। সরকারের অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত ভূমিকার ফলে বিএনপির বিরুদ্ধে চরম রাজনৈতিক বৈরীভাব সৃষ্টি হলো। যে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি কায়েমের দাবি বিএনপিসহ সকল দল মেনে নিয়েছিল, সে দাবিতে আবার আন্দোলন করতে সরকার বাধ্য করল। এতে জামায়াতে ইসলামী সবচেয়ে বেশি বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল।

জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করতে অস্বীকার করে বিএনপিকে সমর্থন করল, অথচ বিএনপিই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিএনপির বিরুদ্ধে জামায়াতকে আন্দোলন করতে বাধ্য করল। এ আন্দোলনের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ বিএনপিই দায়ী। এ আন্দোলন না হলে বিএনপি সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে পদত্যাগ করার দাবি উঠত না। এ দাবির কারণে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে গেল। নির্বাচিত সরকারকে মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দান করাই গণতন্ত্রের দাবি।

১৯৮৮ সালে উল্লেখযোগ্য সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করা সত্ত্বেও স্বৈরশাসক এরশাদ নির্বাচন করেছেন। আর নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলবিহীন ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে গণতান্ত্রিক পরিবেশকে কলুষিত করেছে। এ অস্বাভাবিক নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করার দুসপ্তাহের মধ্যেই সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংযোজন করে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচন

দ্বিতীয় কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনে অনেক কারণেই আওয়ামী লীগ সংসদে বেশি আসন পেয়েছে এবং এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়েছে। আন্দোলনের মুখে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় নির্বাচনী পরিবেশ আওয়ামী লীগের অনুকূলে চলে গেছে; কিন্তু এর পরও বিএনপির জনপ্রিয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন না হওয়ায় ১১৬ আসনে বিজয়ী হয়েছে।

শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বে ওমরাহ করে হিজাব অবস্থায় তাসবীহ হাতে নিয়ে দেশে ফিরে এসে গোটা নির্বাচনী অভিযানে দুহাত জোড় করে জনগণের নিকট দলের অতীত

www.bjilibrary.com

অপরাধের জন্য কাতরভাবে ক্ষমা চেয়ে একটি বারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষমতাসীন করতে আবেদন জানিয়েছেন।

জনগণ ধোঁকায় পড়ে শেখ হাসিনাকে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষমতাসীন করেছে। জনগণের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগের চরিত্রে পরিবর্তন আসবে এবং হয়তো অতীতের মতো ভুল করবে না।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শেখ হাসিনার আসল রূপ

নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে জনগণের যেসব খেদমত করার ওয়াদা করা হয়েছিল সেসব কথা ভুলে গিয়ে এমন কতক কর্মকাণ্ডকে শেখ হাসিনা প্রধান্য দিলেন, যার কোনোটাই মেনিফেস্টোতে ছিল না। যেমন–

১. শেখ হাসিনা কর্তৃক তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।

২. শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে জাতিকে উদ্ধার করে যারা জনগণের নিকট হিরোর মর্যাদা পেলেন তাদেরকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ আদালতে বিচার করা।

৩. জেলায় জেলায় সন্ত্রাসীদের গডফাদার সৃষ্টি করে আওয়ামী শাসন চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা।

৪. সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ গণভোটের মাধ্যমে উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংবিধানের হেফাজত করার শপথ নিয়ে ঐ পরিত্যক্ত মতবাদই তার ও তার দলের আদর্শ বলে ঘোষণা দিয়ে দাপটের সাথে ইসলামী শক্তিকে দমন করা।

৫. দেশ ও সরকারের সকল ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য কায়েম করা।

আওয়ামী লীগের বাকশালী চরিত্রের পরিচয় পেয়ে জনগণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। উপরিউক্ত পাঁচ দফা কর্মসূচির দাপটে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিসমূহ গণতন্ত্রকে পুনর্বহাল করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছে। এরশাদের জাতীয় পার্টি ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোট গঠন করে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আওয়ামী কুশাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চারদল একসাথে আন্দোলন, নির্বাচন ও সরকার গঠনের ঘোষণা দিলে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনের কারণে গণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী সরকারকে মেয়াদ পূর্ণ করা পর্যন্ত শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিতে চারদলীয় জোট অস্বীকার করেছে। স্বৈরশাসকের মতো শেখ হাসিনা ক্ষমতা আঁকড়ে রেখে উপরিউক্ত পাঁচ দফা কর্মসূচি আরো জোরেশোরে চালু রেখেছেন।

ক্ষমতা ত্যাগ করার পূর্বে তিনি প্রশাসন, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন এমনভাবে সাজিয়েছিলেন, যাতে নির্বাচনে তার দল সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করতে পারে। আর ময়দানে দলীয় গডফাদারদের মাধ্যমে ভোট সন্ত্রাসের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, শেখ হাসিনার নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারগণ এবং শেখ হাসিনার দল কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, যা পূর্ববর্তী দুটো নির্বাচনের চেয়েও অধিক নিরপেক্ষ ও অবাধ বলে গণ্য। শেখ হাসিনা স্বয়ং নির্বাচনের দিন মিডিয়ার নিকট নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছেন।

এ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটসংখ্যার দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। ইসলামপন্থিদের ভোটই চারদলীয় জোটকে দু-তৃতীয়াংশ আসনের চেয়েও বেশি আসনে বিজয়ী করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। অল্প ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন।

নির্বাচনী ফলাফল জানার পর থেকে শেখ হাসিনা মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। এ ফলাফল তিনি প্রত্যাখ্যান করে তার দলের নির্বাচিত সদস্যদেরকে শপথ নিতে দেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজেও শপথ নিয়েছেন; কিন্তু তিনি তার দলকে সংসদে যেতে দেননি। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ করেছেন। এমনকি তিনি প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশন, পুলিশপ্রধান ও সেনাপ্রধানর্কে নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করে তার দলকে হারিয়ে দেওয়ার দোষে অভিযুক্ত করে জঘন্য ভাষায় মন্তব্য করেছেন।

এমন আজব আচরণের আসল কারণ

পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার যে স্বাদ তিনি উপভোগ করেছেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে থাকলেন। যে পাঁচ দফা কর্মসূচি তিনি শুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করার প্রয়োজনেই তার ক্ষমতাসীন হওয়া উচিত ছিল। তিনি এ নির্বাচন বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট দাবি জানিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট মেনে নিতে পারেননি।

চারদলীয় জোট সরকার গঠিত হওয়ার পর তিনি বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন অপপ্রচার চালালেন, যা দেশের ভাবমর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

গণতন্ত্রের প্রতি যদি তার সামান্য বিশ্বাসও থাকত তাহলে নির্বাচনে পরাজয়ের আসল কারণ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতেন। পাঁচ বছরের দুঃশাসনের পরিণামেই যে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে কথা উপলব্ধি করে ধৈর্যের সাথে পরবর্তী নির্বাচনে ভালো ফল করার জন্য জনগণের দরবারেই ধরনা দিতেন; চারদলীয় জোট সরকারের প্রতিটি ব্যর্থতাকে কাজে লাগিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে চেষ্টা করতেন।

কারচুপির ফলেই তার পরাজয় হয়েছে বলে যদি সত্যিই বিশ্বাস করতেন তাহলে জনগণের প্রতি তিনি আস্থা হারাতেন না। জনগণের প্রতি আস্থা থাকলে পরাজয়ের গ্লানি দূর করার জন্য জনগণের নিকটই তিনি ফিরে যেতেন। বিশ্বের কোনো দেশে এমন নজির নেই যে,

www.bjilibrary.com

নির্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিদেশের দরবারে কেউ ধরনা দিয়েছে। বিদেশ তাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? ক্ষমতা ফিরে পেতে হলে তাকে জনগণের আস্থা অর্জন করতেই হবে। তিনি যা করছেন তাতে জনগণের আস্থা আরো হারাচ্ছেন। তাই সাড়ে চার বছর তিনি সরকার পতনের আন্দোলনে জনগণের কোনো সাড়াই পাননি।

আওয়ামী লীগ একটি ফ্যাসিস্ট অপশক্তি

২০০১ সালে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে জনগণ সংসদের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। জনগণ জানে যে, তাদের ভোটেই জোট সরকার কায়েম হয়েছে। দেশ ও বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক উক্ত নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শেখ হাসিনা যে ১৩ দলকে নিয়ে ১৪ দলীয় জোট গঠন করেছেন, ঐসব দল ২০০১ সালের নির্বাচনে একটি আসনেও বিজয়ী হয়নি। তবুও ঐসব দলের একজন নেতাও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলেননি। এমনকি শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতাও শেখ হাসিনার ভাষায় কারচুপির কথা বলেন না। কারণ, তারা জনগণের ময়দানের খবর রাখেন। তাই নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের এমপিগণ শেখ হাসিনাকে শপথ নিতে বাধ্য করেছেন।

গত সাড়ে চার বছর ধরে শেখ হাসিনা জোট সরকারকে পদত্যাগ করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করছেন। গণতন্ত্রের কোন্ হিসাব অনুযায়ী তিনি এমন অদ্ভুত দাবি করছেন? বারবার তিনি গণ-অভ্যুত্থানের হুমকি দিলেও জনগণ কোনো সাড়া দিচ্ছে না। তবু সরকার পতনের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।

সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চারদলীয় সরকারের ব্যর্থতার ভিত্তিতে যেসব ইস্যু সৃষ্টি হয়েছে, সেসব ইস্যুতে আন্দোলন না করে শেখ হাসিনা সরকার পতনের আন্দোলন করে যাচ্ছেন। হরতাল, অবরোধ ও বিক্ষোভের নামে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করা, জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করা, রাজনীতির নামে সন্ত্রাস করা, এমনকি মহিলাদেরকেও পুলিশের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত করা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে না।

আগামী অক্টোবরের (২০০৬) শেষদিকে জোট সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হলে সরকার পদত্যাগ করবে এবং কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হবে। আওয়ামী লীগাররা মনে করছেন যে, আন্দোলনের মুখে সরকার পদত্যাগ করলে তারা নির্বাচনে সুবিধা করতে পারবেন; কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর পদত্যাগ করলে সে সুবিধাটুকুও পাবেন না। তাই তারা মরিয়া হয়ে দেশকে বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারসহ অনেকেই তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে অত্যন্ত উপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন। এ পদ্ধতি নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করেছে। আশা করা হয়েছিল, সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে যে নির্বাচনপদ্ধতি চালু হয়েছে তার ফলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র দ্রুত বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হলে নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে না

www.bjilibrary.com

নেওয়ার মতো অগণতান্ত্রিক মনোভাব কোনো দলের স্বভাবে পরিণত হলে এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়।

আওয়ামী লীগের যে গণভিত্তি রয়েছে তাতে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার অপকর্ম তারা করতে সক্ষম। বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার পর অবাঙালিদের ব্যবসায়-বাণিজ্য, বাড়ি-ঘর ও যাবতীয় সম্পদ দখল করে তারা বিরাট অর্থনৈতিক কায়েমি স্বার্থের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় বার ক্ষমতাসীন হয়ে এক্ষেত্রে তারা আরো অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারানোর প্রয়োজন ছিল না। দেশের সংবিধান মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালিয়ে গেলে আবার তারা নির্বাচনে বিজয়ী হতেও পারেন।

কিন্তু তারা আদর্শিক সংকটে ভুগছেন। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদই তাদেরকে সংকটে ফেলেছে। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা ভারতীয় এ মতবাদ এ দেশে জোর করেই চাপিয়ে দিতে চান। গণতান্ত্রিক স্বাভাবিক নিয়মে তা যে অসম্ভব তা তারা বোঝেন। তাই তারা বিদেশের সাহায্য চান।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। এ দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক দলই এ দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। এটা গণতন্ত্রেরও দাবি। কিন্তু শেখ হাসিনা বিদেশি শক্তিকে এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিচ্ছেন। বাংলাদেশে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের দরবারে তারা বারবার ধরনা দিচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনের ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতগণ নসীহত করার সুযোগ পাচ্ছেন। একটি স্বাধীন দেশের জন্য এটা মোটেই সম্মানজনক নয়।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশলাভের পথে আওয়ামী লীগ বিরাট অন্তরায় হয়ে আছে। এ কারণেই বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সংকটপূর্ণ মনে হচ্ছে।

নবম সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করবে

আগামী অক্টোবরের শেষদিকে চতুর্থ কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার কথা এবং ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আশা। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে হুমকি দিচ্ছে যে, কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির সংস্কার ও নির্বাচন কমিশন বাতিল করে নতুন কমিশন গঠনের দাবি সরকার মেনে না নিলে তারা দেশে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতেই দেবেন না।

সরকারের পক্ষে দাবি দুটো মেনে নেওয়া বাস্তবেই অসম্ভব। প্রথম দাবিটি মানতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, যা সরকার করতে চাইবে না, আর দ্বিতীয় দাবিটি পূরণের কোনো ইখতিয়ার সরকারের নেই। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ তাদের দাবিতে অটল থাকলে স্বাভাবিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের দাবি দুটো এমন যে, সংলাপের মাধ্যমেও মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। আওয়ামী লীগের সাথে চারদলীয় জোটের রাজনৈতিক সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে কেয়ারটেকার সরকার ও বর্তমান নির্বাচন কমিশন সংকটের মোকাবিলা করে নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম হলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলে সংকট বৃদ্ধি পেতে পারে। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ নয়। নির্বাচন বর্জন করলেও দলীয় প্রার্থীগণ নাগরিক কমিটির নামে নির্বাচন করতে পারেন। এতে দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়টা তাদের জন্যই সংকটময়। আওয়ামী লীগ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নির্বাচন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করতে পারে। কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন প্রশাসন, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় নির্বাচন অনুষ্ঠান সফল করতে সক্ষমও হতে পারে। এর উপরই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

২৭৯.

আওয়ামী লীগের কারণে কি স্বাধীনতাও বিপন্ন?

কোনো ব্যক্তি ও দলের দেশপ্রেমে সন্দেহ করা উচিত নয়। দেশপ্রেম জন্মগত ও স্বভাবগত। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও কারো কার্যকলাপ দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে পারে।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের কি দেশপ্রেম ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তিনি নবাবের গদি দখলের মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নবাবকে সরিয়ে নিজে নবাব হওয়ার লোভে তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দালালদের খপ্পরে পড়লেন। ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন এবং তাদের সহযোগিতায় নবাব হওয়ার উদ্দেশে পলাশীর ময়দানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন না করে নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করতে ইংরেজদেরকে সুযোগ করে দিলেন। ফলে তিনি কিছু দিনের জন্য নবাবের গদিতে আসীন হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের দ্বারাই গদিচ্যুত হলেন এবং পরিণামে দেশ ইংরেজদের গোলাম হয়ে গেলেন।

মীর জাফর কি সত্যিই চেয়েছিলেন যে, দেশে ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম হোক এবং স্বাধীন রাষ্ট্র পরাধীন হয়ে যাক? এটা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তিনি দেশকে গোলাম বানাবোর নিয়তে নয়, নবাব হওয়ার লোভে বিভ্রান্ত হয়ে এমন মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এর পরিণামে দেশ ১৯০ বছর ইংরেজদের গোলামি করতে বাধ্য হয়েছে।

আমি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমে সন্দেহ করি না। তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। দেশটি পরাধীন হয়ে যাক, তা কি তারা চাইতে পারেন? কিন্তু তারা ক্ষমতার মোহে বিভ্রান্ত। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলে জনগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করতেন। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য কি না, তা বিবেচনা করতেন। জোর করে কোনো মতবাদ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য আদর্শকে দলের আদর্শ বানাতে হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কুফরী মতবাদ

ব্রিটিশ আমলে মি. গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে তখনকার দশ কোটি মুসলমান সংগ্রাম করে ১৯৪৬ সালে

www.bjilibrary.com

ভোটের মাধ্যমে মুসলিম জাতির জন্য পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করেছেন। ঐ নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানদের শতকরা ৯৭ জন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ঐ সংগ্রামে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী আসামে এবং আওয়ামী লীগনেতা সোহরাওয়ার্দী বঙ্গদেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শেখ মুজিব ঐ সংগ্রামে সোহরাওয়ার্দী সাহেবেরই একান্ত অনুসারী ছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়াই ভারতের চাপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বাংলাদেশের প্রধান আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে ঐ ভারতীয় মতবাদ উৎখাত হয়ে গেছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এ মতবাদকে নির্বাচনী ইস্যু বানাতেও সাহস করেনি।

এ দেশের হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই ধর্মকে মানে। তারা ধর্মের পক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এ দেশে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে শতকরা ৮৭ জন। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করেন এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন; রাসূল (স)-কে তাদের আদর্শ নেতা বলে স্বীকার করেন। যে রাসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আল্লাহর আইন চালু করে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের নমুনা মানবজাতির সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন সে রাসূলকে তারা ভালোবাসেন। ঐ রাসূল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে কি আওয়ামী লীগ প্রমাণ করতে পারবে? এ দেশের মুসলমানরা আওয়ামী লীগের চাপে এ কুফরী মতবাদ কিছুতেই গ্রহণ করবে না। এ সহজ কথাটি আওয়ামী লীগ যদি বুঝতে না চায়, তাহলে জনগণের আস্থা কেমন করে হাসিল করবে।

স্বাধীনতার রক্ষক কি ভারত?

২০০৫ সালের ৩০ মার্চ সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনা সভা সমিতির সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার বাবু সর্বজিত চক্রবর্তী। আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আরেফীন সিদ্দিকী, পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুস্তফা চৌধুরী, শিল্প ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

৩১ মার্চ (২০০৫) দৈনিক ইনকিলাবে আলোচকদের বক্তব্য নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে :

"ভারতের বন্ধুত্ব ও সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাবে না। ভারতকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাকবচ হিসেবে উল্লেখ করে তারা আরো বলেন, এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য বিপুল ব্যয়ে এবং মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে বড় ধরনের সেনাবাহিনী পোষা বোকামি। বাংলাদেশের জনগণকে ভারতই বর্তমানে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে মন্তব্য করে তারা বলেন, ভারতের চাল-ডাল খেয়ে, ভারতের কাপড় পরে এ দেশে ভারতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

ভারত '৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন না করে দিলে বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন হতে পারত না এবং আজ পাকিস্তানের দাসত্ব করতে হতো বলে উল্লেখ করে তারা বলেন, ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্বকে চিরদিন সজীব রাখতে এ বন্ধুত্বের গোড়ায় নিয়মিত পানি ঢালতে হবে।

তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী চিন-মার্কিন-পাকিস্তানের পণ্য বর্জন করে বাংলাদেশের জন্মকালীন বন্ধু ভারতের পণ্য ব্যবহার আরো বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, আজ হোক কাল হোক, ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট দিতেই হবে। আর এ ট্রানজিটই ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কমিয়ে আনবে।

বক্তারা একই সঙ্গে বর্তমান সরকার (চারদলীয়) স্বাধীনতার রক্ষক হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন। তারা সরকারকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির উৎখাতে শিগগিরই বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান হবে।"

দেশের জনগণ কি বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক ভারত? জনগণ কি মনে করে যে, দেশ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই? তাদের চিন্তাধারা জনগণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিগ্‌গির চারদলীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের আশা তাদের পূরণ হয়নি। তারা নিজেদের বিরাট দলীয় ক্যাডারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনগণ থেকে তারা যে বিচ্ছিন্ন, তা এখনো টের পাননি। তাই প্রকাশ্যে ভারতপ্রেমের পরিচয় দিতে তারা দ্বিধাবোধ করেন না।

ভারতপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল কুড়িগ্রামের সীমান্তে বরইগ্রাম নামক একটি সীমান্তচৌকি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর দখল থেকে মুক্ত করতে গিয়ে বিডিআর ১৬ জন বিএসএফ নিহত করে বিজয়ী হয়েছে। এ যুদ্ধে বিডিআর-এর দুজন বীর শহীদ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিতে টেলিফোন করে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর নিকট বিডিআর-এর এ ধৃষ্টতার(!) জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, ১৬টি লাশ সসম্মানে ফেরত দিয়েছেন, ঐ চৌকিটিতে বিএসএফ-এর দখল পুনর্বহাল করেছেন এবং ভারতের সাথে বেআদবি(!) করার শাস্তিস্বরূপ বিডিআর-এর ডাইরেক্টর জেনারেল পদ থেকে মেজর জেনারেল ফজলুর রহমানকে অপসারণ করেছেন।

আওয়ামী লীগনেতারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে বলে থাকেন যে, তারা আবার ক্ষমতাসীন হতে পারলে ভারতের সকল দাবি পূরণ করে '৭১-এর সাহায্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। ট্রানজিট প্রদান, গ্যাস বিক্রয় ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে ভারতকে তারা সন্তুষ্ট করবেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে একে যথাযথভাবে রক্ষা করা কম কষ্টসাধ্য নয়। দখলদার বিদেশি শক্তির কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করার আন্দোলনে জনগণের আবেগময় সাড়া

www.bjilibrary.com

পাওয়া যায়। বিদেশের দালালরা জনসাধারণের নিকট পাত্তা পায় না। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেশ গড়ার ব্যাপারে যদি বিপরীতমুখী চিন্তা ও আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়, উভয় দিকের নেতৃত্বেরই যদি বিরাট জনসমর্থন থাকে এবং উভয় পক্ষই যদি রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি প্রতিবেশী কোনো দেশ কোনো পক্ষ অবলম্বন করে তাহলে গৃহযুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। এমনকি স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্রোহে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ইন্ধন জোগাচ্ছে বলে সুদান সরকারের সমঝোতার প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না। বৈরুতে ১০/১২ বছর খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী কোনো দেশ কোনো পক্ষ অবলম্বন না করায় শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উভয় পক্ষ গত দু'দশক পূর্বে আপস-মীমাংসায় পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে। তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়নি।

বাংলাদেশে এমন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে কি না, এ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমার মনে হচ্ছে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ যে আজব রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং প্রতিবেশী দেশটি থেকে আওয়ামী লীগ যে অনুকূল সাড়া পাচ্ছে, তাতে সচেতন দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই চরম শঙ্কাবোধ করছেন। একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা আওয়ামী লীগের রাজনীতির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে ভারতের পত্র-পত্রিকার বক্তব্য এমনভাবে পরিবেশন করছে, যা ঐ শঙ্কাকে তীব্রতর করে তুলেছে। তাই আওয়ামী লীগের চরম অগণতান্ত্রিক আচরণ ও ভারতীয় পত্রিকায় তাদের অনুকূল ভূমিকার বিশ্লেষণ করে দেশপ্রেমিক কলামিস্টগণ প্রচুর লেখালেখি করছেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্তমানে যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ভূমিকা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা কর্তব্য মনে করছি।

বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার নয়, জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির বিরোধিতা করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সবাই যদি দেশপ্রেমিক হই তাহলে এমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারি না, যার ফলে দেশের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় শেখ হাসিনার রাজনীতির সমর্থন

শেখ হাসিনা চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছেন তা সমর্থন করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও সরকারি মহল ২০০৪ সালে বিরাট প্রচারাভিযান চালিয়েছে। শেখ হাসিনা দাবি করলেন যে, চারদলীয় জোট সরকার সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও

www.bjilibrary.com

তালেবান; বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কোনো দেশকে অকার্যকর বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত মারাত্মক। দেশটি স্বাধীন থাকার অযোগ্য হলেই অকার্যকর বলা যায়। বিদেশকে হস্তক্ষেপ করার জন্য দাবি জানানোই এ জাতীয় ঘোষণার উদ্দেশ্য হতে পারে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা হয়েছে। শেখ হাসিনা বিনা তদন্তেই এর জন্য বেগম জিয়ার সরকার সরাসরি দায়ী বলে দাবি করলেন।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার যে ব্যাখ্যা শেখ হাসিনা দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য ভারতের কতক প্রভাবশালী পত্রিকা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। দৈনিক দি হিন্দু, স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার ও আজকাল প্রভৃতি পত্রিকা বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে। হাসিনার দিল্লি সফরের পর তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। তদুপরি বাংলাদেশে তাদের পরম বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য তালেবানী জোট সরকার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলাদেশে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আছে বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উভয় মুখ্যমন্ত্রী তো রীতিমতো ভারত সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছেন, ভুটানের মতো বাংলাদেশেও সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তল্লাশি চালাতে হবে।

শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলে হীন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। একটি সরকারকে ব্যর্থ বলে দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রকে ব্যর্থ ও অকার্যকর বলা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে টিকে থাকার যোগ্য নয়।

আমরা বিস্ময় ও কৌতূহলের সাথে লক্ষ করছি যে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন, এরই ভিত্তিতে ভারতের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়।

দি হিন্দু নামক প্রভাবশালী ইংরেজি দৈনিকের ২০০৩ সালের ১৬ মার্চ সংখ্যায় এমভি কামাথ The problem that is Bangladesh শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন :

"এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া দরকার যে, বাংলাদেশের টিকে থাকার কোনো অধিকারই নেই। ১৯৪৭ সালে এর সৃষ্টি ছিল তেমনি একটি ভুল, যেমন ভুল ছিল ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা। কার্জনের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, অবশেষে বাংলার এক থাকার চেতনার জয় হয়েছিল। বাংলাদেশকে যদি থাকতেই হয়, তো তাকে ভারতের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে হবে এবং ভারতকেও অবশ্যই সহায়তা দিতে হবে এটা বাস্তবায়ন করার জন্য। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ সমস্যার একটিই সমাধান, তা হলো ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ফেডারেশন। বাংলাদেশের বর্তমান শাসকরা এটা যতই অস্বীকার করুক না কেন, বাংলাদেশ কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। বাংলাদেশের একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে বটে, যা পশ্চিমবঙ্গেরই অনুরূপ। এটা (বাংলাদেশ) কখনোই

www.bjilibrary.com

পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা ছিল না এবং এটা তখনই বোঝা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় বেগম জিয়া বা জামায়াতে ইসলামী যত প্রতিরোধই করুক না কেন, বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এটা কোন্ প্রক্রিয়ায় হবে, সেটা খুঁজে বের করা।"

কামাথ এ নিবন্ধে যা বলেছেন, তা ভারতের শাসক-শোষক গোষ্ঠীরই অন্তরের কথা। বাংলাদেশকে ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে বাংলাদেশের গ্যাস নেওয়া, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা বা করিডোরের কোনো সমস্যাই আর থাকে না। বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে দাবিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনে গুজরাটের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

কামাথ ধরে নিয়েছেন, আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামীপন্থি অন্যান্য রাজনৈতিক দল, উপদল ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্তির ব্যাপারে কোনোই আপত্তি করবে না। তিনি (কামাথ) ধরেই নিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এই রাজনীতি আওয়ামী লীগের রাজনীতি। আজ পর্যন্ত কোনো আওয়ামীপন্থি কলামিস্ট বা বুদ্ধিজীবী এ ধরনের লেখকদের বিরুদ্ধে বা ভারতে এ ধরনের প্রকট প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত অভিযোগ তুলেছেন যে, বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০০৪ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ভারতের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও র'-এর কর্মকর্তা বিভূতিভূষণ নন্দী 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় লিখেছেন, "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকসহ সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের এ তৎপরতা (জঙ্গি, মৌলবাদী ও ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী 'উলফা' ও 'মিডলটা'-এর সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও ট্রেনিং দানের তৎপরতা) স্তব্ধ করার জন্য ভারতকে কার্যকর ও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডকে ইসলামপন্থিদের কবল থেকে বাঁচানো যাবে না।"

সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের ইঙ্গিতটি দ্ব্যর্থহীন। এরপর ২৬ আগস্ট (২০০৪) 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা 'খালেদার খেলার চাল : হাসিনাকে হত্যা ও গণতন্ত্রের নির্বাসন' শিরোনামে লিখেছে, "বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলোর উপর যে নিগ্রহ চলছে, সে ব্যাপারে দিল্লি উদাসীন বলেই খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বাড় এত বেড়েছে। দিল্লির উচিত, এখনই (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে) কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।"

এর তিন দিন পর ২৯ আগস্ট পত্রিকাটি তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে, 'বাংলাদেশ এশিয়ার একটি অকার্যকর বেহায়া দেশ; প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ও ব্যাপক দুর্নীতিপরায়ণ এবং সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ।'

এ নিবন্ধে প্রকারান্তরে শেখ হাসিনাকে সংঘাতের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, 'It is time for Delhi to act firmly' অর্থাৎ, 'দিল্লির কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়'।

www.bjilibrary.com

২৭ আগস্ট তারিখে ভারতের অপর প্রভাবশালী দৈনিক 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ভারতের খ্যাতনামা সমরতত্ত্ববিদ ড. সি. রাজমোহন প্রায় সরাসরিই বাংলাদেশ, নেপাল ও মালদ্বীপের উপর শক্তি প্রয়োগের পথ খোলা রাখার সুপারিশ করেছেন। এদের মতে, আশপাশের ব্যর্থ রাষ্ট্রসমূহ সার্থক রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক বিধায় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এসব রাষ্ট্রকে অবদমিত বা দখল করা ব্যতীত সার্থক রাষ্ট্রের বিপদমুক্ত হওয়ার অন্য কোনো উপায়ই নেই।

এর চার দিন আগে ২৩ আগস্ট তারিখে ভারতের আরেক বিশেষজ্ঞ সুভাষ কাপালিয়া ইন্টারনেটে প্রচার করেছেন, 'ব্যর্থ রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেশীদের জন্য হুমকিস্বরূপ।' বাংলাদেশকেও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে কাপালিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য উসকানি দিয়েছেন।

মোট কথা, ভারত বাংলাদেশকে দখল করে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত না করলেও ওরা এখানকার তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদী ও ভারতীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের শায়েস্তা করার অজুহাতে বাংলাদেশে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে জোট সরকারকে উৎখাত করে তাদের আজ্ঞাবহ একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে– এটাই হলো অনেকের ধারণা। অনেকের এটাও ধারণা যে, ভারত যদি বাংলাদেশের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েই বসে, তাহলে আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্ররা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, এর কোনো প্রতিবাদও করবে না; বরং সর্বতোভাবে ভারতীয় হানাদারদের সহায়তাই প্রদান করবে।

ভারতের বৈরী আচরণ

পাকিস্তান আমলে পূর্বপাকিস্তানের সাথে ভারত যে বৈরী আচরণ করেছে, সেটা ভারতের পাকিস্তানবিরোধিতারই অংশ; কিন্তু ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মানচিত্রে অবস্থান লাভ করার পর বাংলাদেশের সাথে ভারতের আচরণে বৈরিতার মাত্রা আরো বেড়ে যাওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলাদেশকে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র ও ভারতীয় পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করার মহান উদ্দেশ্যেই তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

তাদের এ হীন উদ্দেশ্যের তাজা প্রমাণ হলো, ২০০৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ডায়ালগ ফর ইয়াং জার্নালিস্ট'-এর সম্মেলনে ভারতীয় হাই কমিশনার বীনা সিক্রির বক্তব্য ও এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খানের স্বতঃস্ফূর্ত জোরালো ভাষণ। বীনা সিক্রি বলেছেন, 'বাংলাদেশ পানি পায় ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের সমস্যা আদৌ পানির প্রাপ্যতা নয়; বরং পানির ব্যবস্থাপনা। উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। ভারতকে নৌ ও রেলওয়ে ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া বাংলাদেশের কর্তব্য।'

www.bjilibrary.com

স্বাভাবিকভাবেই হাই কমিশনারের এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ মুরব্বিয়ানা নির্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশপ্রেমে আঘাত লেগেছে। তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে উঠে সচিবদের ড্রাফট করা বক্তব্য বাদ দিয়ে এক্সটেম্পোর ভাষণে দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তার সাথে কড়া জওয়াব দিয়েছেন। দৈনিক ইনকিলাবের ১৫/৯/০৪ তারিখে জনাব হারুনুর রশীদ তাঁর মন্তব্যসহ মন্ত্রীর বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এখানে পরিবেশন করছি– "ব্যাস তারপরই ফাটলো সেই অপ্রত্যাশিত অবাক করা বোমা। প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে উঠে সচিবদের মুসাবিদা করা লিখিত বক্তব্য বাদ দিয়ে এক্সটেম্পোর ভাষণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,

১. ভারত পানি ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দেয়। অথচ প্রয়োজনের সময় কখনোই বাংলাদেশকে পানি দেয় না ভারত। খরার মৌসুমে পানি আটকে রাখে, আর বন্যার সময় কোনো পূর্বসতর্কতা ব্যতিরেকেই সমস্ত স্লুইস গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দেয়। তিনি প্রশ্ন রাখেন, এটা কোন্ ধরনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা?

২. ভারত বারবার অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ ভারতীয় সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে; এখানে তাদের ক্যাম্প আছে ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের কোথায় এসব ক্যাম্প আছে, তার কোনো নাম-ঠিকানাই ভারতীয়রা কখনোই দেয় না। অথচ বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী বঙ্গভূমিওয়ালারা কলকাতায় প্রকাশ্য অফিস করেছে (গেরুয়া কাপড় পরে প্রকাশ্যে সশস্ত্র মহড়াও দিচ্ছে) এবং বাংলাদেশের কোনো কোনো জেলা নিয়ে বঙ্গভূমি গঠন করা হবে বলে তার মানচিত্রও ছাপিয়েছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও ভারত থেকেই পেয়েছে অস্ত্র ও ট্রেনিং। ভারতের কোথায় কোথায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আছে তা নাম-ঠিকানা ও ফ্যাক্স-ফোন নম্বরসহ ভারতকে জানানো হয়েছে; কিন্তু ভারত এসব তৎপরতা বন্ধ করছে না। বাংলাদেশের সন্ত্রাসীরাও ভারতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয়দের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, আমাদের হেলিকপ্টার প্রস্তুত আছে, যেখানেই যেতে চান নিয়ে যাব, দেখিয়ে দিন বাংলাদেশের কোথায় ভারতীয় সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি আছে।

৩. ভারত মুক্তবাণিজ্য চুক্তির কথা বলে। অথচ বাস্তব অবস্থা কী? প্রতি বছর ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে গড়ে ৪ বিলিয়ন ডলারের (২৪,০০০ কোটি টাকার) পণ্য। তিনি ভারতীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, গুলশান এক নম্বর থেকে দু'নম্বর পর্যন্ত ঘুরে দেখে আসেন, দেখবেন, সারি সারি ভারতীয় বিজনেস হাউস, দেখবেন ভারতীয় পণ্যে বাংলাদেশ সয়লাব হয়ে আছে। অথচ ভাজা ও চচ্চড়ি খাওয়ার জন্য কিছু ইলিশ মাছ এবং সামান্য কিছু সিরামিক সামগ্রী ও জামদানি শাড়ি ব্যতীত আর প্রায় কিছুই নেয় না ভারত। ডাম্পিং ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের কথা বলে আটকে দেয় বাংলাদেশের পণ্যের আমদানি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এলসি খোলার অনুমতিও দেয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েক কোটি টাকার বাংলাদেশি পণ্য যেত। বায়নাক্কার দরুন সেটাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মোরশেদ খান আরো প্রশ্ন রাখেন, 'ভারতের মতো আমরাও যদি আমাদের বিএসটিআইয়ের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করে দিই তাহলে কোথায় যাবে ভারতের বছরে ৪ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়?

www.bjilibrary.com

৪. বলা হয়, বাংলাদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা নেই। অথচ ভারতের গুজরাটে যখন ভয়াবহ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলে, তখনও বাংলাদেশের একজন মাত্র হিন্দুর উপরও কোনোরূপ আক্রমণ হয়নি।

৫. ভারতের কিছু কিছু পত্রিকা সম্প্রতি বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি উসকানি দিচ্ছে। এ সমস্ত পত্রিকাকে গার্বেজ বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ তো একটা স্বাধীন দেশ। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের হস্তক্ষেপের কথা ভাবাই যায় না। এমতাবস্থায় এ ধরনের হস্তক্ষেপের উসকানি কোন্ ধরনের সমঅধিকার? কোন্ ধরনের গণতন্ত্র?

৬. ২১ আগস্ট (২০০৪) আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রীকে সরাসরি টেলিফোন করে সমবেদনা জানিয়েছেন (অথচ কূটনৈতিক শিষ্টাচার দাবি করে যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছেই সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন)। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পত্র লিখেছেন ঘটনার এক সপ্তাহ পর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এর ফলে বাংলাদেশের জনগণের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতেই পারে যে, বাংলাদেশের একটি মাত্র দলের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক রয়েছে।

বস্তুত ১৯৭১ সালে ভারত যখন তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল, তখনও তারা চায়নি যে, বাংলাদেশ একটি যথার্থ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হোক। তারা চেয়েছিল, বাংলাদেশ হবে তাদের পদানত আজ্ঞাবহ একটি উপনিবেশ মাত্র। তাই তারা ১৯৭১-এ ভারতপ্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যে ৭ দফা চুক্তি করেছিল, তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ই বলা হয়েছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনে নিযুক্ত হবে ভারতীয় কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না, ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে, মুক্তিবাহিনী থাকবে ভারতীয় বাহিনীর আধিপত্যে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশমতো চলবে। যে দলের লোকেরা ভারতের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে পেরেছিল, তাদেরকে ভারত যে আপন ভাববে এবং মদদ দেবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি চারদলীয় জোট সরকারের উপর ভারত খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, এই সরকার ভারতকে গ্যাস এবং ট্রানজিট বা করিডোর তো দেয়ইনি, উল্টো পানির হিস্যা, বাণিজ্যিক ভারসাম্য ইত্যাদির কথা একটু জোরেশোরেই বলছে।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য যে, শুধু পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খানই নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ১ সেপ্টেম্বর (২০০৪) দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক জাকারিয়া খানের সঙ্গে মতবিনিময়ে বলেছেন, 'ওরা চায় এ দেশের তাঁবেদার পুতুল সরকার। বিএনপি কোনো দিনই তা হতে দেবে না। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। আমি চাই, এ দেশের ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম যেন সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে উন্নত জীবনযাপন

www.bjilibrary.com

করতে পারে; কিন্তু ওরা তা হতে দিতে চায় না। আমরা আমাদের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্মানজনক সুসম্পর্ক প্রত্যাশা করি; কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা আমাদের দেশ থেকে সবকিছু নিতে চায়, বিনিময়ে কিছুই দিতে চায় না।'

কেন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিকসহ কোনো ক্ষেত্রেই ক্ষমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না— এ প্রশ্নের জবাবে বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, 'ভারতের শক্তিশালী, দেশপ্রেমিক ও সুশিক্ষিত আমলাতন্ত্র থাকায় ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও নীতির তেমন একটা পরিবর্তন হয় না; কিন্তু বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে দুর্বল।' আরেকটি কথা অবশ্য বেগম খালেদা জিয়া এ প্রসঙ্গে বলেননি। তা হলো এই যে, 'ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সেখানকার সরকার ও বিরোধীদলীয়রা সততই একাট্টা; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।' শেখ হাসিনা দেশ-জাতি গোল্লায় গেলেও বেগম খালেদার সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনায়ই বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তার দেশি ও বিদেশি গুণগ্রাহীদের মতে এটাই হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্ট্যান্ড।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে উপরিউক্ত বক্তব্য দিয়েছেন, সে অনুষ্ঠানে বীনা সিক্রি ও কতিপয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ারও। মোরশেদ খানের বক্তব্যে ভারতীয় হাই কমিশনার বীনা সিক্রি প্রথমে বিস্ময় ও পরে হতাশা ব্যক্ত করেন। ঘটনার পরপরই তিনি দিল্লি চলে যান। অতঃপর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরনও ১০ সেপ্টেম্বর (২০০৪) মোরশেদ খানের বক্তব্যে বিস্ময় ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার হেমায়েত উদ্দিনকে ডেকে পাঠিয়ে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিয়েছেন।

২৮০.

ভারতের আগ্রাসী নীতি

২০০৪ সালের ২৭ আগস্ট দি হিন্দু পত্রিকায় সি. রাজমোহন নামক ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একজন প্রভাবশালী বিশ্লেষক Ending the Regional Drift নামে এক প্রবন্ধে এ অঞ্চলের দোদুল্যমান পরিস্থিতি ভারত কীভাবে সামাল দেবে, সে সম্পর্কে লিখেছেন। তার লেখার লক্ষ্যবস্তু তিনটি ছোট প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, নেপাল ও মালদ্বীপ। তার মতে, এ তিনটি দেশই ভারতের নিরাপত্তার জন্য সংকট। কারণ, এ তিনটি দেশই 'অকার্যকর রাষ্ট্র' হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে। এসব দেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

ভারত সরকারকে রাজমোহন যে পরামর্শ দিয়েছেন এর মর্ম অত্যন্ত স্পষ্ট। উপমহাদেশে যেসব রাষ্ট্র অকার্যকর ও ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে, যাতে সেখানে ভারতের সেবাদাসদের সরকার কায়েম হয়।

www.bjilibrary.com

রাজমোহন আরো পরামর্শ দিয়েছেন যে, নেপাল সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর যে দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে তা বন্ধ করে 'ন্যূনতম গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

রাজমোহনের প্রধান টারগেট বাংলাদেশ। তার মতে, অকার্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্র হওয়ায় বাংলাদেশের চারপাশে অবস্থিত ভারতের সাতটি অঙ্গরাজ্যের বিদ্রোহীরা সেখানে আশ্রয়-প্রশ্রয় পায়। তাই বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সামরিক অভিযান চালিয়ে সেখানে ভারতের বিদ্রোহীদেরকে খতম করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

রাজমোহনের মতো আরেকজন লেখক হলেন বিভূতিভূষণ নন্দী। তিনি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র'-এর সাবেক এডিশনাল সেক্রেটারি। তিনি দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন। ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের পর এ পত্রিকা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে।

নন্দীবাবু লিখেছেন, 'বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসাগুলোতে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ হয় এবং বাংলাদেশের টুপি-পাগড়িপরা মুসলমানমাত্রই তালেবান এবং ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।'

২০০৫ সালের ৩০ মার্চ লেখা নিবন্ধের শেষভাগে তিনি লিখেছেন :

'বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য ভয়ানক হুমকি। ভারত এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি যে নম্র অবস্থান নিয়েছে তা আর চলতে পারে না। এ অঞ্চলে ভারত একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ভারত বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচারণা সহ্য করবে, সেটা চলতে পারে না। বাংলাদেশে ভারতকে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

বাংলাদেশে র'-এর সক্রিয় ভূমিকা

ভারতের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা র' (RAW— Research and Analysis Wing) সম্পর্কে এটুকু ধারণা শিক্ষিত মহলে ব্যাপকই আছে যে, ভারতের সব রকমের স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থা বাংলাদেশে অত্যন্ত সক্রিয়। এ বিষয়ে আমি দুটো প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়েছি।

একটি হলো ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়নার লেখা 'Inside Raw' বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন লে. (অব) আবু রুশদ। অনূদিত বইটির তিনি নাম রেখেছেন 'ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়'।

অপর বইটি আবু রুশদ সাহেবেরই রচনা। নাম বাংলাদেশে র'। এ নামের উপরে লেখা 'গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা', আর নিচে লেখা আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান'। প্রকাশক, জিনাফ, ভাসানী ভবন, ৫১ শান্তিনগর (পুরাতন ৮০ নয়া পল্টন)। সচেতন সকল নাগরিকেরই পড়ার মতো এমন একটি বই, যা ভারতের আগ্রাসী নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন মেজর জেনারেল (অব) এম এ মতিন বীরপ্রতীক।

www.bjilibrary.com

তিনি লিখেছেন :

"যেহেতু আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংগঠন 'ডিজিএফআই' তথা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি, সেহেতু এ দেশের বুকে র'-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে আমার অল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন এ দেশে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে এ দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে অবশ্যই অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা মহান মুক্তিযুদ্ধে র' আমাদের সহায়তা করেছে বলে তাদের পরবর্তী সকল কার্যক্রমকে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করার কোনো যৌক্তিকতা থাকতে পারে না; বরং একটি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আর তাই স্থায়ীভাবে কাউকে আমাদের শত্রু বা মিত্র বলে জ্ঞান করার কোনো অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আজ যে আমাদের পরম মিত্র, পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাল সে ঘোরতর শত্রু বলে পরিগণিত হতে পারে। আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের নজির খুব বিরল নয়।"

'গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা : বাংলাদেশে র'– আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান' বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে তথ্য-উপাত্তের সাড়ম্বর উপস্থাপনা। স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে লেখকের বিশদ বিবরণ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। আশা করি, বাংলাদেশে গোপন রাজনীতির ইতিহাসে বইটি অনেক না-বলা কথার প্রকাশ ঘটাবে।

উক্ত বইয়ের ভূমিকা হিসেবে লেখকের কথা

র'– অর্থাৎ Research and Analysis Wing ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার নাম। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ সংস্থাটি গঠন করেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী RAW প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জন্মের মাত্র তিন বছরের মাথায় সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে র' যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর মাত্র চার বছর পর র'-এর সার্বিক সহযোগিতায় ভারত সিকিম দখলেও সক্ষম হয়েছে। তাই র' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'The Illustrated Weekly of India' মন্তব্য করেছে, "RAW's major triumps in external intelligence were in Bangladesh and Sikkim".

এরপর কিন্তু র' থেমে থাকেনি; বরং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের 'বন্ধু সরকার'ও র'-এর আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তি থেকে রেহাই পায়নি।

বাংলাদেশে র' স্ট্র্যাটেজিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল পর্যায়ে যে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছে, সেখানে ভারত যত না তার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ কাজে ব্যস্ত তার

www.bjilibrary.com

চেয়ে যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশকে সকল পর্যায়ে হীনবল করে তোলাতেই তারা বেশি তৎপর। এখানে তাদের লক্ষ্য, বাংলাদেশকে সকল পর্যায়ে দুর্বল করে দেওয়া, যাতে সে বাধ্য হয়ে ভারতীয় আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়। আগ্রাসী এই গুপ্তচরবৃত্তি এতটাই নীতি-নৈতিকতাবর্জিত যে, র' এ দেশের বিরুদ্ধে যেমন শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি আন্দোলনের মতো প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্ববিরোধী কর্মকাণ্ডকে উসকে দিয়েছে, তেমনি একজন প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ডেও পালন করেছে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা। বলতে গেলে এ দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামরিক ও ধর্মীয় পর্যায়েও র'-এর কালো থাবার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে বাংলাদেশে র'-এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এ দেশের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ ও জনগণের এক বিরাট অংশকে ভারতীয় মতাদর্শের অনুকূলে প্রভাবিত করা।

যাহোক, বাংলাদেশবিরোধী র'-তৎপরতার যৎসামান্য বিবরণ দেওয়ার জন্যই আলোচ্য বইটির প্রকাশ। এক্ষেত্রে র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত তৎপরতার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ... বইটি লিপিবদ্ধ করার একপর্যায়ে যখন ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সাবেক ক'জন মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার নিই, র'-তৎপরতা নিয়ে তখন তাদের কাছ থেকে জানতে পারি পর্দার অন্তরালের অনেক ঘটনাবলি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাংবাদিক হিসেবে অনেক প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তার (সামরিক-বেসামরিক উভয়ই) মতামত জানার সুযোগ হয়েছে বহুবার। অবশ্য এসব সেনসিটিভ বিষয় প্রকাশে তারা তাদের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। তাই এখানে বাংলাদেশে দায়িত্বপালনরত ক'জন র'-কর্মকর্তার সাথে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের কোন্ কোন্ নেতার সখ্য ছিল তা সরাসরি না বলে আভাসে-ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আপাত 'ভারতবিরোধী' নেতাদের প্রসঙ্গও উদ্ধৃত হয়েছে র'-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে। ...

নিছক ভারতবিরোধিতার লক্ষ্যে এ বই লেখা হয়নি; বরং ভারত ও তার গুপ্তচর সংস্থা এ দেশের বিরুদ্ধে কীভাবে, কোন্ পর্যায়ে তৎপরতা চালিয়ে আসছে সেসবের তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দেওয়াই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। তবে এ বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে ডিজিএফআই (Directorate General of Forces Intelligence) ও এনএসআই (National Security Intelligence)-এর ক'জন সাবেক মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার। এই প্রতিবেদনগুলোতে সাবেক গোয়েন্দাপ্রধানগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ দেশে পরিচালিত র'-তৎপরতা ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর ব্যাপকতা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোকপাত করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ যাবৎ কখনো, কোথাও গোয়েন্দা সংস্থাপ্রধানদের এ ধরনের কোনো সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি। আশা করি, এ থেকে পাঠক এ দেশের ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় জানতে পারবেন। সেই সাথে ভারতীয় গুপ্তচরবৃত্তির ভয়াবহতাও অনুধাবন করতে পারবেন সচেতনতার সাথে।

www.bjilibrary.com

লে. (অব) আবু রুশদ রচিত গ্রন্থে বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে র'-এর পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব অপকীর্তি সাধিত হয়েছে, এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এখানে সেসবের তালিকা তুলে ধরলাম :

১. পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী গঠন করে যাবতীয় উপায়ে শান্তিসেনারা প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শান্তিসেনারা ২৫ বছর যুদ্ধ করেছে। বহু অন্যায় দাবিতে তারা বিদ্রোহ করেছে এবং বাঙালিদের হত্যা করেছে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের সকল দাবি মেনে নিয়ে বাঙালিদেরকে নিজ দেশে পরবাসী বানিয়ে দিয়েছে।

২. প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা : লেখক অনেক তথ্য-প্রমাণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'ভারত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি বন্ধুভাবাপন্ন রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। জিয়া হত্যার খবর পেয়ে শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সীমান্তরক্ষীরা বাধ সাধলেন।

৩. 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছেন। পরের দিনই 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' নামের পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছিল। এক সময়কার আওয়ামী লীগনেতা ডা. কালীদাস বৈদ্য 'বঙ্গসেনা' নামে একটি সশস্ত্র বাহিনীও গড়ে তুলেছিলেন। খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে এ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের চক্রান্ত চালানো হয়েছিল।

৪. 'বাংলাদেশ সরকারের ভেতরে-বাইরে ৩০ হাজার র'-এর এজেন্ট তৎপর' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, "মন্ত্রী, এমপি, আমলা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, অফিসার, কর্মচারী পর্যায়ের লোকজনই শুধু নয়; ছাত্র, শ্রমিক, কেরানি, পিয়ন, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্রাভেল এজেন্ট, ইন্ডেন্টিং ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, নাবিক, বৈমানিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন স্তরে তাদের এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে।"

৫. ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি : এ কমিটির পেছনেও র'-এর হাত রয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল না। এ বিষয়ে লেখকের বক্তব্য নিম্নরূপ–

"বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী এমন প্রচার-প্রচারণা শুরু করে দেন যে, জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠন করে বিএনপি স্বাধীনতার চেতনা বিসর্জন দিয়েছে এবং জামায়াতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা। এদের প্রচারণা এতটাই সমন্বিত ও সর্বব্যাপী ছিল যে, সরকারও একপর্যায়ে ঘাবড়ে যায়। ভাবতে থাকে না জানি কে কী মনে করছে।

www.bjilibrary.com

ফলশ্রুতিতে বিএনপি'র দোদুল্যমান নেতৃত্ব ২৪ মার্চ '৯২ তারিখে সবাইকে অবাক করে দিয়ে জামায়াতের আমীর জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের পাশাপাশি তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। এর মাত্র দু'দিন পর ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ঘাদানিক অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে এই কমিটি কাদের সহায়তায়, কোন্ সূত্রে প্রাপ্ত অর্থে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তা বিবেচনায় না এনেও বলা যায়, শুধু বিএনপিকে বিপদে ফেলা ও জামায়াতের কাছ থেকে আলাদা করে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এ যুক্তির সপক্ষে বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। শুধু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সৃষ্ট আন্দোলনে জামায়াত আ'লীগের শরীকে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এই ঘাদানি কমিটির সকল দাবি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই তারা একসময় গণ-আদালত গঠন করে 'ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি' দাবি করলেও আ'লীগ-জাপা-জামায়াত জোট গঠনের পর একটি বারের জন্যও সেই ফাঁসির রায় কার্যকর করার টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

এদিকে ঘাদানিক গঠন ও এর উদ্দেশ্য যে ঘাতকদের বিচার নয়; ভিন্ন কিছু ছিল সে ব্যাপারে ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের উৎসাহে ক'জন মুক্তিযোদ্ধা '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও প্রতিরোধকল্পে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। এদের বেশির ভাগই সরাসরি আ'লীগ বা অন্য কোনো বুর্জোয়া দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলেন না। জানা যায়, আলাপ-আলোচনার পর আলোচ্য কমিটির নাম রাখার সিদ্ধান্ত হয় 'ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি'। এটি '৯১ সালের ডিসেম্বরের কথা। মাঝে লে. কর্নেল নুরুজ্জামানের এককালীন ঘনিষ্ঠ এক বিশিষ্ট সাংবাদিক হুট করে এই কমিটির নাম থেকে 'প্রতিরোধ' শব্দ বাদ দিয়ে 'নির্মূল' শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন। এরপর কোথা দিয়ে কী হলো, স্রোতের মতো এগিয়ে এলেন জাহানারা ইমামসহ অসংখ্য ভারতপন্থি ব্যক্তিত্ব। নির্দলীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আইডিয়া পরিবর্তিত আকারে হাইজ্যাক হয়ে গেল কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সুযোগ বুঝে আ'লীগ নেতৃবৃন্দ ভাগ বসাল 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কিন্তু যখন পারপাস সার্ভ হয়ে গেল তখন 'ঘাতক' জামায়াতই আবার হয়ে গেল 'মুক্তিযোদ্ধা'দের আন্দোলনের সাথী। এরপর ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই ঘাদানিক'-এর কোনো সাড়া-শব্দ ছিল না। বিএনপি, জাপা, জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট একজোট হওয়ার মুহূর্তে আবার চারদিকে 'ঘাতকদের ষড়যন্ত্র' খুঁজে পায় ঘাদানিক। অথচ ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে তাদের পছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর একবারও 'ঘাতক গোলাম আযমের' ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানায়নি ঘাদানিক নেতৃবৃন্দ। এ থেকেই কি বোঝা যায় না, কী উদ্দেশ্যে, কাদের স্বার্থে ও কাদের বিরোধিতা করার জন্য এই কমিটির সৃষ্টি?"

www.bjilibrary.com

৬. 'লজ্জা' ও তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি

বাবরী মসজিদ ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদর্শন করে ২৩ জানুয়ারি '৯৩ তারিখে। এর মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় শুরু হওয়া একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই, হিন্দুদের উপর চলছে নির্যাতন– এসব কাল্পনিক কথামালাই ছিল 'লজ্জা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই উপন্যাসের মাধ্যমে যে বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে তাতে সে সময় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে নয়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে– 'লজ্জা' উপন্যাসের মাধ্যমে র' সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করেছে সার্থকভাবে।

এ কথা হয়তো সাধারণ সাহিত্য সমালোচক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'লজ্জা' নিছক একটি উপন্যাস, কিন্তু তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি বা 'লজ্জা' প্রকাশ কখনোই কোনো গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বিষয় ছিল না; বরং 'লজ্জা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে 'নজর' রাখার হুমকি দেওয়ার মাত্র সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে র' চরমতম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আপাত 'নির্দোষ' একটি সাহিত্যকর্মের সাহায্যে একটি দেশকে কখনো কেউ এত বড় বিপদে ফেলে দিতে পারেনি– যা র' সার্থকভাবেই পেরেছে।

তসলিমা নাসরিন যে র'-এর সৃষ্ট ও তার লজ্জা উপন্যাস যে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে পরবর্তীতে অনেক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি ভারতীয় বিশ্লেষকগণও তসলিমা নাসরিনের র'-এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এদেরই একজন হলেন ভারতের ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষক অশোক এ. বিশ্বাস। ৩১ আগস্ট '৯৪ সংখ্যা 'দি নিউ নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত Raw's role in furthering India's foreign policy' শীর্ষক এক নিবন্ধে মি. আশোক বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে, বিএনপি সরকারকে বিশ্বদরবারে সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী হিসেবে চিত্রিত করার জন্য র' তসলিমা ইস্যু সৃষ্টি করেছে। তিনি একে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে র'-এর অন্যতম বড় সাফল্য বলেও মন্তব্য করেন।

৭. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তৎপরতা

অংকের সূত্রের মতো হয়তো প্রমাণ দেওয়া যাবে না যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে বা তাদের কোনো কোনো নেতা র'-এর সাথে যুক্ত। তবে ১৯৮৮ সালের ২০ মে জন্ম নেওয়া এই সংগঠনটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে আসছে একের পর এক। '৮৮ সালে

www.bjilibrary.com

সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তথাকথিত স্বার্থরক্ষাকারী এ 'ঐক্য পরিষদ' প্রতিটি পর্যায়েই মাঠে নেমেছে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার আড়ালে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিনাসের লক্ষ্য নিয়ে। এমনকি ২০০০ সালে এরা সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ্' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাদ দেওয়া না হলে পৃথক হিন্দুরাষ্ট্র গঠনেরও হুমকি প্রদান করে। এসব থেকেই বোঝা যায়, ঐক্য পরিষদের সহজ-সরল লক্ষ্য হলো, যেকোনো উপায়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি বা গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে 'সংখ্যালঘুর জীবন বাঁচানোর দাবি' নিয়ে প্রতিবেশী দেশের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করা। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্তও সংগঠনটি একই লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক প্রচারণা চালিয়েছে। বিশেষ করে '৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা ও '৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দু কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলার পর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ব্যাপক পরিসরে বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ভারতে বিজেপি বা উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে যেসব প্রচারণা চালিয়েছে, এ দেশে ঠিক তার সমান্তরাল কর্মসূচিই পালন করেছে ঐক্য পরিষদ।

গোয়েন্দা সংস্থা'র যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

আবু রুশদ সাহেব বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক যে দুটো প্রধান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন তাঁদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ব্রিগেডিয়ার (অব) আমিনুল হক, বীরউত্তম, সাবেক মহাপরিচালক, এনএসআই (National Security Intelligence)।

২. মেজর জেনারেল এমএ হালিম, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক, ডিজিএফআই (Directorate General Forces Intelligence)।

৩. মেজর জেনারেল (অব) এম এ মতিন বীরপ্রতীক পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক, ডিজিএফআই।

৪. মেজর জেনারেল (অব) মহব্বত জান চৌধুরী, সাবেক মহাপরিচালক, ডিজিএফআই।

৫. মেজর জেনারেল (অব) জেডএ খান পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক আইবি, ডিজিএফআই।

বাংলাদেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত গোয়েন্দা সংস্থাপ্রধানগণ র'-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তাঁদের মন্তব্য এ বিষয়ে শুধু নির্ভরযোগ্যই নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, তার মধ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন ও জবাব এখানে উদ্ধৃত করছি :

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন. র' বাংলাদেশে কীভাবে, কোন্ সেক্টরে কাজ করে থাকে?

মে. জে. হালিম : আমাদের দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে র' তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেক্টরভেদে গুরুত্বারোপ করে থাকে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য সেক্টর হচ্ছে– মিডিয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পবাণিজ্য খাত। অতি সূক্ষ্মভাবে র' এসব সেক্টরে অনুপ্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গেছে, র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের বেছে নেয় এবং বিভিন্ন কৌশলে এদের ক্রয় করে। এ ধরনের কৌশলের মধ্যে রয়েছে– খেতাব প্রদান, ডিগ্রি প্রদান, বৃত্তি প্রদান, কম খরচে লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন. তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ ধীরে ধীরে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে?

মে. জে. জেড এ খান : অনেকটা তা-ই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও '৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ হয়ে গেল, তখন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ তা মেনে নিতে পারেনি। বরাবরই তাদের লক্ষ্য হলো অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা। এ মর্মে প্রথম থেকেই তারা অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। যখন দেখল স্বাভাবিক পথে পারছে না তখন তারা ঠিক করল, যদি পাকিস্তানকে দুটো ছোট ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে; তাদের প্রয়োজনে যেকোনো খাতে পরাভূত করা সহজ হবে। এ ছাড়া ছোট রাষ্ট্র হলে প্রভাববলয়ে নিয়ে আসা যাবে যেকোনো মুহূর্তে। এতে ভারতের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন বা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নের পথও হবে সুগম। র'-এর মাধ্যমে সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। ...

প্রশ্ন. এ ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগে প্রভাবিত করায় র'-এর কৌশল কী?

মে. জে. জেড এ খান : কৌশল তিন-চার রকম হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। তবে অর্থ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু ব্লাকমেইল করার জন্য, সহযোগিতার লক্ষ্যে নয়। এখানে ছোট হলেও একটা না একটা প্রমাণ তারা রাখবে, প্রয়োজনবোধে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর জন্য। তখন ব্লাকমেইলিং-এর ভয়ে বাধ্য হয়েই অর্থ গ্রহণকারী র'-এর পক্ষে কাজ করে। এ পর্যায়ে হয়তো অর্থগ্রহণকারী 'সম্মানিত ব্যক্তি' সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই তথ্য পাচার থেকে শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তির বেড়াজালে জড়িয়ে যায়।

অর্থের বাইরে নারী, সুরা এ দুটোর লোভে পড়েও অনেকে ফেঁসে যায়। আবার বিভিন্ন সম্মান লাভ, ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, হয়তো পিএইচডি করার ইচ্ছে আছে পয়সা নেই– এ অবস্থায় অর্থের যোগান দেওয়া, সপরিবারে বিশ্বের লোভনীয় স্থানগুলো দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে টোপ ফেলে র'। মোটকথা, চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সেদিকেই বড়শি ফেলা হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি হলো অর্থ। এ ছাড়া

www.bjilibrary.com

আরেকটি দিকে র' বিশেষ নজর দিয়ে থাকে। সেটি হলো সংবাদমাধ্যম ও পত্রিকার কলামিস্ট। কারণ, জনমত গঠন বা প্রভাবিত করায় কলামিস্টদের ও সাংবাদিকদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাই এই সেক্টরে র' বিশেষভাবে তৎপর।

ক্লাইভ দোষী, নাকি মীরজাফর?

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের জন্য কি ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়? ক্লাইভ তো ইংরেজ জাতির নিকট হিরোর মর্যাদা পেয়েছে। নিজের জাতির গৌরব অর্জন করেছে। আমি ক্লাইভকে মোটেই দোষী মনে করি না।

আমার জাতি ও দেশের মীরজাফর যদি বিশ্বাসঘাতক না হতো, তাহলে ক্লাইভ কিছুতেই বিজয়ী হতো না।

আমি ভারতীয় পত্র-পত্রিকার ও ভারতীয় কতক নেতার বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকা এবং ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী র'-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে যেসব তথ্য পেশ করেছি, এর জন্য আমি তাদেরকে দোষী মনে করি না। তারা তো নিজেদের স্বার্থের পক্ষেই কাজ করে চলেছে।

আমার দৃষ্টিতে আসল অপরাধী হলো শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের মর্যাদা ও স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সবসময় ভারতের স্বার্থের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে শেখ হাসিনা বিভিন্নভাবে ভারতকে সহযোগিতা করে চলেছেন :

১. ভারতের যে রাজনৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতি দীর্ঘ সংগ্রাম করে ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করতে সক্ষম হলো, ঐ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী বলে শেখ হাসিনা ভারতকে এ নিশ্চয়তাই দিচ্ছেন যে, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ মোটেই সঠিক ছিল না। তাই আবার অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে বাংলাদেশের কোনো আপত্তি নেই।

২. আওয়ামী লীগের মতে, '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি রাষ্ট্র কায়েম করা, যেখানে জনগণ হিন্দু-মুসলিম চেতনা ত্যাগ করে এক বাঙালি জাতিতে পরিণত হবে। 'উদার মুসলিম দেশ' হিসেবে পরিচিত হওয়ার জন্য নাকি তারা মুক্তিযুদ্ধ করেননি।

৩. বাংলাদেশের চারপাশে ভারতের যে সাতটি অঙ্গরাজ্য রয়েছে, সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশে অল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে সেসব এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য যে করিডোর বা ট্রানজিট দাবি করছে, আওয়ামী লীগ তা জোরেশোরে সমর্থন করছে। অথচ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিসমূহ এ দাবিকে দেশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি মনে করছে। কারণ, দিল্লির দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য যারা সংগ্রাম করছে তারা বাংলাদেশের শত্রু নয়। তাদেরকে দমন করার জন্য ভারতকে সাহায্য করলে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ময়দান বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও সম্প্রসারিত হবে। ভারতের সামরিক পরিবহনকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তারা

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশের ভেতরেও ঢুকে পড়বে। ভারত ও বিদ্রোহীদের সংঘর্ষ বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে এবং বাংলাদেশ তাদের যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হবে। দিল্লির আধিপত্যের স্বার্থে বাংলাদেশ চারপাশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরকে কেন শত্রুতে পরিণত করবে? এটা বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী।

৪. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের ছয়টি জেলা নিয়ে 'বঙ্গভূমি' নামে একটি হিন্দুরাষ্ট্র কায়েমের যে আন্দোলন চলছে, এর বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা আজ পর্যন্ত কোনো আপত্তি করেননি। আওয়ামী লীগের সাবেক হিন্দু নেতারাই এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ ষড়যন্ত্রে ভারত সরকারের সম্মতি আছে বলেই শেখ হাসিনা এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকা কর্তব্য মনে করেন।

৫. হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ যে ধৃষ্টতা ও দাপটের সাথে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক হুমকি দিয়ে চলেছে এবং মুসলিমজাতিকে যেভাবে শাসাচ্ছে, শেখ হাসিনারা কোনো দিন এসবের নিন্দা জানাননি। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিতে সাহস পাচ্ছে না। সরকার তাদেরকে ভয় করে না। ভয় করে শেখ হাসিনাকে। কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কোনো অন্যায় না হওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সারা দুনিয়ায়, এমনকি ভারতে গিয়ে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অভিযোগ করেন। সরকার যদি তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করে তাহলে শেখ হাসিনা কি পরিমাণ নর্তন-কুর্দন করবেন সে ভয়েই সরকার অস্থির।

ভারতের দোষ কী?

প্রত্যেক দেশই চায়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বন্ধুভাবাপন্ন সরকার ক্ষমতাসীন থাকুক। শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের মতো সেবাদাস মনোভাবের লোকদেরকে ক্ষমতাসীন করতে সর্বাত্মক সাহায্য করা ভারতের জন্য মোটেই দূষণীয় নয়।

প্রকৃত অপরাধী তারাই, যারা ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে নিজের দেশের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্য দেশের সাহায্যে ক্ষমতা পেতে চায়। আওয়ামী লীগের মতো গণভিত্তিসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক শক্তিকে তাঁবেদার হিসেবে পাওয়া ভারতের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আমেরিকাকে কত চেষ্টা করে বিভিন্ন দেশে তাঁবেদার সরকার কায়েম করতে হচ্ছে। বিনা চেষ্টায় যদি তা হাসিল করা সম্ভব হয়, তাহলে ভারত কেন তা গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করবে?

আমি বরং ভারতের নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টির প্রশংসাই করি যে, আওয়ামী লীগের ডাকে সাড়া দিয়ে '৭১ সালের মতো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে তারা এখনো সামরিক অভিযান শুরু করছেন না। '৭১ সালের পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য বোঝানোর মতো আকল ক্ষমতাপিপাসু আওয়ামী লীগের না থাকলেও ভারতের নেতৃবৃন্দ তাদের মতো আহম্মক নন।

এ বিষয়ে ২০০৪ সালে কামিয়াব প্রকাশন লি. আমার লেখা 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' শিরোনামে ৭২ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেছে।

www.bjilibrary.com

২৮১.

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি হীন-কটাক্ষ এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ এমন হুমকি দিয়ে যাচ্ছে, যা মুসলমানদের রক্তে আগুন লাগানোর জন্য যথেষ্ট। এ সত্ত্বেও ইসলামী দলগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে এগুলো নীরবে হজম করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের চরম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য পত্রিকার পাতায়ই সীমাবদ্ধ। এসব আক্রমণাত্মক ও অপমানকর বক্তব্য জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তারা কিন্তু এটাই চায়, যাতে সংখ্যালঘুদেরকে রক্ষা করার অজুহাতে তাদের প্রভুদেশ বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

তথাকথিত এ ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। তারা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়। তাদের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় সংখ্যালঘু দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ বহুবার বক্তব্য রেখেছেন। তারা যে ধরনের উসকানিমূলক বক্তব্য রাখছে, তা দেশপ্রেমিক দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় বহন করে না।

এত সাহস তারা কোথায় পায়? নিঃসন্দেহে তাদের খুঁটির জোর দেশে আওয়ামী লীগ ও বাইরে ভারত। তাদের ধৃষ্টতা-বাড়াবাড়ির প্রতিকার করা না গেলেও তাদের বক্তব্য স্থায়ী গ্রন্থে রেকর্ড করার প্রয়োজনে এখানে তা তুলে ধরছি। এমন এক সময় আসতে পারে, যখন আওয়ামী লীগ তাদেরকে আশকারা দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জনগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য হবে। আওয়ামী লীগ যে উদ্দেশ্যেই মুক্তিযুদ্ধ করে থাকুক, জনগণ দিল্লির গোলামি করার জন্য ইসলামাবাদ থেকে মুক্তি চায়নি। এ কথাই একদিন প্রমাণিত হবে।

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দাবি

২০০১ সালের ১৪ জুলাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে তাদের দুই দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেছে। ঐ সম্মেলনে উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অবিলম্বে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বিসমিল্লাহর অনুচ্ছেদ বিলোপ করতে হবে।

২. বাঙালিদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'আলহাজ্জ', 'মুহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ সাম্প্রদায়িক; সুতরাং নামের সাথে ঐসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

৩. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী (বিসমিল্লাহ) ও ৮ম সংশোধনী (রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম) অবিলম্বে বাতিল করে '৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.bjilibrary.com

৪. জাতীয় সংসদে ৮০টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

যদি এসব দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দক্ষিণবঙ্গের ছয়টি জেলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ছয়টি জেলা হলো বরিশাল, পটুয়াখালী, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া এবং খুলনা। (দৈনিক ইনকিলাব)

ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। এসব দাবির ধরন ও দাপটময় ভাষা প্রমাণ করে যে, ঐ দাবিদাররাই এ দেশের নিয়ন্তা বলে নিজেদেরকে মনে করেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ঐ সংশোধনীতেই বিসমিল্লাহ সংযোজন করা হয়েছে। তারা গণভোটেরও পরওয়া করেন না। তাদের নির্দেশ গণভোটকেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এত বড় ধৃষ্টতা একমাত্র আওয়ামী লীগের জোরেই তারা দেখাচ্ছেন। কারণ, আওয়ামী লীগ গণভোটে উৎখাত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই তাদের আদর্শ বলে ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এ নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে যে, মুসলমানদের নামের আগে 'মুহাম্মাদ' ও 'আলহাজ্জ' ব্যবহার করা চলবে না।

তারা '৭২ সালের সংবিধান পুনঃচালু করার দাবি করেছেন। ঐ সংবিধান শেখ মুজিবের আমলে চার বার সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানপ্রণেতারাই সংশোধন করেছেন। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের ভদ্রলোকেরা কোন্ অধিকারবলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংশোধনী বাতিল করার দাবি করেন? চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিব যখন 'মহারাজা'র আসন গ্রহণ করেছিলেন তখন তারা কোথায় ছিলেন? কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন কি?

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিলের দাবিও তারা করেছেন। অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধান সংশোধনের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই তা করেছেন। এতে আপত্তি করার অধিকার তাদেরকে কে দিল? আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দল তাদের পেছনে আছে বলেই কি এত বড় দাপট?

ঐক্য পরিষদের বলিষ্ঠ দাবিনামা

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ২০০৩ সালের ৯ জুন ইসলামের বিরুদ্ধে 'কালো দিবস' পালন করেছে। মেজর জেনারেল (অব) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠিত সমাবেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রচণ্ড হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সমাবেশে হাজির থেকে ঐসব বক্তব্য মুসলিম নামধারী যারা অতি উৎসাহের সাথে সমর্থন করেছেন তারা হলেন আওয়ামী লীগনেতা আবদুর রাজ্জাক এমপি ও ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম, গণফোরামের নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এবং জাসদনেতা হাসানুল হক ইনু ও নূরে আলম জিকু। উক্ত সমাবেশে পেশকৃত তাদের

www.bjilibrary.com

দাবিনামা নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ইত্যাদি কথা এখনই বাতিল করতে হবে।

২. বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র বলা যাবে না।

৩. ইসলাম এবং বিসমিল্লাহ মুছে ফেলার কাজটা বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারকেই করতে হবে। নইলে কি করে তা করাতে হয়, সেটা এই সরকারকে দেখিয়ে দেওয়া হবে।

৪. সি আর দত্ত বলেছেন, 'আমাদেরকে দুর্বল ভাববেন না। বাংলাদেশে আমরা ৩ কোটি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান রয়েছি, যা ইরাকের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তা ছাড়া আমাদের পক্ষে রয়েছে এ দেশের অনেক মুসলমান। আমরা করতে চাইলে এ দেশে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারি। আপনারা (সরকার ও মুসলমানরা) সন্তু লারমার কাছেই নতিস্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের সাথে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

৫. এ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, 'ভারতের সাথে মিলেমিশে চলুন, অন্যথায় পরিণাম ভালো হবে না।'

৬. আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক এমপি বিসমিল্লাহ্ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যার শামিল বলে অভিহিত করে বলেছেন, 'এই সরকারকে আর সময় দেওয়া যাবে না।'

৭. গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক বলেছেন, 'সংখ্যালঘুরা যদি এ দেশে থাকতে না পারে তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানরাও এ দেশে থাকতে পারবে না। মুসলমানদেরও রেহাই দেওয়া হবে না।'

৮. বোধিপাল মহাথেরো বলেছেন, 'বাংলাদেশকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে আমরা টিকতে দেব না।

ঐক্য পরিষদের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দাবি

২০০৩ সালের ২০ মে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ১৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজিত সভায়ও 'বিসমিল্লাহ' এবং 'ইসলাম' উৎখাতের সদর্প ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে :

১. ভারত থেকে দেড় কোটি হিন্দুকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২. ইসলামকে বাতিল করে বাংলাদেশকে ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থায় (অর্থাৎ অখণ্ড ভারতে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩. সি আর দত্ত বলেছেন, 'আমরা (হিন্দুরা) ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম কিংবা বাংলাদেশকে মুসলমানের দেশ বানানোর জন্য ১৯৭১ সালে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ করিনি।'

www.bjilibrary.com

৪. তিনি আরো বলেছেন, 'আমরা (হিন্দুরা) এ দেশ স্বাধীন করে দিয়েছি বলেই ওরা (মুসলমানরা) আজ বড়লোক, মন্ত্রী-সচিব ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নইলে ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই বেঁচে থাকতে হতো।'

৫. 'আমরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা) দুর্বল নই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সর্বোপরি ভারত আমাদের সরাসরি সহায়তা করছে। এ সুযোগ আমাদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।'

৬. 'এ দেশের হিন্দুদের আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে।'

বলাবাহুল্য, এই সভায়ও বিচারপতি কে এম সোবহান ও শাহরিয়ার কবিরের মতো জাঁদরেল আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে ঐক্য পরিষদের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

বিচারপতি কে এম সোবহান আরো যোগ করে বলেছেন, 'সম্পত্তি ও নারীর লোভেই মুসলমানরা এ দেশের হিন্দুদের উপর হামলা-নির্যাতন চালাচ্ছে।'

ঐক্য পরিষদের দাবিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট প্রশ্নাবলি

ক. আমরা তো জানতাম, বাংলাদেশে অমুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখের মতো। কিন্তু দত্তবাবুরা দাবি করেছেন, তাদের সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। তাহলে বাকি ১ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু এলো কোত্থেকে? ভারত থেকে কি?

খ. দত্তবাবুরা যে বলেছেন, ১৯৭১ সালে তারাই ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন এবং তার ফলে হাসিনা-খালেদা, জলিল-মান্নান ভূঁইয়ারা আজ মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন (নইলে তারা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে পড়ে থাকতেন)– তাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কি সম্পূর্ণ একমত?

গ. দত্তবাবুরা দাবি করেছেন, 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলাম' উৎখাত এবং বাংলাদেশকে তাদের অভিলাষ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার (অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার) লড়াইয়ের সমর্থক অনেক মুসলমান নামধারীও রয়েছেন। এরা কারা? কী এদের পরিচয়? কোন্ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা এরা পাচ্ছেন?

ঘ. সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক যে বলেছেন, সংখ্যালঘুরা এ দেশে থাকতে না পারলে মুসলমানদেরকেও এ দেশে থাকতে দেওয়া হবে না– এ কথারই বা তাৎপর্য কী? তারা কি ভারত ও অন্যদের সহায়তায় বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানকেও উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন? কিন্তু তারা যেভাবে প্রয়োজন হলেই টপ করে ভারতে চলে যেতে পারেন, ১৩ কোটি মুসলমান চলে যাওয়ার মতো সে রকম কোনো দেশ তো বাংলাদেশের আশপাশে নেই। সেক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পাইকারি হত্যার মাধ্যমেই কি তারা বাংলাদেশকে মুসলমানশূন্য করবেন?

www.bjilibrary.com

ঙ. সুধাংশু বাবু যে সরকারকে নির্দেশ দিলেন ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে এবং হুমকি দিলেন, অন্যথায় এর পরিণাম ভালো হবে না– এ কথারই বা তাৎপর্য কী? এর তাৎপর্য কি এই যে, ভারত চাহিবামাত্র বাংলাদেশকে গ্যাস, করিডোর ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে? সীমান্ত থেকে বিডিআর তুলে নিতে হবে, যাতে ভারতীয়রা ইচ্ছামতো এ দেশে ঢুকতে পারে, এ দেশের যেকোনো এলাকা দখল করে নিতে পারে, এখানকার যেকোনো মানুষকে হত্যা করতে পারে এবং ভারতীয় নিম্নমানের পণ্য ডাম্প করে এ দেশের সমস্ত শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিতে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য দখল করে নিতে পারে?

অন্যথায় পরিণাম ভালো হবে না– কথাটার অর্থ কি এই যে, বেগম খালেদা জিয়া সরকার তাদের নির্দেশমতো কাজ না করলে তারা ভারতের সহায়তায় এই সরকারকে যেকোনো মুহূর্তে উৎখাত করে এ দেশে ভারতের একটা পুতুল সরকারই বসিয়ে দেবেন? শেখ হাসিনাই কি সেই সরকারের প্রধান হবেন?

চ. দত্তবাবুরা যে বারংবার অস্ত্র হাতে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছেন, তাদের অস্ত্রের সরবরাহটা আসছে কোত্থেকে? উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে তারা এ কথাও একদম প্রকাশ্যে বলেছেন যে, মুসলমানদের রক্তে পদযুগল রঞ্জিত না করলে তাদের কালীমাতা পরিতৃপ্ত হবেন না। তাহলে ১৩ কোটি মুসলমানের রক্তেই কি তারা রঞ্জিত করতে চান তাদের কালীমাতার শ্রীচরণ?

ছ. কোন্ যুক্তিতে তারা সংসদে হিন্দুদের জন্য ৮০টি আসন রিজার্ভ রাখার দাবি জানাচ্ছেন? ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৭২টি আসনে হিন্দুগণ নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে নির্বাচনপদ্ধতির কারণে তারা নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন, সে পদ্ধতি কীভাবে বাতিল হয়েছে, সে ইতিহাস কি তারা জানেন না? ১৯৫৬ সালে তাদেরই ষড়যন্ত্রে এ পদ্ধতির বদলে বর্তমান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তাই সে ইতিহাসটুকু তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

সংসদে হিন্দুদের আসন সংরক্ষণের দাবি

তারা সংসদে ৮০টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন। তারা কি এ কথা জানেন না যে, ১৯৫৪ সালে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতিতে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভায় ৩০০ আসনের মধ্যে ৭২ জন হিন্দু নির্বাচিত হয়েছেন? পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা চালু থাকলে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতে এখন সংসদে হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতেন। ইংরেজ শাসনামলেই মুসলমানদের দাবিতে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি চালু হয়েছে। মুসলমানদের ভোটে মুসলমান প্রতিনিধি, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো। ঐ পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের মুসলিম ভোটাররা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেওয়ার সুযোগই পেত না। সংখ্যালঘুরাই তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার হাসিলের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করে থাকে। সে হিসেবে এ প্রথা চালু থাকলে হিন্দু ভোটারদের প্রতিনিধি এখনও সংসদে বহাল থাকত।

www.bjilibrary.com

কাদের দাবিতে ও চাপে ১৯৫৬ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আওয়ামী লীগ পৃথক নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচনপদ্ধতি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছে? প্রাদেশিক আইনসভার ৭২ জন হিন্দু সদস্যের চাপেই যে আওয়ামী লীগ এ অপকর্মটি করেছে, সে কথা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্যরা হয় তো জানেন না (না জানার কথা নয়), আর না হয় জ্ঞানপাপী হিসেবে না জানার ভান করছেন। এখন কোন্ মুখে তারা হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি তুলছেন? বাংলাদেশকে কি তারা মগের মুল্লুক পেয়েছেন? যখন যা খুশি চাইলেই দিতে হবে?

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি, হিন্দুগণ ৭২টি এবং বাকি সব আসনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়েছে। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম পার্টি শরীক ছিল। নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হয়েছে এবং শেরে বাংলা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী (Chief Minister) হয়েছেন। কয়েক মাস পর কেন্দ্রীয় সরকার এ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে পৃথক হয়ে গেলে ৭২ জন হিন্দু সদস্যের সমর্থনে যুক্তফ্রন্ট আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। সংসদে তখন হিন্দু সদস্যদের হাতে 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' ছিল। তাদের সমর্থন ছাড়া কোনো দল মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে না। তাই ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দু সদস্যদের দুয়ারে আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে ধরনা দিয়েছে।

হিন্দু সদস্যগণ তাদের সমর্থন পেতে হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি তিনটি শর্ত আরোপ করেছে :

১. আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক হওয়ার প্রয়োজনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিতে হবে।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. পৃথক নির্বাচনপদ্ধতির বদলে যুক্ত নির্বাচনপদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে সংযোজন করতে হবে।

আদর্শহীন ও ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামীনেতারা হিন্দুদের এসব দাবি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তাদের সমর্থনে প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছেন। হিন্দুরাই আওয়ামী লীগকে যুক্ত নির্বাচনপদ্ধতি প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছেন। অথচ আজ তারাই সংসদে আসন রিজার্ভ রাখার দাবি করছেন। পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি চালু থাকলে তো বিনা দাবিতেই তারা সংসদে অনেক আসন পেয়ে যেতেন।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদকে আমি পরামর্শ দিতে চাই যে, যদি সংসদে হিন্দু ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব চান তাহলে আপনারা জোরেশোরে পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি দাবি করুন। ৮০টি আসন সংরক্ষণের দাবি তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা আওয়ামী লীগ সমর্থন করবে না।

www.bjilibrary.com

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও যুক্ত নির্বাচন দাবি করেছিলেন কেন? যুক্ত নির্বাচন চালু হওয়ার দরুনই তো সংসদে হিন্দু জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব নেই। এমন আত্মহননের কাজ তারা কেন করেছিলেন? তারা কি নির্বোধ ছিলেন? মোটেই নয়। তারা আওয়ামী নেতাদের মতো আদর্শহীন ছিলেন না। তারা এ দেশে মুসলিম জাতীয়তাকে উৎখাত করে বাঙালি জাতীয়তা কায়েম এবং ইসলামী আদর্শের বদলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রবর্তন করার মহান লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এতে সম্প্রদায়গতভাবে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এ মহান ত্যাগের ফলেই আজ বাংলাদেশে মুসলিম নামধারী ইসলামবিরোধী বিরাট শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে।

হিন্দু নেতারা উপলব্ধি করেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলা সম্ভব নয়। তাদের ভোটের জোরে যদি এমন মুসলমান নামধারীদেরকে নির্বাচিত করা যায়, যারা মুসলমানদের একাংশ ও হিন্দুদের সব ভোট পেয়ে সংসদে যাবেন, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তাই যখন আওয়ামী নেতারা হিন্দুদের তিন দফা দাবি মেনে নিয়েছেন, তখন তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। এরপর থেকে তাদের সকল সাম্প্রদায়িক ও ইসলামবিরোধী দাবি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পূরণ হতে থাকে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সকল নির্বাচনে হিন্দু ভোটারগণ আওয়ামী লীগের নৌকায়ই ভোট দিয়ে আসছেন। তারা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ তাদের ঐসব অন্যায় দাবি মানা না হলে এমন এক চরম রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক হুমকি দিয়েছেন, যা কোনো সরকারের পক্ষে বরদাশ্‌ত করা স্বাভাবিক নয়। এ হুমকি যখন দেওয়া হয়েছে, তখন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদে দাপটের সাথেই বিরাজ করছিলেন। তার দাপট সরকারবিরোধী চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে তখন প্রয়োগ করা হচ্ছে; কিন্তু ঐ চরম রাষ্ট্রদ্রোহী হুমকিতে তিনি সামান্য প্রতিক্রিয়াও প্রদর্শন করেননি। এ জাতীয় হুমকি তো সরকারের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সরকারের ঐ আজব ভূমিকা কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে, শেখ হাসিনা তাদেরই পৃষ্ঠপোষক? যাদের পেছনে মুসলিম নামধারী নেতা-নেত্রীদের পরিচালনায় একটি বিরাট রাজনৈতিক দল রয়েছে, তারা কেন হুমকি দিতে দ্বিধা করবেন?

কী আজব ব্যাপার! বাংলাদেশকে ইসলামী কল্যাণরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টাকে যারা সাম্প্রদায়িকতা বলে চিৎকার জুড়ে দেন তারাই আবার হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকি দেন। বাংলাদেশ উদার মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হওয়াতে আওয়ামী লীগের ঘোর আপত্তি। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের হুমকিতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্য পরিষদের ব্যাপক কর্মতৎপরতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সদা সক্রিয়। বিশেষ করে ২০০১ সালের নির্বাচনে চারদলীয় জোট সরকার কায়েম হওয়ার পর তাদের তৎপরতা অত্যন্ত

www.bjilibrary.com

ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। তারা বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নামে বহু অঙ্গসংগঠন গড়ে তুলেছেন। এ সম্পর্কে কতক তথ্য এখানে পরিবেশন করা হচ্ছে :

খবরে প্রকাশ, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর একটি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি ভয়ঙ্কর নীল নকশা ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে এবং শুরু হয়েছে সর্বাত্মক আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডা। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গঠন করা হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদেরই আরেক অঙ্গসংগঠন 'হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ' (এইচআরসিবি) এবং এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হচ্ছেন জনৈক ধীমান চৌধুরী। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কাহিনী বানানোর মূল দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের এক এ্যাডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্র ঘোষ এই লক্ষ্যে গঠন করেছেন 'সাধনা সংসদ' নামে একটি সংগঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তুলছেন 'আশ্রম'। এরা কাজ করবেন ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদী, কালীসাধক সন্ত্রাসী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'-এর কায়দায়। ধীমান চৌধুরীরা 'হিউম্যান রাইটস ট্রিবিউন' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। এর সম্পাদকমণ্ডলীর ১২ জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও রাখা হয়নি। তবে রবীন্দ্র ঘোষরা সামাদ আজাদদেরকে ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে ভাষণ-বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কারণ, একজন মুসলমান নামধারী বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের গল্প বললে তা বিদেশিদের কাছে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। তবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, সাধনা সংসদ ইত্যাদি মৌলিক সংগঠনে মুসলমান নামধারী কাউকে রাখা না হলেও হিন্দুত্ববাদের অন্ধ স্তাবক মুসলমান নামধারীদেরও কায়দামতো ব্যবহার করার উদ্দেশে সম্প্রতি নিউইয়র্কে গঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ সেক্যুলার ফোরাম' নামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আরেকটি অঙ্গসংগঠন। এ ফোরামের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন 'জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন পরিষদ'-এর সেক্রেটারি সুভাষ মজুমদার। এর অন্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন বাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতা তপন জামান, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা সুকুমার রায় ও শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এ ফোরামটিও সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

বিরাট প্রশ্ন

ভারতের কোনো মুসলমান বা মুসলিম সংগঠন যদি এখানকার দত্তবাবুদের কায়দায় ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের ঘোষণা দিত, হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে এ রকম প্রোপাগান্ডার তাণ্ডব চালাত এবং ভারতের মাটিতে বসেই কোনো বিদেশি রাষ্ট্রকে ভারতে আক্রমণের জন্য আহ্বান জানাত, তাহলে সেই মুসলমানের বা মুসলমানদের পরিণামটা কী দাঁড়াত? সেক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, বজরং,

www.bjilibrary.com

আরএসএস, শিবসেনাসহ সমস্ত হিন্দুবাদী সংগঠন এমনকি তথাকথিত সেক্যুলার সংগঠনের অনেকেও কি মুক্ত খড়গ-কৃপাণ-ত্রিশূল নিয়ে ওইসব মুসলমানকে প্রকাশ্যে হত্যা করত না? ঠিক এ ধরনের স্পর্ধা প্রকাশ করলে তারা কি ভারতের সমস্ত মুসলমানকে হত্যা বা নির্মূল করার আগে কখনোই থামত? ভারত সরকার ও ভারতের পুলিশও কি সেক্ষেত্রে মুসলিম নিধনকারী হিন্দুত্ববাদীদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা দিত না, যেমন দিয়েছিল গুজরাটে পাইকারি ও একতরফা মুসলিম হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে?

অথচ এত অত্যাচার, নিপীড়ন ও গণহত্যা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানরা যা করা তো দূরের কথা, বলার চিন্তারও সাহস পায় না, তা-ই এখানকার দত্তবাবুরা এবং তাদের মুসলিম নামধারী বশংবদরা অবলীলায় করে যেতে পারছেন কিসের জন্য? তারা তা পারছেন এজন্য যে, দত্তবাবুরা হয়তো বিশ্বাস করেন যে, আওয়ামী লীগাররাই যেহেতু তাদের উপর এবং তাদের মূল শক্তি ভারতের উপর ১০০ ভাগ নির্ভরশীল, সেহেতু তারা তাদের যেকোনো কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা তো দূরের কথা বরং তাদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করতেই বাধ্য (যা আওয়ামী নেতারা সর্বদা করছেনও)। দত্তবাবুরা হয়তো এটাও মনে করে থাকতে পারেন যে, বিএনপি ও তার মিত্ররাও তাদের কর্মকাণ্ডে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টির সাহস পাবে না এই ভয়ে যে, তাদের গায়ে হাত দিলেই তাদের মূল শক্তি ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা এই সরকারকে চরমভাবে দেখে নেবে।

আওয়ামী লীগের কারণেই উপমহাদেশে মুসলমানদের দুর্দশা

একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যখনই বড় কোনো হামলা হয় তখন এখানে ঐক্য পরিষদ তাদের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়, যাতে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় এবং গুজরাটের আহমেদাবাদে মুসলিম গণহত্যা চলাকালে ঐক্য পরিষদ তাদের দাবি নিয়ে হৈচৈ শুরু করল।

ভারতে মুসলমানদেরকে গণহত্যা করা হলেও আওয়ামী লীগ কখনো প্রতিবাদ জানানো দূরের কথা, মৃদু আপত্তি করাও প্রয়োজন মনে করে না।

সারা বছরই ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে বাংলাদেশি মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা কখনো এর নিন্দা জানানো প্রয়োজন মনে করেননি।

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, মুসলিম নামধারী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে ভারতে তো মুসলিম জাতি উগ্রবাদী হিন্দুদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছেই, মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশে পর্যন্ত দত্তবাবুদের দাপটে মুসলমানরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

২৮২.

লন্ডনে অবস্থান

লন্ডনে এক মাস এগার দিন থাকা হচ্ছে। এ সময়ে আমার লেখার কাজ যথেষ্ট হয়েছে। সায়েটিকা রোগের কারণে হাঁটা-চলা করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় যতক্ষণ জেগে থাকি লেখাপড়ায়ই সময়টা কাটাই। নিকটেই চমৎকার পার্ক আছে, বাসার চারপাশের এলাকাও বেশ খোলামেলা। হাঁটা সম্ভব হলে অনেক সময় বাইরে বেড়াতে পারতাম। আমার স্ত্রী দুই নাতনী নাবা ও সাফাকে নিয়ে মাঝে মাঝে পার্কে বেড়াতে গিয়েছেন। সক্ষম হলে আমি হয়তো তার চেয়েও বেশি বেড়াতাম।

ঢেঁকির দশায় পড়লাম

একটা প্রবাদ আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।' ধান থেকে চাল বের করাই ঢেঁকির একমাত্র কাজ। ঢেঁকি যেখানেই থাকুক এর কাছ থেকে সবাই এ কাজই নেয়। এর দ্বারা অন্য কোনো কাজ হয় না।

আমি লন্ডন এলাম বেড়াতে। এখানকার ইসলামী সংগঠন জানতে পেরে প্রথম দিনই তাদের মজলিসে শূরার বৈঠকে কিছু বলার জন্য দাওয়াত দিল। গত বছর এখানে কয়েকটি প্রোগ্রামের জন্য ম্যানচেস্টার থেকে তিন বার আসতে হয়েছে। আমাকে এখানে পেয়ে অনেকে কয়েকটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে ফেলল।

গত কয়েক বছরে এখানকার ইসলামী সংগঠনগুলো জানতে পেরেছে যে, আমি জনসভায় বক্তৃতা করার চেয়ে ঘরোয়া বৈঠকে স্টাডি সার্কেলে আলোচনা বেশি পছন্দ করি। সারা জীবনই তো বক্তৃতা করলাম। ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর থেকে স্টাডি সার্কেল আকারে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে কাজ করছি। সবাই জেনে গেছে যে, এ ঢেঁকি থেকে এখন শুধু এ কাজই হয়ে থাকে।

ঢাকায় আমি ছাত্রছাত্রী, পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে প্রতি মাসে সাতটি করে স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করি। ১০/১২টি বৈঠকে কোর্স শেষ হয়। আবার নতুন ব্যাচের সাথে বৈঠক শুরু হয়।

এদেশে শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অন্যদিন প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয় না। অবশ্য ইস্ট লন্ডন মসজিদের অন্যতম ইমাম হাফেয মাওলানা আবুল হোসাইন খান অন্য একদিন ৭০/৭৫ জন ইমামের সাথে আমার প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল (এফআরসিএস) দুদিন প্রোগ্রাম করার পর আরো একদিন প্রশ্নোত্তরের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম নিতে বাধ্য করল। উপস্থিতির সংখ্যার দিক দিয়ে এরাই বেশি ছিল। ৭৫ জন পুরুষ ও ২০ জন মহিলা

www.bjilibrary.com

উপস্থিত ছিল। এরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য, সাথী, কর্মী কিংবা সমর্থক ছিল। মহিলারা তাদেরই স্ত্রী।

প্রশ্নোত্তরে তাদের একটা প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় হতে কত দিন লাগবে? এর জবাবে বললাম, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ এর বিরোধী নয় বলে বিজয়ের দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হয়েই আছে। দীন কায়েমের যোগ্য একদল লোক তৈরি হওয়ার শর্তটি প্রথম শর্ত। এ শর্ত পূরণ হলে আল্লাহ বিজয় দান করবেন বলে সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে ওয়াদা করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার কাজ জামায়াতে ইসলামী করছে। সর্বস্তরে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের লোক তৈরির কারখানা হলো ইসলামী ছাত্রশিবির। এ পর্যন্ত এ কারখানা থেকে যত সদস্য, সাথী ও কর্মী বের হয়েছে তারা সবাই ছাত্রজীবনের পরপরই জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয় হলে হয়তো এতদিনে ঐ শর্তটি পূরণ হয়ে যেত।

আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সবাই ছাত্র-অঙ্গন থেকেই এসেছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইসলামী ছাত্রশিবির জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

সর্বশেষে বললাম, আপনারা যারা উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে এসেছেন তারা ইসলামিক ফোরাম অব ইউরোপে সক্রিয় হয়ে নিজেদেরকে আরো যোগ্য করে গড়ে তুলুন, যাতে দেশে ফিরে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, তারা সবাই সংগঠনভুক্ত হয়েছেন। এখানকার পরিভাষায় তারা মেম্বার, একটিভ মেম্বার ও সিনিয়র মেম্বার। বাংলাদেশের পরিভাষায় সহযোগী সদস্য, কর্মী ও রুকন। আমি সবাইকে সিনিয়র মেম্বার হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম।

ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের লন্ডন শাখার দায়িত্বশীলগণের সাথে একটা প্রোগ্রাম করলাম। তারা ১০/১২ জন ছিলেন। এটাও স্টাডি সার্কেল ছিল।

আমার ছেলে ড. সালমান ফোরামের একটা ইউনিটের পরিচালক। এ ইউনিটে ১০ জন পেশাজীবী রয়েছেন। তাদের সাথে দুই দিন বৈঠক করতে হলো।

যদিও এটাকে 'ঢেঁকির দশা' বলে শিরোনাম দিয়েছি, এসব প্রোগ্রামে আমি অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করেছি। কারণ, যোগদানকারীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেখে আমার শ্রম সার্থক মনে হয়েছে।

কয়েকটি নতুন বই লেখা হলো

প্রথমেই অমুসলিমদের নিকট দীনের দাওয়াত দেওয়ার উপযোগী এ কটি বই লেখার প্রয়োজনবোধ করলাম। দাওয়াত পেশ করার হেকমত (কৌশল) সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলাম, আল্লাহর দরবারে দোয়াও করতে থাকলাম। আল্লাহর রহমতে চিন্তার লাইন ঠিক হয়ে গেল।

www.bjilibrary.com

এ বইয়ের নাম রেখেছি 'মানবজাতির স্রষ্টা যিনি বিধানদাতাও একমাত্র তিনি'। বড় বই ধরতেই অনেকে ভয় পায়। তাই আমার লেখা বেশিরভাগ বই-ই ছোট। এমনকি এক, দেড় ও দু'ফর্মার বই-ই অর্ধেক। আমি লক্ষ করেছি, বইয়ের স্টলে সাজিয়ে রাখা অনেক বইয়ের মধ্যে বড় বই কম লোকই হাতে নেয়। ছোট বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে, ভালো লাগলে কিনে নিয়ে পড়ে ফেলে।

ছোট ছোট বই রচনা করার মতো বিষয়ে সিনপসিস সংবলিত 'স্টাডি সার্কেল' নামে আমার একটি বই রয়েছে। যারা স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করেন তাদের এটা কাজে লাগে। জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্রীসংস্থা ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনে সংগঠনের প্রায় সর্বস্তরেই স্টাডি সার্কেল চালু আছে। বইটিতে ৫২টি বিষয়ে সিনপসিস রয়েছে। এর মধ্যে এ পর্যন্ত নয়টি বিষয় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়গুলোর নাম– ১. ইসলাম ও দর্শন, ২. কুরআন বোঝা সহজ, ৩. জীবন্ত নামায, ৪. মযবুত ঈমান, ৫. খিলাফতের দায়িত্ব ও পদ্ধতি, ৬. ইকামাতে দীন ও খেদমতে দীন, ৭. জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, ৮. বাইয়াতের হাকীকত, ৯. রুকনিয়াতের আসল চেতনা।

এ সময় আরো একটি সিনপসিসের বিষয় নিয়ে এক ফর্মার একটি পুস্তিকা লিখলাম। নাম 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে মোহাবিষ্ট হয়ে কতক লোক মনে করে, বিজ্ঞানই মানবজীবনের জন্য যথেষ্ট। তাই বিজ্ঞানের দৌড় কতটুকু তা আলোচনা করে নৈতিক জীব হিসেবে আল্লাহর বিধানের অপরিহার্যতা তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করলাম।

আরেকটি পুস্তিকার নাম দিয়েছি 'খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাক্কা কাফির হতে হবে'। আয়াতুল কুরসীর শেষে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'যে কেউ তাগূতকে অস্বীকার করেছে (তাগূতের প্রতি কুফরী করেছে বা তাগূতের কাফির হয়েছে) এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন মযবুত রশি ধরেছে, যা কখনো ছিঁড়বে না।' এতে জানা গেল, আল্লাহর মুমিন হতে হলে প্রথমে তাগূতের কাফির হতে হবে। আমার ধারণা, তাগূতের সঠিক অর্থ দীনদারদের মধ্যেও কম লোকই জানে। তাগূতকে না চিনলে এর কাফির কেমন করে হওয়া যাবে? তাই এর ব্যাখ্যা করা জরুরি মনে করেই বইটি লিখলাম।

'তাওহীদ শিরক ও তিন তাসবীহ'র হাকীকত' নামে আরো একটি চটি বই লিখলাম। ঈমানের মূলভিত্তি হলো তাওহীদ। এর সম্পূর্ণ বিপরীত হলো শিরক। শিরকের গুনাহ এমন মারাত্মক, তা আল্লাহ মাফ করেন না। শিরক সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে নেক লোকের ঈমানও দুর্বল থেকে যায়। তাই শিরকের সহজ ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা লেখা দরকার মনে করলাম। তাওহীদের শিক্ষা ও চেতনাকে সদা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই রাসূল (স) প্রতি নামাযের পর এমনকি ঘুমানোর সময়ও তিনটি তাসবীহ পড়ার জন্য তাকীদ দিয়েছেন। অনেকেই তা পড়েন; কিন্তু এর হাকীকত বোঝেন না।

www.bjilibrary.com

আমার লেখা 'চিন্তাধারা' নামক প্রবন্ধ সংকলন থেকে এ বিষয়ে লেখাটি এ বইয়ে যোগ করে বইটির নাম রাখলাম 'তাওহীদ ও শিরক এবং তিন তাসবীহর হাকীকত'।

ওলামায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করার জন্য একটা বই লিখলাম। সকল আলেমই কোনো না কোনো দিক দিয়ে দীনের খেদমতে লেগে আছেন। আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশে লাখ লাখ আলেমে দীন রয়েছেন। রাসূল (স) আলেমগণকে নবীগণের ওয়ারিশ আখ্যা দিয়েছেন। কুরআনে তিন তিনটি সূরায় আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর রাসূল (স)-কে তাঁর দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। এটাই রাসূল (স)-এর প্রধান ও আসল দায়িত্ব। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে 'মুজাহিদ আন্দোলন'-এর প্রধান দুই নেতা শহীদ হওয়ার পর উপমহাদেশে বড় বড় আলেম থাকা সত্ত্বেও ১০০ বছর পর্যন্ত দীনকে বিজয়ী করার কোনো আন্দোলন শুরু হয়নি। গোটা আলেমসমাজ ইংরেজ শাসনামলে দীনের ইলমকে হেফাযত করা এবং ঈমান ও চরিত্রের দিক দিয়ে মুসলিম জনগণকে সজাগ ও সচেতন রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁদের এ বিরাট অবদানের ফলেই দীর্ঘ ইংরেজ শাসনেও মুসলিম জাতির ঈমান রক্ষা পেয়েছে এবং কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা চালু রয়েছে।

ইংরেজদের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আলেমসমাজ দীনের খেদমতে আরো অগ্রসর হয়েছেন বটে, কিন্তু রাসূল (স)-এর ওয়ারিশের দায়িত্ব পালনে খুব কম আলেমই সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। আশির দশকের পূর্বে তো অল্পসংখ্যক আলেম ইকামাতে দীনের আন্দোলনে শরীক ছিলেন। আশির দশকে নতুন বেশ কয়েকটি ইসলামী রাজনৈতিক দল কায়েম হওয়া সত্ত্বেও আলেমসমাজ ব্যাপক সংখ্যায় এখন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি। শ্রদ্ধেয় আলেমসমাজের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যে ইকামাতে দীনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি বই লেখা জরুরি মনে করলাম। বইটির নাম রেখেছি 'মুহতারাম আলেমসমাজ ও দীনদারদের নিকট জরুরি প্রশ্ন' সাত দফা প্রশ্নমালা প্রথমে তুলে ধরে বইটিতে এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (স) ১৩ বছরে এক জামায়াত লোক তৈরি করে আরবে নেতৃত্বের পরিবর্তন সাধন করার মাধ্যমে দীনকে বিজয়ী করেছেন। কী পদ্ধতিতে তিনি লোক তৈরি করলেন সে বিষয়ে আলোচনা করে আলেমসমাজের নিকট আকুল আবেদন জানিয়েছি যে, নেতৃত্বের ময়দান বেদীনদের দখলে ছেড়ে না দিয়ে ইসলামী রাজনীতির ময়দানে এগিয়ে আসুন। কারণ, দীনদারদের নেতৃত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর দীন বিজয়ী হবে না। ভোটের ময়দানে জনগণ যাদেরকে পায় তাদেরকেই ভোট দেয়। এ ময়দানে জনগণ যোগ্য ও সৎ দীনদার পেলে তারা ইসলামী হুকুমত ও আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য ভোট দেবে।

স্টাডি সার্কেল আমাকে যা দিয়েছে

আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সাত বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবনের পর ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে দেশে যাওয়ার পর সেপ্টেম্বর মাসেই আমার উপর জামায়াতের আমীরের দায়িত্ব

www.bjilibrary.com

আসে। জামায়াতে ইসলামী তখনো প্রকাশ্যে তৎপরতা শুরু করতে পারেনি। নাগরিকত্বের সমস্যার কারণে আমীর হিসেবে আমার সাংগঠনিক সফরও শুরু করা যায়নি।

এ সময়ে স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। প্রথমেই মহিলা-অঙ্গন ও ছাত্রীমহলে এ কাজ শুরু করি। পাকিস্তান আমলে মহিলা শাখা গড়েই ওঠেনি। বাংলাদেশে কয়েকজন মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ইসলামী ছাত্রীসংস্থার কাজ শুরু হয়েছে মাত্র। মহিলা ও ছাত্রী নিয়ে ১০/১২ জনের একটা টিম তৈরি হলো। কিছু দিন পর ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে কুরআন স্টাডি সার্কেল শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে একবার দুই ঘণ্টা করে বৈঠক হয়। এক বছর পর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মহিলা ও ছাত্রীদের পৃথক পৃথক ব্যাচ করে নিতে হলো।

১৯৮০ সাল থেকে আমার সাংগঠনিক সফর শুরু হলেও স্টাডি সার্কেল চালুই রইল। একসময় নির্বাহী পরিষদেও কুরআন স্টাডি সার্কেল চলে। 'কুরআন বোঝা সহজ' বইটি এ স্টাডি সার্কেলেরই ফসল। ছাত্রদের স্টাডি সার্কেলে প্রথমে সিনপসিস আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

আমার জেলে যাওয়া ও বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে স্টাডি সার্কেল কয়েক বার মুলতবি থাকলেও স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়নি। ১৯৯৮ সালে ৫০ সদস্যবিশিষ্ট কর্মপরিষদকে নিয়েও স্টাডি সার্কেল শুরু করলাম। একদিন দু'বেলা চলার পর সিদ্ধান্ত হলো, একটানা তিন দিন আল ফালাহ্ মিলনায়তনে এ প্রোগ্রাম করা হবে। ১৯৯৯ সালে তিন-তিন বার তারিখ নির্ধারণ করেও শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর ২০০২ সালে সিলেট জোনের দশটি জেলায় মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্যদের সাথে দুই দিনব্যাপী স্টাডি সার্কেল চলে। ঐ বছরই রংপুর ও দিনাজপুর জোনের ১০টি জেলার সমন্বয়ে নীলফামারীতে দুই দিনব্যাপী প্রোগ্রাম চলে। জামায়াতে ইসলামীর ৭৮টি সাংগঠনিক জেলা ১০টি জোনে বিভক্ত। দুটো জোনে প্রোগ্রাম হওয়ার পর যেকোনো কারণেই হোক, অবশিষ্ট জোনে আর এ কর্মসূচি পালন করা যায়নি।

২০০৪ সাল থেকে সায়েটিকার কারণে সফর করা বন্ধ হয়ে গেল। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ঢাকায় এসে এক দিনের প্রোগ্রাম করল। এভাবে নরসিংদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলার প্রোগ্রামও ঢাকায় হলো।

স্টাডি সার্কেল এখনো চালু আছে। ছাত্রশিবির ও ছাত্রীসংস্থার কেন্দ্রীয় বডি এবং ঢাকা মহানগরীর চারটি ও কেন্দ্রীয় মহিলা শাখার একটি মিলে মোট সাতটি গ্রুপের সাথে স্টাডি সার্কেল চলছে। বিদেশে চলে আসায় বর্তমানে মুলতবি থাকলেও ফিরে গেলে আবার চালু হবে, ইনশাআল্লাহ।

www.bjilibrary.com

আমার ধারণা, ছোট-বড় মিলে আমার লেখা বইয়ের সংখ্যা যে এক শ'র কাছাকাছি পৌঁছল, তা সবই অব্যাহত স্টাডি সার্কেলের ফসল। স্টাডি সার্কেলের প্রয়োজনেই আমাকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পড়াশোনা করতে হয়েছে। প্রথমে সিনপসিস আকারে নোট করা হয়েছে। স্টাডি সার্কেলে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টা যখন পূর্ণতা লাভ করেছে বলে অনুভব করেছি, তখনই বই আকারে লিখে নিয়েছি।

চিন্তার জগতে আমার যতটুকু অর্জন তার ভিত্তি হলো মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফসীর ও বিশাল সাহিত্য। এ মূলধন নিয়েই গবেষণা করার সুযোগ পেলাম স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে। স্টাডি সার্কেল ছাড়া হয়তো চিন্তার রাজ্যে এ পরিমাণ সম্প্রসারণ সম্ভবপর হতো না।

'স্টাডি সার্কেল' বইটির বিশ্লেষণ

২২৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বইটিতে যেসব সিনপসিস রয়েছে, এর বিষয়গুলোকে ছয়টি শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে– ১. ঈমানিয়াত, ২. কুরআন অধ্যয়ন, ৩. ইসলাম, ৪. ইসলামী আন্দোলন, ৫. ইসলামী বিপ্লব, ৬. মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী। শুরুতে যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন সেসব বিষয়, 'ইসলামী দর্শন' ও 'ইসলামী বিজ্ঞান' নামে দুটো সিনপসিস ও বিশটি মৌলিক প্রশ্ন ইত্যাদি রয়েছে।

আমি জাতে লেখক বা সাহিত্যিক নই

আমি নিজেকে কখনো লেখক মনে করতাম না। জাতে আমি সাহিত্যিক নই। যারা জাত-সাহিত্যিক তারা সৃষ্টির তাড়নায় লেখেন। আমি তা নই। ছাত্রজীবনে কিছু দিন কাব্যরোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেসব কাউকেও দেখাইনি, হেফাযত করাও প্রয়োজন মনে করিনি।

স্কুলজীবন থেকেই পড়ার শখ ও অভ্যাস ছিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও কাব্য এবং নজরুলকাব্য পড়ার নেশা ছিল। নিজেকে সাহিত্যরসিক বা সাহিত্যমোদী মনে হতো। বিএ ক্লাসে ১০০ নম্বর বাংলা সকল ছাত্রের জন্যই বাধ্যতামূলক ছিল। তাতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় আমার প্রিয় শিক্ষক বিশ্বরঞ্জন ভাদুড়ী বাংলায় এমএ পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশ্য সে পরামর্শ গ্রহণ করিনি।

ইসলামী আন্দোলন আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে। দীনের দাওয়াত দিতে অভ্যস্ত হওয়ার পর মৌখিক দাওয়াত যথেষ্ট মনে হয়নি। আন্দোলনের জনশক্তিকে গড়ে তোলার প্রয়োজনেই লিখি। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখলে সাধারণ পাঠকের উপযোগী সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা করতাম না।

আমার ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) কর্তৃক রচিত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন ও তাঁর অন্যান্য বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার আমার ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস। ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মেনে নেওয়ার কোনো ধারণাই এর আগে আমার

www.bjilibrary.com

ছিল না। ইসলামের দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাহিত্য থেকেই পেয়েছি।

বিশ্বের অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদের সাহিত্য পড়ে মনে হয়েছে, মাওলানা মওদূদী (র)-এর সাহিত্যের পরিপূরক। অন্যদের সাহিত্যেও ইসলামের চমৎকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষার দিক দিয়ে নতুন এমন কোনো শিক্ষা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না, যা না হলে ইসলামের ধারণা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়।

আমার লেখা বইয়ের বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মওদূদী (র) যা লিখেছেন এর পুনরাবৃত্তি করে কিছু লেখা অর্থহীন। তাঁর চেয়ে উন্নত মানে লেখার যোগ্য কেউ থাকলে লিখতে পারেন। আমি যা লিখি, তাঁর লেখার পরিপূরক মনে করেই লিখি। যেমন–

১. তিনি 'ঈমানের হাকীকত' লিখেছেন। ঈমান সম্পর্কে যথার্থ ধারণা আমি সেখানেই পেয়েছি। আমি 'মযবুত ঈমান' লিখেছি। এতে ঈমান বা বিশ্বাসের টেকনিক্যাল সংজ্ঞা, বাস্তবজীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা, ঈমানদারের সাথে আল্লাহর কেমন সম্পর্ক হয়, ঈমানের দুর্বলতা কোন্ পথে আসে, মযবুত ঈমানের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করতে হয় ইত্যাদি আলোচনা করেছি।

২. তিনি 'নামায-রোযার হাকীকত' লিখেছেন। সেখান থেকে জীবনে প্রথম নামাযকে সঠিকভাবে চিনলাম। ছোট বয়স থেকে নামায পড়েছি। ঐ বই থেকে নামাযকে বুঝলাম ও নামাযের উদ্দেশ্য জানলাম। আমি লিখেছি 'জীবন্ত নামায'। আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে নামাযের হুকুম করেছেন তা পূরণের জন্য কীভাবে নামায আদায় করা প্রয়োজন, নামাযে দেহের মাধ্যমে যা করা হয় তাতে নামাযের দেহ গঠিত হয়। নামাযের রূহ কীভাবে গড়তে হয় তা আলোচনা করেছি। কারণ, মরা নামায দিয়ে উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না।

৩. 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা' পুস্তকে তিনি 'দীন' শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যা 'ইকামাতে দীন' বইয়েও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেছি। কিন্তু আমার বইয়ে দীনকে বিজয়ী করার জন্য কী কর্মসূচি প্রয়োজন, তা মাওলানার অন্যান্য লেখা থেকেই সংগ্রহ করে সংযোজন করেছি। বাংলাদেশে দীন বিজয়ী না থাকায় ইসলামের কী দশা আছে এবং দীন বিজয়ী হলে কী পরিবর্তন আসবে তা ব্যাখ্যা করেছি। আলেমসমাজ ইকামাতে দীনের ময়দানে এত কম অগ্রসর কেন, এর ঐতিহাসিক কারণও বিশ্লেষণ করেছি।

কুরআন সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। মাওলানা মওদূদী (র)-এর রচিত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' ঐ জ্ঞানভাণ্ডারকে এমনভাবে উন্মোচন করেছে, গবেষকগণ তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে এত সব বিষয়ে বই লিখতে পারেন, যেসব বিষয়ে মাওলানা পৃথকভাবে কোনো পুস্তক রচনা করেননি। এ জাতীয় বেশ কয়েকটি বই আমি রচনা করেছি, যার মূল চিন্তাধারা তাফহীমুল কুরআনে ছড়িয়ে আছে।

www.bjilibrary.com

২৮৩.

লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার

ম্যানচেস্টার শরহটি লন্ডন থেকে প্রায় দু শ' মাইল উত্তরে। গ্রেট ব্রিটেনে লন্ডনের পর এটাই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। পূর্বে বার্মিংহাম দ্বিতীয় ছিল, এখন তৃতীয়। পূর্বে উল্লেখ করেছি, এখানে 'ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ'-এর উদ্যোগে 'এক্সপো ইসলামিয়া' নামে গোটা ইউরোপভিত্তিক বিরাট সম্মেলন হওয়ার কথা। লন্ডনে সালমানের বাসায় দেড় মাস থাকার কথা ছিল। এ সম্মেলনের কারণে কয়েক দিন আগেই আসতে হলো। ২০ আগস্ট (২০০৬) সম্মেলনের তারিখ। আগের দিন (১৯ আগস্ট) বিকালে লন্ডন থেকে রওয়ানা হলাম।

আমার তৃতীয় ছেলে মোমেন নিজের গাড়িতে আমাদেরকে লন্ডন দিয়ে এসেছিল। ম্যানচেস্টার ফিরে এসে তারই বাসায় দু'সপ্তাহ আমাদের থাকার কথা। সে-ই গাড়ি নিয়ে এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছিল। সে ইসলামিক ফোরামের ম্যানচেস্টার শাখার দায়িত্বে আছে। সেখানেই সম্মেলন হচ্ছে। আগের দিন ওর পক্ষে লন্ডন যাওয়া সম্ভব নয় বিধায় আমাদের আসায় সমস্যা সৃষ্টি হলো। সালমানের গাড়ি থাকলে কোনো চিন্তা ছিল না। ওর গাড়ি ছিল বটে, কিন্তু লাইসেন্সের সমস্যার কারণে বিক্রি করে দিয়েছে। ট্রেনে আসতে হলে আমাকে ষ্টেশনে যাওয়া এবং ম্যানচেস্টারে ষ্টেশন থেকে বাসায় আসতে যেটুকু চলাফেরা প্রয়োজন তা কষ্টকরই বটে। আমার স্ত্রীর এত লাগেজপত্র নিয়ে চলা আরো কঠিন।

এ সমস্যার কথা জানতে পেরে খুলনার মাহবুব হোসাইন বাপ্পী নামে ইসলামিক ফোরামের এক সদস্য তার গাড়িতে করে আমাদেরকে নিয়ে এলেন। আমরা দুজন এবং সম্মেলনে যোগদানের জন্য সালমানও এল। স্কুল ছুটি বিধায় সালমানের বড় মেয়ে নাবা আমাদের সাথে আসবে জানতে পেরে ছোট মেয়ে সাফাও আমাদের সাথে আসার বায়না ধরল। অন্য সময় ওর আম্মার সাথে আসতে পারবে বলা সত্ত্বেও সে দাবি জানাতে থাকল, I want to go to Manchester right now. আধা ঘণ্টা পর্যন্ত সে অবিরাম এ কথা জপতে থাকল; তবে কাঁদেনি। আমি গাড়িতে উঠলাম। সে-ও ঐ কথা জপতে জপতে গাড়িতে উঠল। ওর মা কোলে করে নিয়ে গেল। বাসায় ওর বাপ-মা সব সময় বাংলা বলে। নাবাও বাপ-মায়ের সাথে বাংলাই বলে। সাফার সাথে নাবা বাংলা বলারই চেষ্টা করে; কিন্তু সাফা ইংরেজি বলতে থাকলে নাবাও বলতে বাধ্য হয়। তিন বছর দশ মাস বয়সে এ দেশে এসেছে। মাত্র তিন মাস নার্সারিতে যাতায়াত করেছে। তাতেই ইংরেজি বলা সহজ মনে করছে; বাংলা ভুলে যাচ্ছে।

বিকাল ৭টায় (মাগরিব সাড়ে আটটায়) রওয়ানা হয়ে রাত এগারটায় মোমেনের বাড়িতে পৌঁছলাম। যার গাড়িতে আসলাম তার বিস্তারিত পরিচয় জানলাম। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে (Law) অনার্স ও মাস্টার্স করে ব্যারিস্টারি পড়তে এসেছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিল। দুবছর আগে বিয়ে করেছে। শ্বশুর

www.bjilibrary.com

খুলনারই লোক। এ দেশে স্থায়ী বাসিন্দা। সে ম্যানচেস্টার থেকে ৩৬ মাইল দূরে লিভারপুলে থাকে। শিবির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদের আগমন উপলক্ষে লন্ডন গিয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী বন্ধু মাসুদকে নিজের গাড়িতে বেশ কয়েক দিন খেদমত করল। ফিরে আসার সময় আমাদের খেদমত করার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি হলো এবং দোআ চাইল। দোআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পূর্ণ সাফল্য দান করুন। মানুষটি দেখতে যেমন সুন্দর, কথা বলার ভঙ্গিও চমৎকার। তার এ খেদমতের কথা মনে থাকবে।

রাত এগারোটায় গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের দ্বিতীয় ছেলে আমীনকে পেলাম। সে আমাদেরকে দেখতে এল। গত বছর তিন মাস পুরোটাই ওর বাড়িতে ছিলাম। এর আগেও যত বার এসেছি সেখানেই থেকেছি। দু-এক দিনের জন্য অন্য ছেলেদের বাসায়ও গিয়েছি। এবার দুসপ্তাহ মোমেনের বাড়িতে থেকে আমীনের বাড়িতে যেতে হবে। আমীনের একমাত্র ছেলে রাইয়ান ওর দাদুর কাছে দাবি জানিয়ে গেল যে, তাড়াতাড়ি ওদের বাড়িতে যেতে হবে। সে ক্লাস এইটে পড়ে। ওর দাদু বললেন, গতবার তোমাদের বাড়িতে তিন মাস ছিলাম। এবার তোমার চাচাদের বাড়িতে বেড়াব। তোমাদের বাড়িতে এবার না গেলে চলে না? সে দাবি ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজি নয়। অবশ্য শেষের দিকে ৮-১০ দিন ওদের বাড়িতেই থাকার কথা। সেখান থেকে এয়ারপোর্ট খুব কাছে।

Expo Islamia

২০ আগস্ট (২০০৬) ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ-এর উদ্যোগে 'এক্সপো ইসলামিয়া' নামে দিনব্যাপী এক মহাসম্মেলন হয়ে গেল। বেলা এগারোটায় শুরু হয়ে তিন সেশনে বিকাল ৭টায় শেষ হলো। এখানে এখন মাগরিব সাড়ে আটটায়। আমি ১টায় বিরতি হলে বাসায় এসে গোসল, নামায ও খাওয়া সেরে বিকাল ৪টা থেকে হাজির ছিলাম। ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলাম না।

এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা হলো ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ, ইয়াং মুসলিম অর্গানাইজেশন (ফোরামের যুব ও ছাত্রমহল) এবং মুসলিমাত (ফোরামের ছাত্রীমহল)। 'মুসলিম এইড' নামক এনজিও প্রতিষ্ঠান এ মহৎ উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে। ইসলামিক ব্যাংক অব ব্রিটেনও অন্যতম সহযোগী।

আমাদের দেশে এ জাতীয় সম্মেলনে দর্শক ও শ্রোতারা টিকিট কিনে আসে না। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে টিকিটের ব্যবস্থা থাকে এবং টিকিট কিনেই সবাই দেখতে যায়। কিন্তু কোনো সম্মেলনে, বিশেষ করে ইসলামী সম্মেলনে জনগণ টাকা খরচ করে যোগদান করে না। কিন্তু এ দেশে দর্শক ও শ্রোতাদেরকে টিকিট কিনতে হয় এবং জনগণ এতে অভ্যস্ত হওয়ায় কোনো সমস্যা হয় না। হলে আসনের অবস্থান অনুযায়ী টিকিটের বিভিন্ন হার নির্ধারিত থাকে। আমাদের দেশে চাঁদা তোলা হয় সম্মেলনের খরচের জন্য। এ দেশে টিকিট বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করা যায়।

www.bjilibrary.com

সম্মেলনস্থলের বিবরণ

'ম্যানচেস্টার ইভিনিং নিউজ এ্যারিনা' (Men Arena) নামক বিশাল হলে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। হলটিতে তিনদিকে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত গ্যালারি রয়েছে। মাঝখানে সমতল হল। এতে আট হাজার আসন রয়েছে। গোটা হলটাই কালো পর্দা দিয়ে ঘেরা। পর্দার বাইরে আরো ১০ হাজার লোকের জন্য আসন রয়েছে। এ সম্মেলনের জন্য ৮ হাজারের হলটুকুই ভাড়া নেওয়া হয়েছে একদিনের জন্য। ভাড়া ৩২ হাজার পাউন্ড।

আমি ১১টায় মেহমানদের জন্য নির্দিষ্ট হলের গেটে পৌছলে নাবীল নামে উদ্যোক্তাদের একজন আমাকে নিয়ে গেল। হলের ভেতরে ঢুকে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, গোটা হল অন্ধকার। শুধু স্টেজে কিছু আলো দেখা গেল। আমাকে স্টেজের মাঝামাঝি বরাবর হলের প্রথম সারিতে নিয়ে বসাল। তখন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের কর্মসূচি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা হচ্ছিল।

স্টেজ বিরাট হলেও আমাদের দেশের মতো সাজানো নয়। আমরা সম্মেলন করলে মঞ্চে আমন্ত্রিত বক্তাদের আসন এবং মধ্যস্থলে সভাপতির আসন রাখা হয়। তাদের সামনে দীর্ঘ টেবিল থাকে। টেবিলটি ফুল দিয়ে সাজানো হয়। মঞ্চ থেকে কথা বলার জন্য টেবিলেও মাইকের ব্যবস্থা রাখা হয়। এক পাশে বক্তার জন্য মাইক ও উঁচু ছোট্ট টেবিল রাখা হয়। এখান থেকেই মঞ্চ পরিচালক বক্তাদের নাম ঘোষণা করলে বক্তা সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করেন। গোটা স্টেজ আলোকিত থাকে।

এখানে মঞ্চের মাঝখানে মাইক ও খুব ছোট উচ্চ টেবিল দেখলাম। পাদপ্রদীপ থেকে একটি মাত্র আলো মাইকের দিকে নিক্ষিপ্ত, যাতে শুধু বক্তাকে দেখা যায়। আর বাকি মঞ্চও অন্ধকার। বক্তার জন্য রক্ষিত মাইকের পেছনে কালো ও সাদা রঙের পর্দার পেছন থেকে বক্তা মাইকের সামনে হাজির হন এবং বক্তৃতা শেষে ঐ পর্দার পেছনে চলে যান।

সম্মেলনে কেউ সভাপতিত্ব করেন না। বিভিন্ন সেশনে বিভিন্ন ঘোষক মাইকে ঘোষণা দিয়ে পর্দার পেছনে চলে যান। মঞ্চে বক্তা একাই থাকেন। বক্তা তার শ্রোতাদেরকে দেখতে পান না। মঞ্চের সামান্য আলোর আভায় বোঝা যায় যে হলভর্তি মানুষ রয়েছে। বক্তার সাথে শ্রোতাদের সম্পর্ক একমাত্র তখনই টের পাওয়া যায়, যখন হল থেকে বক্তার সালামের জবাব দেওয়া হয় অথবা যখন বক্তার কোনো কথায় শ্রোতারা হাততালি দেয় বা সমর্থনসূচক হৈচৈ আওয়াজ করে। কোনো কোনো বক্তা সালামের জবাব ক্ষীণ আওয়াজে হলে বারবার জোরে সালাম দিয়ে সবাইকে জোরে জবাব দিতে বাধ্য করেছেন।

অতিথি বক্তাদের পরিচয়

১. প্রধান অতিথি ডক্টর জাকির নায়েক। তাঁর পূর্ণ নাম কার্ডে দেখলাম ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক। প্রেসিডেন্ট, ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন, মুম্বাই (বোম্বে) ভারত। গত (বিংশ) শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার

www.bjilibrary.com

নাগরিক আহমদ দিদাত গোটা বিশ্বে ইসলাম ও কুরআনের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করেছেন এবং বড় বড় খ্রিস্টান পাদ্রিদের সাথে বিতর্কে বাইবেল আল্লাহর বাণী নয় বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কুরআনের আয়াতসংখ্যা এবং বাইবেলের পংক্তিসংখ্যাসহ মুখস্থ উদ্ধৃত করে আলোচনা দ্বারা শ্রোতাদেরকে বিস্মিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ করতেন। তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ায় এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে (একবিংশ) আল্লাহ্ তাআলা মরহুম আহমদ দিদাতের চেয়েও বড় এক প্রতিভা সৃষ্টি করেছেন, যিনি ভারতীয় নাগরিক। তিনিই ডা. জাকির নায়েক। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তাঁকে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্র গীতা, উপনিষদ ও রামায়ণ আয়ত্ত করতে হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এমন অলৌকিক স্মৃতিশক্তি দান করেছেন, যাতে মনে হয় যে তিনি এক জীবন্ত কম্পিউটার।

তিনি যখন বক্তব্য পেশ করেন তখন তাঁর হাতে নোট করা কোনো কাগজ থাকে না। কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় তিনি সূরার নাম ও আয়াতের নম্বর মুখস্থ বলতে থাকেন। এমনকি হাদীসের কথা বলার সময় বুখারী শরীফের হাদীস নম্বরও উল্লেখ করেন। বাইবেল, গীতা ও উপনিষদের উদ্ধৃতিও চ্যাপ্টার ও পংক্তি নম্বরসহ বলতে থাকেন। এটা সত্যিই অসাধারণ ব্যাপার।

বাংলাদেশেও টেলিভিশনে তাঁর রেকর্ড করা বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর দেখা ও শোনার সুযোগ পেয়েছি। ইংল্যান্ডেও তাঁর ভিডিও ইসলাম চ্যানেলে শুনেছি। বোম্বেতে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত বিশাল হলে হাজার হাজার নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামের ভিডিও ক্যাসেট সারা বিশ্বের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

এখানকার সম্মেলনে এ অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সশরীরে দেখা ও সরাসরি তাঁর মুখে বক্তৃতা শোনার আগ্রহ আমার মতো সকলেরই থাকার কথা। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর মতো প্রতিভাকে ভারতে পয়দা করে ভারতীয় মুসলমানদেরকে বিরাট সাহায্য করেছেন। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি যেভাবে সেখানে মুসলিম জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চাচ্ছে এবং সরকারও যেভাবে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, তাতে মুসলিমদের হীনম্মন্যতায় ভোগার আশঙ্কা প্রবল। ড. জাকির নায়েক ভারতীয় মুসলিমদের বিরাট গৌরব এবং প্রেরণার মহান উৎস।

তাঁর জন্য আয়োজিত মাহফিলে অমুসলিমরাও বেশ সংখ্যায় আসেন। প্রশ্নোত্তর মাহফিলে তারাও প্রশ্ন করেন। ড. নায়েক প্রশ্নের জবাবে কুরআন ও হাদীস ছাড়াও বলিষ্ঠ যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করে শ্রোতাদেরকে পরিপূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেন।

www.bjilibrary.com

পেশায় তিনি ডেন্টিস্ট হলেও বর্তমানে পেশার জন্য সময় দিতে অক্ষম। ইসলামের খেদমতে তিনি নিজের দেশে তো ব্যস্ত থাকেনই, সারা বিশ্বের ডাকেও তাঁকে সাড়া দিতে হয়। তিনি ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী; মাতৃভাষা হিন্দিতেও সমান যোগ্য।

২. প্রফেসর ড. জামাল বাদাভী। জন্মগতভাবে মিসরীয়। আমেরিকায় পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে কানাডায় সেন্ট ম্যারি ইউনিভার্সিটি হালিফেক্স-এর প্রফেসর। তিনি ইসলামিক জুরিডিক্যাল (ফিক্হ) কাউন্সিল অব নর্থ আমেরিকা, ইউরোপিয়ান কাউন্সিল অব ফাতওয়া এন্ড রিসার্চ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ইসলামিক স্কলার্স-এর সদস্য। সত্তরের দশকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে সহবক্তা হিসেবে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। এ সম্মেলনে দীর্ঘদিন পর দেখা হলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর বক্তৃতার সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম বিধায় দুঃখবোধ করছি।

৩. ড. আয্যাম তামিমী। তিনি অধিকৃত ফিলিস্তিনের হেবরনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি লন্ডনে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক পলিটিক্যাল থট-এর ডাইরেক্টর। তিনি অনেক বই লিখেছেন। প্যালেস্টাইনে ইসরাইলি দখলের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠ। তাঁর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়নি।

৪. মিস ইভনি রিডলে (Yvonne Ridley)। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বলে মনে হয়। এ মহিলা সানডে এক্সপ্রেস পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবেই তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু দিন তালেবানদের কাছে বন্দি ছিলেন। তালেবানদের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছেন এবং একনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্বামী ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ায় তিনি তালাক নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি 'In the Hands of Taliban' ও 'Ticket of Paradise' নামে দুটো বই রচনা করেছেন। তিনি বর্তমানে 'ইসলাম চ্যানেল' নামে টেলিভিশনের 'The Agenda' নামক প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন। পূর্ণ দেহ আবৃত অবস্থায় পরিপূর্ণ হিজাব পালন করে চলেন। শুধু চেহারাটুকু খোলা থাকে।

৫. ইমাম যোহারী আবদুল মালেক। তিনি মুসলিম সোসাইটি অব ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্ট। হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি মুসলিম চেপলেইন-এর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নওমুসলিম; যুবকদের নিকট খুবই জনপ্রিয় একজন বলিষ্ঠ বক্তা।

৬. মিসেস সারা যোসেফ। তিনি একজন ব্রিটিশ নওমুসলিম। 'ইমেল' নামক একটি ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা। বয়স চল্লিশের কম নয়। গত ১৫ বছর ধরে তিনি ইসলাম সম্পর্কে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। ২০০১ সালে তিনি বিবিসির 'ইসলাম সিরিজ'-এ বিশেষ গবেষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৯-২০০০ সেশনে তিনি বাদশাহ

www.bjilibrary.com

ফয়সাল ফাউন্ডেশন বৃত্তি লাভ করেছেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে 'ডায়ালগ'-এর ব্যবস্থা করায় এবং মহিলাদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করায় ২০০৪ সালে ব্রিটিশ রানীর জন্মদিবসের সম্মানিত ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁকে OBE উপাধি দেওয়া হয়। বাংলাদেশি একজন ব্যারিস্টার তাঁর স্বামী।

৭. শায়খ মুহাম্মদ আহমদ সা'দ। তিনি মিসরের অধিবাসী। তিনি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেছেন। ইসলাম অনলাইন নামে একটি ওয়েব সাইটে Ask about Islam নামক পৃষ্ঠায় তিনি উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

৮. ইমাম জিয়াউল্লাহ খান। আফগানিস্তানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। কানাডায় তিনি ইসলামিক স্টাডিজ ও ফিক্হ শিক্ষা দান করেন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে তিনি ব্যাপক সফর করে ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। শ্রোতাদেরকে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম। কানাডার 'সেন্টার ফর ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট'-এর তিনি ডাইরেক্টর।

উপরিউক্ত অতিথি বক্তাগণ ছাড়া যারা বক্তব্য রেখেছেন, তাঁরা হলেন–

১. ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের প্রেসিডেন্ট হাবীবুর রহমান। ছাত্রজীবনে তিনি ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্তমানে তিনি লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার।

২. ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী। তিনি উক্ত ফোরামের সাবেক প্রেসিডেন্ট। বর্তমানে ব্রিটেনের প্রায় সকল ইসলামী সংগঠনের ছাতা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত 'মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেন' (MCB)-এর সেক্রেটারি জেনারেল।

৩. দেলাওয়ার হোসাইন খান, সেক্রেটারি জেনারেল, ইসলামিক ফোরাম ইউরোপ। তিনি লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ডাইরেক্টর। তিনিই স্বাগত বক্তব্য পেশ করেছেন।

৪. অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত নন। সম্মেলনের আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি এ দেশে বেড়াতে এসেছেন। সম্মেলনের সময় এখানে অবস্থান করায় তাঁকে কিছু 'নসিহত' করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মুদ্রিত প্রোগ্রামেও সে হিসেবেই তাঁর নাম রয়েছে।

প্রধান বক্তার আলোচ্য বিষয়

প্রধান বক্তার নাম মঞ্চ থেকে ঘোষণা করার সাথে সাথে গোটা হলে হাততালি ও উচ্ছ্বাসের আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়। ড. জাকির নায়েক মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান। হালকা-পাতলা গড়নের মাঝারি উচ্চতার দেহটিতে সাধারণ পোশাক। মাথায় ক্রুসে বুনানো সাদা টুপি। পরনে স্যুট ও টাই। সালাম দিয়ে বক্তব্য শুরু করে বললেন, আমার আলোচ্য বিষয় 'Are the Muslims only terrorists?' অর্থাৎ, 'শুধু কি মুসলমানরাই সন্ত্রাসী?'

www.bjilibrary.com

ভূমিকায় তিনি বললেন, বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে, All Muslims are not terrorists, but all terrorists are Muslim. অর্থাৎ, সকল মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, কিন্তু সকল সন্ত্রাসীই মুসলমান। সম্প্রতি তাঁর দেশ ভারতের গুজরাটে বোমা বিস্ফোরণের পর এ প্রচার সেখানেও ব্যাপক। তাই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে, ইতিহাস থেকে সেসব তথ্য পরিবেশন করে আমি প্রমাণ করতে চাই, গত দু শ' বছরে যত সন্ত্রাস হয়েছে, তা অমুসলিমদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। অবশ্য সম্প্রতি কতক পথভ্রষ্ট মুসলিম সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা অবশ্যই নিন্দনীয়। কোনো নির্দোষ মানুষ হত্যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। কুরআন ঘোষণা করেছে, বিনা দোষে কোনো মানুষকে হত্যা করা গোটা মানবজাতিকে হত্যা করার মতো অপরাধ। এ জাতীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। অনুরূপভাবে আমরা প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, ইরাক ও লেবাননে নির্দোষ জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে আরো বেশি তীব্র নিন্দা জানাই।

এটুকু ভূমিকার পর তিনি দু শ' বছরের সন্ত্রাসী ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে থাকলেন। তাঁর হাতে কোনো নোট করা কাগজ ছিল না। তিনি বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির প্রমাণ দিলেন। কোন্ সালের কোন্ তারিখে বিশ্বের কোথায় কোথায় সন্ত্রাস হয়েছে, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা, বিশিষ্ট নিহত ব্যক্তিদের নাম এমনকি হত্যাকারীর নাম ইত্যাদি তথ্য মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন। আমি বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দোআ করতে থাকলাম, আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর এ অলৌকিক বান্দাহকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন।

Fundamentalism (মৌলবাদ) শব্দের ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি একজন মৌলবাদী হিসেবে গৌরববোধ করেন। Extremism (চরমপন্থা) শব্দের ব্যাখ্যা করে চরম রসিকতা করে বললেন, আমি Extremely good, extremely kind, extremely dutiful. তাই Extreme হলেই দূষণীয় হতে পারে না।

তাঁর বাচনভঙ্গি বড়ই চমৎকার। আবেগের কোনো উত্থান-পতন নেই। উত্তেজিত হয়ে বা চিৎকার করে কথা বলেন না। যুক্তিই তাঁর প্রধান হাতিয়ার। তাঁর বক্তৃতার সময়ই সবচেয়ে বেশি হাততালি পড়েছে।

মিস ইভনি রিডলি

ড. জাকির নায়েকের পর সবচেয়ে বেশি হাততালি কুড়িয়েছেন মিস রিডলি। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও জোরদার বক্তব্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী বলে ঘোষণা করেছেন।

সারা জোসেফ

তিনিও অত্যন্ত বলিষ্ঠ বক্তা। তিনি তিন-তিন বার সালাম দিয়েছেন। প্রথমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট না হয়ে আরো জোরে সালাম দেন। এ জবাবেও সন্তুষ্ট না হয়ে চিৎকার করে আবার সালাম দিয়ে শ্রোতাদেরকেও উচ্চৈঃস্বরে জবাব দিতে বাধ্য করেছেন।

www.bjilibrary.com

তিনি মুসলিম জাতিকে হীনম্মন্যতার ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের পতাকাবাহী হিসেবে বিশ্বে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন; ইসলামকে জানা ও মানার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি পূর্ণ হিজাবপরিহিতা ছিলেন।

আমি সকল বক্তার বক্তব্য শোনার সুযোগ পাইনি। ইমাম যোহারীর বক্তব্যের পরপরই আমার বক্তব্য রাখার কথা। তাই আমাকে মঞ্চে নিয়ে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখায় তাঁর বক্তৃতার আওয়াজ শুনলেও কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল Muslim Youth and the Crisis of Identity Today.

ড. আয্‌যাম তামিমীর বিষয় ছিল Justice- A call to Humanity. শাইখ আহ্‌মদ সা'দ-এর আলোচ্য বিষয় Treading the Balanced Path. প্রফেসর জামাল বাদাভীর বিষয় ছিল Jihad- A Call to Humanity.

এ সম্মেলনের প্রতি আমার আগ্রহের প্রধান কারণ ছিল ডাক্তার জাকির নায়েকের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও তাঁকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য সম্মত করা।

২৮৪.

ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ

আমার বড় নাতি নাবীল সম্মেলনের তৃতীয় সেশনে মঞ্চপরিচালক ছিল। ডা. জাকির নায়েকের নাম সে-ই ঘোষণা করেছে। নাবীলকে বলে রেখেছিলাম, ডা. জাকিরের সাথে আমি সাক্ষাৎ করতে চাই। ডা. জাকিরকে হলে প্রথম সারিতে আমার আসনের পাশে এনে বসানো হলো। পরম আবেগের সাথে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন করে বললাম, আপনার একজন ভক্ত শ্রোতা হিসেবে আপনার সাথে সাক্ষাতের দীর্ঘ আশা পূরণ হলো। ইংরেজিতেই কথা শুরু হলো। আমি বললাম, ভারতীয় মুসলমান ও পাকিস্তানিদের সাথে আমি ইংরেজির চেয়ে উর্দুতে কথা বলা বেশি পছন্দ করি। তিনি এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন।

আমি বললাম, এত অল্প সময়ে বেশি কথা বলার সুযোগ নেই। আপনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আল্লাহ্ ইসলামের খেদমতের জন্য আপনাকে বিশেষ যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বললেন, দোআ করবেন। বললাম, আপনার জন্য অন্তর থেকে দোআ আসে। আপনাকে বাংলাদেশে পেতে চাই। তিনি বললেন, যাব ইনশাআল্লাহ্। বললাম, কীভাবে আপনাকে বাংলাদেশে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে দেশে গিয়ে পরামর্শ করে আপন্যাকে জানাব। তিনি তাঁর কার্ড আমাকে দিলেন। বললাম, কোনো অরাজনৈতিক ফোরামের পক্ষ থেকেই আপনাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে চাই। তিনি খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। মঞ্চে কর্মসূচি চলছে বলে বেশি সময় তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করা গেল না।

তাঁর বক্তৃতার কিছুক্ষণ পর আরেক নাতি উসামা (ভলান্টিয়ার) আমাকে ভিআইপি রুমে নিয়ে গেল। সেখানে ডা. জাকিরকে নাশতা করতে দেখলাম। অনেকে তাঁকে ঘিরে

www.bjilibrary.com

আছে। তাঁর সাথে ফটো তুলছে। তিনি কোথাও যেতে ব্যস্ত ছিলেন। এক ফাঁকে তাঁর বয়স জানতে চাইলে বললেন, ৪০ হয়ে গেছে, বুড়িয়ে যাচ্ছি। বললাম, নবুওয়াতের বয়স শুরু হলো মাত্র।

আমার বক্তব্য

সময় নির্ধারিত ছিল ১২:৫০ থেকে দশ মিনিট। মঞ্চপরিচালক জানালেন, নয় মিনিট পর লাল বাতি জ্বলে উঠলে আরেক মিনিটে শেষ করতে হবে। আমি এ রকম সময় মেপে বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত নই। বক্তৃতা শেষ করার তাকীদকে আমি রীতিমতো অপমানকর মনে করি। তাই ঠিক করলাম, লাল বাতি জ্বলার আগেই বক্তব্য শেষ করে দেব।

আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রতি শুকরিয়া জানালাম। প্রথমেই বললাম, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের মধ্যে যাদেরকে দীনের কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, তাদেরকে মনে রাখতে হবে, ইসলাম আমাদের মুখাপেক্ষী নয়; বরং আমরাই ইসলামের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ স্বয়ং ইসলামের রক্ষক। আমরা দীনের কাজ না করলে আল্লাহ্ অন্য লোকদেরকে দিয়ে দীনের খেদমত নেবেন। তাই আমাদের প্রতি আল্লাহর বড় মেহেরবানি যে তিনি আমাদেরকে দীনের কাজে লাগিয়েছেন।

এককালে অল্পসংখ্যক মানুষ দীনের পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণাবলি ও ইসলামী গুণাবলির সমন্বয় হওয়ায় তাঁরা বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে দেড় শ' কোটি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আমরা নির্যাতিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত। উম্মতের এ অধঃপতনের প্রধান কারণ তিনটি :

১. মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলিম হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা মুশরিক ছিল, নূহ (আ)-এর পিতা মুশরিক ছিল, নূহ (আ)-এর এক ছেলে কাফির ছিল। মুসলিম হওয়ার জন্য ঈমান, ইলম ও আমলের কতক গুণের অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক। এসব গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত হতে পারে না। ডাক্তারের সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে ডাক্তার হয় না।

২. আলেমসমাজের অধিকাংশই ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে গণ্য করে ইসলামের খেদমত করছেন। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মানবসমাজে দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলন করা প্রয়োজন মনে করছেন না। আলেমসমাজই মুসলিম জনগণের শিক্ষক। জনগণ দীন সম্পর্কে যতটুকুই জানে তা আলেমসমাজেরই অবদান। তাই তারাই যদি ইকামাতে দীনের গুরুত্ব না বোঝেন তাহলে জনগণ কার কাছ থেকে শিখবে?

৩. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের শাসনক্ষমতা মুসলিমদের হাতেই রয়েছে; কিন্তু তারা মুহাম্মদ (স)-কে শাসক হিসেবে অনুকরণ করছেন না। মুহাম্মদ (স)-কে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের জন্য সর্বক্ষেত্রে সুন্দরতম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মুসলিম শাসকরা যদি রাসূল (স)-এর আদর্শ অনুসরণ না করেন তাহলে

www.bjilibrary.com

বিশ্ববাসী ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোথা থেকে ধারণা লাভ করবে? মুসলিম শাসকরা অমুসলিম শাসকদের অনুকরণ করে এ ধারণাই দিচ্ছেন যে, ইসলাম শুধু ধর্ম, জীবনবিধান নয়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আট মিনিট হয়ে গেছে। ইসলামের কর্মীদেরকে ঐ তিন অঙ্গনেই কাজ করতে হবে বলে ইশারা করেই কথা শেষ করলাম। বিস্তারিত বলার সময় পেলাম না। আশা করি আমার ইঙ্গিত দ্বারা তারা উপলব্ধি করেছেন যে–

১. প্রত্যেক মুসলমানকেই ইসলামী সংগঠনভুক্ত হয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে তাকীদ দিতে হবে।

২. প্রত্যেক আলেমকেই ইকামাতে দ্বীনের ফরয দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করতে হবে।

৩. যারা যে মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ থেকে ইউরোপে এসেছেন তাদেরকে নিজ নিজ দেশে ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলনকে বিজয়ী করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

ইসলামের খাদেমগণকে ঐ তিন ময়দানেই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সম্মেলনে গান ও বিনোদন

এ সম্মেলনে প্রচুর গানের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি ইসলামী গানের পেশাদার সংগঠনকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যুবসমাজকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কতক কমিকও পরিবেশন করা হয়েছে।

কানাডা, আমেরিকা ও ব্রিটেনের জনপ্রিয় ইসলামী গায়কদের ইংরেজি গান এবং সিরিয়া ও জর্দানের নামকরা ইসলামী গায়কদের আরবী গান সম্মেলনে পৃথক মাত্রা যোগ করেছে। তিনজন পাকিস্তানি ও একজন ইংরেজ নওমুসলিমের টিম দফ বাজিয়ে উর্দু, ইংরেজি ও আরবী গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দিয়েছে। বেশ কিছু গানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রাধান্য পেয়েছে।

আমার এক নাতি নাযীল চারজন সাথী নিয়ে প্রথমে উর্দু ও আরবীতে আল্লাহু আল্লাহু গানটি পরিবেশন করেছে এবং দ্বিতীয় গানটি প্রথমাংশে বাংলা ও দ্বিতীয়াংশে ইংরেজিতে পেশ করেছে। প্রধান গায়ক সে-ই, বাকি চারজন কোনো কোনো পংক্তিতে শরীক হয়েছে। ঐ চারজনের মধ্যে আনাস নামক আরো এক নাতি শরীক ছিল। দফ না বাজিয়েও খালি গলায় দুটো গান গেয়ে সে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

গায়ক নাযীল

ইংল্যান্ডের একটি ইসলামী গানের ক্যাসেট তৈরির কোম্পানি সম্প্রতি আমেরিকার বিভিন্ন শহরে গানের অনুষ্ঠান করে নাযীলের গান ক্যাসেটবদ্ধ করেছে। ঐসব অনুষ্ঠানে আরবী ও ইংরেজি গানের জন্য বিখ্যাত সামী ইউসুফ প্রধান গায়ক। ম্যানচেস্টারে সে দিন ইন্টারনেটে আমেরিকার ঐ অনুষ্ঠান দেখলাম। নাযীলকে ওর মরহুমা আম্মা ইসলামী

www.bjilibrary.com

গানের ব্যাপারে উৎসাহ দিত। নাযীলের মামা ঢাকার কণ্ঠশিল্পী সাইফুল্লাহ মানসুর ওর গানের শিক্ষক ও প্রেরণার উৎস। ইংরেজি ও আরবী গানে বিখ্যাত সামী ইউসুফ নাযীলের বন্ধু। সামী ইউসুফের পিতা উস্তায ফিরোজ কবি ও সুরকার। নাযীলের দশটি গানের ক্যাসেট বের হয়েছে। এর আটটি গানের সুর দিয়েছেন উস্তায ফিরোজ। এসব গানের মধ্যে ইংরেজি, আরবী, উর্দু ও বাংলা গান রয়েছে। সে আরবী লেহানে কুরআন তিলাওয়াত করে। দু'বছর পড়া মুলতবি করে ফ্রান্সে আরবদের এক প্রতিষ্ঠানে সে আরবী ভাষা আয়ত্ত করেছে। বর্তমানে সে আরবীর শিক্ষক। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে অনেক ছাত্র ফি দিয়ে ওর কাছে আরবী শেখে।

দুই বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মুলতবি করে গত বছর থেকে আবার ফিজিক্সে অনার্স পড়া শুরু করেছে। এবার দ্বিতীয় বর্ষে আছে। আমি তাকীদ দিয়েছি, যাতে ডিগ্রি পাস করে নেয়। ইসলামী গায়ক হতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ডিগ্রিটারও প্রয়োজন রয়েছে।

মা মুন্নীর সন্তানদের বর্তমান অবস্থা

আমার বড় বৌমা মুন্নী তিন বছর ক্যান্সারে ভুগে ২০০৪ সালের নভেম্বরে ইন্তিকালের বিস্তারিত খবর কয়েক কিস্তিতে লেখা হয়েছে, যা 'জীবনে যা দেখলাম' পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ছোট মেয়ে নুসাইবার প্রয়োজনে মামূনকে তাড়াহুড়া করেই বিয়ে করাতে হয়েছিল। এতদিন নুসাইবা ওর আব্বার সাথে জেদ্দাতেই ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে ম্যানচেস্টার এসেছে।

মা মুন্নী ওর সন্তানদের দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতি কামনা করত এবং সে উদ্দেশে দু'আও করত। আল্লাহ তাআলা ওর কামনা ও দোআ পূর্ণ করছেন দেখে পরম শুকরিয়া জানাই। আফসোস! সে তাদের উন্নতি দেখে দুনিয়ায় উপভোগ করতে পারল না।

বড় ছেলে নাবীল ওর মায়ের অসুস্থতা ও মৃত্যুর কারণে ২০০৪ সালে এমএ পড়া মুলতবি করতে বাধ্য হয়েছিল। এ সময়টাতে কায়রোতে আরবী শিখে নিল। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে ওর বিয়ে হলো। গত এক বছরে আল্লাহর রহমতে সে Human Resources Management বিষয়ে এমএ পাস করল। ইতোমধ্যে অত্যন্ত ভালো বেতনে বিখ্যাত ফোর্ড গাড়ির কোম্পানিতে লন্ডনেই কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়ে গেল। সে যে বিষয়ে এমএ পড়েছে, সেটাই প্রধানত প্রতিযোগিতায় তার সাফল্যলাভে সহায়ক হয়েছে। এখানকার ইসলামী যুবসংগঠনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংগঠকের বাস্তব অভিজ্ঞতা হাসিল হচ্ছে বলে সে মনে করে। নাবীলের এ চাকরি হওয়াটা মামূনের জন্য আল্লাহর বিরাট রহমত।

মামূন জেদ্দায় থাকে। ওর সন্তানরা এ দেশে। মা-হারা ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। বড় মেয়ে লুবাবাই ছিল মামূনের জন্য বড় সমস্যা। লুবাবা তার মায়ের দীর্ঘ অসুস্থতা ও

www.bjilibrary.com

মৃত্যুতে লেখাপড়ায় দুবছর পিছিয়ে গেল। জেদ্দায় এ-লেভেল সমাপ্ত করা গেল না। ম্যানচেস্টারে নতুন করে ভর্তি হয়ে এবার এ-লেভেল পাস করল। ভাইদের সাথে পাক-শাক করে দু বছর কোনো রকমে চলেছে। সে ইংরেজিতে সবচেয়ে ভালো নম্বর পেয়েছে। ইংল্যান্ডে লন্ডনস্থ কিংস কলেজ ইংরেজি ভাষার জন্য সেরা কলেজ। ঐ কলেজে ওকে ভর্তি করতে কর্তৃপক্ষ রাজি হয়েছে।

নাবীলের চাকরিটা না হলে লুবাবার পক্ষে লন্ডনে পড়া অসম্ভব হতো। নাবীল বাসা ভাড়া নিচ্ছে। ওর স্ত্রী নাসরিন মেডিক্যাল কলেজে এবার ফাইনাল ইয়ারে উঠল। নাসরিন লুবাবার বান্ধবী ছিল, এখন ওর ভাবি। ইসলামী ছাত্রী সংগঠন 'মুসলিমাত'-এ নাসরিন অন্যতম নেত্রী। সে সূত্রেই লুবাবার সহকর্মী। এ বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় বিয়ের পক্ষে লুবাবার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। এখন লন্ডনের বাসায় সে ভাবির সাথে থাকার সুযোগ পেল। ওরা দুজন একই কলেজের ছাত্রী। আল্লাহর মেহেরবানীতে লুবাবার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয়ে গেল।

ওর ছোট বোন নুসাইবার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হলো, সেও লন্ডনেই বড় ভাইয়ের বাসায় থাকবে; সেখানেই ক্লাস এইটে পড়বে; জেদ্দায় ফিরে যাবে না। মা-হারা ছোট মেয়ে মামুনের বড় আদরের। সেও আব্বার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট। ওর মা বেঁচে থাকাকালেও সে আব্বার পক্ষে আম্মার সাথে বিতর্ক করত। সে জেদ্দায় ফিরে না গেলে মামুনের নিকট খুব খারাপ লাগবে; কিন্তু নুসাইবার স্বার্থে মামুনকে এটা মেনে নিতে হচ্ছে।

লন্ডনে আতিথেয়তা

এবার লন্ডনে সালমানের বাসায় থাকায় মেহমান হিসেবে কোথাও রাত যাপন করতে হয়নি। কোথাও বেড়াতে গেলে খেয়েই চলে এসেছি।

গত বছর লন্ডনে থাকার কোনো জায়গা না থাকায় বিভিন্ন কারণে ম্যানচেস্টার থেকে দু-তিন দিনের জন্য লন্ডন গিয়েছি। তখন এক বা দুই রাত কোথাও থাকতে হয়েছে। সংগঠনের প্রোগ্রামে গিয়ে একবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারের মেহমানখানায় দুই রাত ছিলাম। সেন্টারের কেয়ারটেকার আবদুল হালীমের সেবা-যত্ন থাকা সত্ত্বেও সংগঠনের পক্ষ থেকে জনাব সিরাজুস সালেকীনকে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

একবার দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে-এর প্রোগ্রামে গিয়ে সংগঠনের বর্তমান আমীর মাওলানা মওদূদ হাসানের বাড়িতে এক রাত ছিলাম। একবার আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের সাথে তার বড় মেয়ে আতীয়ার স্বামীর বাড়িতে বেড়াতে গেলাম।

এবার প্রোগ্রাম উপলক্ষে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে কয়েক বারই গিয়েছি। কিন্তু কোথাও রাতে থাকতে হয়নি। এমনকি নাতজামাইর বাড়িতেও রাতে থাকিনি। দুপুরে পৌছে খাবার গ্রহণের পর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সালমানের বাসায় চলে এসেছি।

www.bjilibrary.com

প্রতি শুক্রবারই লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ডাইরেক্টর দেলাওয়ার হোসাইন খান সংগঠনের কোনো ভাইকে দিয়ে জুমআর নামাযের জন্য আমাকে ইস্ট লন্ডন মসজিদে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এমন লোকই পাঠিয়েছেন যার নিজস্ব গাড়ি আছে। প্রতি শুক্রবারেই বিকালে প্রোগ্রাম উপলক্ষে দুপুরে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে খাবারের ব্যবস্থা করা হতো। খাবার গ্রহণের পর ব্যারিস্টার ইকবালের কামরায় বিশ্রাম নিয়ে প্রোগ্রামে যোগদান করতাম। প্রোগ্রাম শেষে কোনো ভাই আমাকে সালমানের বাসায় পৌঁছিয়ে দিতেন।

একদিন দেলাওয়ার সাহেব তাঁর বাড়িতে নিয়ে খাওয়ালেন। মসজিদের কাছেই তাঁর নিজস্ব বাড়ি। ঐ বাড়িতে তিনি তাঁর মায়ের হাতে লাগানো গাছের লাউয়ের তরকারি খাওয়ালেন এবং গাছটিও দেখালেন। সেন্টারের কেয়ারটেকার নরসিংদীর আবদুল হালীম (আইনের ছাত্র) গতবার অবিবাহিত থাকায় সেন্টারেই থাকত। এখন সপরিবারে নিকটেই থাকে। সে তার স্ত্রীর হাতে পাক করা মজাদার খাবার সেন্টারের মেহমানখানায় এনে দুদিন খাইয়েছে।

বাসায় নিয়ে দাওয়াত খাওয়ানোর দাবি অনেকেই করেছেন। আমার চলাফেরা করতে কষ্ট হয় বিধায় মাফ চেয়েছি; কিন্তু পুরনো বন্ধু হিসেবে জনাব আবদুস সালামের বাড়িতে না গিয়ে পারলাম না। ঢাকায় ফোন করে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এবং আমিও কথা দিয়েছি।

ঢাকার ইসলামী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সাথি ও বন্ধু মরহুম সালেহ আহমদের ছেলে সেলিম তার বাসায় যেতে আবদার জানাল। বলল, আমার বাচ্চারা ওদের দাদাকে দেখেনি। দাদার বন্ধুও তো দাদা। ওরাও খুব আগ্রহী। আমার চলাফেরায় কষ্ট হয় জানতে পেরে সপরিবারে খাবার নিয়ে সালমানের বাসায় চলে এল। এত বেশি পরিমাণ খাবার নিয়ে এসেছে, যা খেয়ে শেষ করতে আরো দুদিন লেগেছে।

সেলিম ১৮ বছর ফ্রান্সে ছিল। সম্প্রতি লন্ডন চলে এসেছে। ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার কমপ্লেক্সে 'বারাকা' নামে উন্নত মানের একটা রেস্টুরেন্টের সে অন্যতম মালিক ও পরিচালক। তার রেস্টুরেন্টে একদিন খেতে হবে বলে দাবি জানাল। এক শুক্রবার সে সুযোগ পেলাম। তার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হলাম। 'মাসিক সময়' নামক পত্রিকার সম্পাদক সাঈদ চৌধুরীর মেহমান হিসেবে 'বারাকা'য় তৃপ্তির সাথে খেলাম। জনাব সাঈদ চৌধুরী 'মিডিয়া মহল' নামে একটি সংবাদসংস্থার মালিক। তিনি তিন দিনে আমার আট ঘণ্টাব্যাপী ইন্টারভিউ ভিডিও করেছেন। একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করাই উদ্দেশ্য। এর শেষ বৈঠকটা লন্ডন সেন্টারস্থ তাঁর অফিসেই হয়েছে। বৈঠক শেষে বারাকায় খুব খেলাম। শুধু খাবারই নয়, খাদ্যের প্রদর্শনী। সব আইটেম খেতে পারলাম না।

ম্যানচেস্টারে এ সফরের শেষ অবস্থান

ইতঃপূর্বে লিখেছিলাম, তৃতীয় ছেলে মোমেনের বাড়িতে ১৫ দিন ও বাকি সময় দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বাড়িতে থাকার কথা। পঞ্চম ছেলে নোমানের বাসায় থাকার কথা ঐ লেখায় উল্লেখ ছিল না। আমীনের ছেলে রাইয়ান কেমন করে এ কথা জানতে পেরে নোমানের বড় ছেলে ইউসুফকে বলেছে, দাদা তোমাদের বাসায় যাবে না।

www.bjilibrary.com

ইউসুফের নানার বাড়ি লন্ডনে, যে বাড়িতে আমি সত্তরের দশকে ছয় বছর আমার নির্বাসন জীবন কাটিয়েছি। ওর নানা রিয়াযুদ্দীন দূরসম্পর্কে আমার ভাতিজা। তার লন্ডনের বাড়িতে থাকাকালে তার ছেলেমেয়েরা তখন ছোট। তাদের দাদা আগেই দেশে মারা গেছেন, আমি তাদের প্রিয় দাদা হয়ে গেলাম। আমার ছেলে নোমানের সাথে তার বড় মেয়ে পারভীনের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমি রিয়াযুদ্দীন ও তার স্ত্রী মমতাজের চাচার পজিশনেই বহাল আছি। তাই এখনো আমি পারভীনের দাদা। ওর ছেলে ইউসুফের দাদা তো বটেই।

ইউসুফের নানা কয়েক মাস আগে ঢাকায় হঠাৎ মারা গেছেন। ওর বড় মামা ড. শাহীন আমেরিকা থেকে এসে ওদের লন্ডনস্থ বাড়িতে ওর পিতার জন্য দোআর অনুষ্ঠান করেছে। ইউসুফের দাদু অনুষ্ঠানে শরীক হতে আমার আগেই পৌঁছলেন। একটা প্রোগ্রাম শেষে আমি বিলম্বে পৌঁছে জানতে পারলাম, ইউসুফ ওর দাদুর কাছে কাঁদতে লাগল যে, কেন ওদের বাসায় আমরা যাব না। ওর বাপ-মা বলল, এমনভাবে কাঁদতে ইউসুফকে আর কখনো দেখা যায়নি।

আমি তাকে ডাকলাম। অভিমানের কারণে একটু দেরি করে এল। বললাম, আমাদের কাছে না জেনেই কেন তুমি রাইয়ানের কথায় এভাবে কাঁদলে? আমরা ম্যানচেস্টারে থাকাকালে তোমার আম্মা সেখানে থাকবে কি না, সঠিক জানা ছিল না। আমরা অবশ্যই তোমাদের বাসায় কয়েক দিন থাকব। ইউসুফ এবার ও-লেভেল পাস করেছে; কলেজে ভর্তি হবে। সে আইন পড়বে; ব্যারিস্টার হতে আগ্রহী।

আমরা বুড়া-বুড়ি একা একা সফর করা ঠিক মনে করি না। আসার সময় আমীন আমাদেরকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু যাওয়ার সময় ওর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য এয়ারলাইন্সও বৃদ্ধদেরকে সযত্নে পৌঁছানোর দায়িত্ব নেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর (২০০৬) রাতে মোমেন ও ওর স্ত্রী নাহার একই বিমানে ওমরা করতে যাচ্ছে। ওদের সাথেই দোহা পর্যন্ত অন্তত যাওয়া যাচ্ছে। এরপর দিনে দিনে দোহা থেকে ঢাকা দুজনেই এয়ারলাইন্স-এর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীবিহীন অবস্থায় যাচ্ছি।

এক আনন্দঘন অনুষ্ঠান

২ সেপ্টেম্বর '০৬ নাবীলদের বাড়িতে আনন্দমিলন হয়ে গেল। নাবীলের দাদু দুদিন আগেই ঐ বাড়িতে নাতবৌ ও দু'নাতনির সান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। এখানে অবস্থানরত আমার সকল ছেলে-বৌমা ও নাতি-নাতনি এবং আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়াযযাম, তার বড় ছেলে সোহায়ল ও বৌমা এবং তিন নাতি একত্রে সমবেত হলো। সালমান লন্ডনে থাকায় এখানে অনুপস্থিত। মামুনের ছোট ছেলে উসামাও লন্ডন থেকে আসতে পারেনি। ওখানে সে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আরবী পড়াচ্ছে। সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

নাবীল ও নাসরিন এভাবে এ প্রথম সবাইকে খাওয়ার দাওয়াত দিল। প্রধান বাবুর্চি নাবীলের ডাক্তারি পড়ুয়া স্ত্রী। সহযোগী ওর ননদ ও বান্ধবী লুবাবা। আমরা ঢাকা চলে

www.bjilibrary.com

যাচ্ছি বিধায় এখনই তারা অনুষ্ঠান করতে বাধ্য হলো। ৩ সেপ্টেম্বর নাবীল লন্ডন গেল। ৪ সেপ্টেম্বর চাকরিতে পয়লা যোগদান করার কথা। চাকরির বেতন পাওয়ার পর অনুষ্ঠান করলে আমাদেরকে পাবে না বলে আগেই করতে হলো।

কয়েকটি উপলক্ষ এ অনুষ্ঠানের পটভূমি রচনা করেছে। নাবীলের এমএ পাস, লুবাবার এ-লেভেল পরীক্ষায় সম্মানজনক ফলাফল, নাবীলের আকর্ষণীয় চাকরি লাভ ও বিয়ের বর্ষপূর্তি।

খাবার টেবিলে সাজানো দেখা গেল মাছ, গোশত, সবজি ও মুড়িঘণ্ট মিলে আট আইটেম। এরপর মিষ্টি ও ফল কয়েক আইটেম।

খাবার পরিবেশনে নাবীলের দাদুকে বেশ উৎসাহী দেখা গেল। মজাদার খাবারের সবাই প্রশংসা করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার স্ত্রীর দিকে তাকালে তিনি বললেন, তারা পাকে সামান্য সহযোগিতা করতেও আমাকে দেয়নি। আমাকে শুধু এড্‌ভাইজ করার একটু সুযোগ দিয়েছে। নাতবৌ পাকা রাঁধুনির সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নিল।

লন্ডনে আমার গতবারের মেজবান জনাব সিরাজুস সালেকীন ফোনে জানতে চাইলেন, আমি নাতবৌয়ের খেদমত নিচ্ছি কি না। বললাম, নাতবৌ এখনো বাপের বাড়িতেই আছে। তা ছাড়া সে এখনো ছাত্রী। নাতি লন্ডনে চাকরি পেয়েছে বলে এখন বাসা নেবে। আশা করা যায় নাতবৌ আগামী বছরই ডাক্তারি পাস করবে। ইনশাআল্লাহ, তখন নাতবৌয়ের খেদমত উপভোগ করা যাবে, যদি আসতে পারি।

যার বাড়িতে এ আনন্দঘন অনুষ্ঠান হলো সে-ই অনুপস্থিত। সে (নাবীলের আব্বা মামূন) জেদ্দা থেকে এ আনন্দে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত তার আম্মা, আব্বা, বড় চাচা, ভাই ও ছেলেদের সাথে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলল।

মামূনের ছোট ছেলে উসামাও লন্ডন থেকে ফোনে আনন্দে শরীক হলো এবং অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করল।

আগামী বছরের কথা

পাঁচ ছেলে-বৌমা আর ১৭ নাতি-নাতনির দাবি হলো, যাতে আমরা বছরের বেশি সময় ওদের সাথে থাকি। ইসলামী আন্দোলনের কোনো সাংগঠনিক দায়িত্ব আমার উপর না থাকলেও আমি এমন কিছু কাজের দায়িত্ব নিয়েছি, যার দরুন আমার পক্ষে বিদেশে বেশি দিন থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যেহেতু প্রতি বছর এরা সবাই দেশে যেতে পারে না, সেহেতু এদেরকে দেখার জন্য আমাদেরকে আসতে হয়।

তাই স্বাস্থ্যে যদি কুলায় তাহলে আগামী বছরও গ্রীষ্মকালে আসতে চাই। আমি গরমকাতর বিধায় প্রচণ্ড গরমের দুই-তিন মাস দেশ থেকে পালিয়ে শীতের দেশে চলে আসাই পছন্দ করি। অবশ্য এবার জুলাই মাসের তিন সপ্তাহ প্রায় ঢাকার সমপরিমাণ গরম ভোগ করেছি। রাতেও ফ্যান ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। সত্তরের দশকে এ দেশে

www.bjilibrary.com

কোথাও ফ্যান দেখিনি। এখন ঘরে ঘরে ফ্যান। সারা দুনিয়াতেই আবহাওয়ায় বিরাট পরিবর্তন হয়ে চলেছে।

লন্ডনে আগে থাকার জায়গা ছিল না। এবার সালমান থাকায় অনেক দিন ওর বাসায় থাকলাম। নাবীল দাবি জানাল যে, আগামী বার বেশি সময় নিয়ে আসতে হবে, যাতে ওর বাসায় থাকা যায়।

২৮৫.

ইংল্যান্ডে মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক

২০০১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের বিখ্যাত টু-ইন টাওয়ার ধ্বংসের সময় আমি আমেরিকায়ই ছিলাম। একই সময় আমেরিকার সামরিক হেড কোয়ার্টার পেন্টাগনেও বিমান হামলা হয়। এত বড় বিস্ময়কর ঘটনার কোনো তদন্ত ছাড়াই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এর জন্য বেচারা উসামা বিন লাদেনকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। আফগানিস্তানের উপর জঘন্য হামলার অপরাধকে বৈধ সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি ক্রুসেড ঘোষণা করেছেন। টু-ইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে যেসব বিমান হামলা চালিয়েছে এর সব কয়টিই আমেরিকান এবং পাইলটরাও আমেরিকান। বিমানের যাত্রীদের মধ্যে যারা আরব মুসলিম যুবক ছিল, তাদেরকে হাইজ্যাকার সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকার মুসলমানদেরকে বেশ কিছু দিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। মিডিয়ায় ইসলামকে এক সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

গত বছর (২০০৫) ৭ জুলাই লন্ডনে বাস ও আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে আত্মঘাতী বোমা হামলায় যে ৫৬ জন লোক নিহত হয়, তাদের মধ্যে চারজন ব্রিটিশ মুসলিম যুবককে আত্মঘাতী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় পথে-ঘাটে মুসলিমদেরকে হেয় করা, হিজাবপরিহিতা মুসলিম মহিলাদেরকে অপদস্ত করা, এমনকি মসজিদে হামলা করার ঘটনাও ঘটতে থাকে। গত বছর ঐ সময় আমি এ দেশেই ছিলাম। এ বিষয়ে গত বছর লিখেছি, যা 'জীবনে যা দেখলাম' ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

এবার ১০ আগস্ট '০৬ ভোরে ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সন্দেহ করেছে যে, এরা 'তরল বোমা' ব্যবহার করে ব্রিটেন থেকে আমেরিকাগামী ১০টি জেট যাত্রী বিমান বিধ্বস্ত করার ষড়যন্ত্র করছিল। সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই সেদিনের সকল ফ্লাইট বাতিল করে বিমানবন্দরে তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো হলো।

আটক ব্যক্তিদের বয়স ১৭ থেকে ৩৪ বছর। সবাই ব্রিটিশ নাগরিক এবং তাদের জন্ম ব্রিটেনে। তিন জন নওমুসলিম, অন্যরা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত মুসলিম। গ্রেফতারের দুই সপ্তাহ পরও কারো বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেনি পুলিশ।

www.bjilibrary.com

সম্প্রতি লন্ডনের নিকটবর্তী সাসেক্সে 'ইসলামী সেকেন্ডারি স্কুল' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুলিশ দখল করে নেয়। ৫৪ একর জমির উপর দু'শ' কামরাবিশিষ্ট বিরাট বিল্ডিং-এ শুধু স্কুল নয়, আরো কিছু কার্যকলাপ চলে বলে সন্দেহ করা হয়।

কয়েক মাস আগে লন্ডনে একটি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ পরিবারে হামলা চালিয়ে দুই ভাইকে গ্রেফতার করা হয়, যাদের একজনকে পুলিশ গুলি করে আহত করেছে, পরে তদন্ত করে কিছুই পায়নি। এভাবে মুসলিমমাত্রই এখন সন্দেহের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

টনি ব্লেয়ার সরকার গত বছরের বোমা হামলার পর নতুন আইন পাস করে পুলিশকে সন্দেহজনক যেকোনো লোককে গ্রেফতার করা এবং প্রয়োজনে গুলি করার ক্ষমতা দিয়েছে। তাই মুসলিমদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্ক বিরাজ করছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে সরকারের সাথে দেন-দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

নেভিগেটর সিস্টেম

এবার ম্যানচেস্টার পৌঁছার এক সপ্তাহ পর আমার তৃতীয় ছেলে মোমেনের গাড়িতে লন্ডনে সালমানের বাসায় যাওয়ার সময় একটা ছোট্ট মেশিন দেখলাম। ড্রাইভারের সামনে মাঝারি সাইজের ক্যামেরার সমান মেশিনটি বসিয়ে দেওয়া হলো। এ মেশিন থেকে নারী কণ্ঠে পথনির্দেশনা আসতে থাকল। গন্তব্যস্থলের পূর্ণ ঠিকানা (রাস্তার নাম, বাড়ির ঠিকানা ও পোস্টাল কোড) মেশিনটিতে কম্পিউটারে টাইপ করার মতো বসিয়ে দেওয়া হলো।

এ মেশিনের নাম 'নেভিগেটর'। এর মূল্য ২০০ থেকে ৪০০ পাউন্ড– বিভিন্ন মানের। স্যাটেলাইটের সাথে এর সংযোগ হয় এবং গাড়িটি কোথায় আছে, তা জেনে পথনির্দেশ করতে থাকে। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আমি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে নির্দেশনাগুলো শুনে বিস্ময়বোধ করছি। ইংরেজি ভাষায় নির্দেশনায় যা বলা হয়েছে, তা উদ্ধৃত করছি :

'ডানদিকে ঘুর, বামদিকে ঘুর, ২০০ গজ পর বাঁয়ে যাবে, ৪০০ গজ পর ডানে যাও, ৮০০ গজ পর গোল চক্কর আসবে, চক্করের তৃতীয় রাস্তায় 'বাঁয়ে মোড় নেবে' ইত্যাদি।

কোন্ দিকে মোড় নেবে, তা একটু দূর থেকে জানানোর পর নিকটে এলে আবার ডান বা বাঁয়ে যেতে বলে।

মোমেন একবার এক গোল চক্করে ভুল পথে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কবাণী এল, কিন্তু তখন ফিরে আসার উপায় নেই। নেভিগেটর নতুন করে পথনির্দেশ দিতে দিতে ৬ মাইল ঘুরিয়ে পূর্ব চক্করে এনে নির্ভুল পথে উঠিয়ে দিল।

লন্ডনের মতো বিরাট শহর পার হয়ে আরেক মাথায় সালমানের নতুন বাসা। মোমেন এর আগে এ বাসায় আসেনি। নেভিগেটর মোমেনকে গাইড করে সালমানের বাসার কাছে পৌঁছে বলে দিল, 'Now you have reached the destination' (আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন)।

www.bjilibrary.com

লন্ডন শহরের কেন্দ্র থেকে সালমানের বাসা বেশ দূরে বিধায় ইস্ট লন্ডন থেকে যারাই আমাকে সেখানে পৌঁছিয়েছেন, তারা এ মেশিন ব্যবহার করেছেন। এক দিন মাত্র নরকণ্ঠ শুনেছি। আর সব দিনই নারীকণ্ঠে পথনির্দেশ এসেছে।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি

বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষই করে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধির যে অদ্ভুত হাতিয়ার দিয়েছেন, তা কাজে লাগিয়ে মানুষ বিজ্ঞানের ময়দানে যে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, তাতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য আল্লাহকে স্বীকার করা আরো সহজ হয়ে গেছে। যে আল্লাহ্ মানুষকে এত জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি (Wisdom) কত উন্নত, তা ধারণা করার যোগ্যতাও মানুষের নেই।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিশ্বের মহাবিস্ময়। জ্ঞানের মহাসমুদ্র ইথারে বিচরণ করছে। ঘরে বসে তা সংগ্রহ করা সম্ভব। পূর্বে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে যেতে হতো। মানুষের সকল ক্রিয়াকাণ্ড ভিডিও রেকর্ড করা যাচ্ছে। আল্লাহর ফেরেশতারা আরো কত উন্নত পদ্ধতিতে মানুষের ভালো ও মন্দ কর্মতৎপরতা রেকর্ড করছেন, তা আখিরাতে টের পাওয়া যাবে। যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে সন্দেহ পোষণ করে, তাদেরকে কি সত্যি জ্ঞানী ও চিন্তাশীল বলা যায়?

পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিমদের বিরোধ

পৃথিবীতে সবচেয়ে ধনী জাতি হলো ইহুদি। সে সুবাদে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অনেক অগ্রসর। ধুরন্ধর ও ষড়যন্ত্রকারী হিসেবেও তারা বিশ্বসেরা। আমেরিকা ও ইউরোপে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে তারা মিডিয়া জগতে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন অক্ষশক্তি হিটলার ও মুসোলিনিকে পরাজিত করার জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে। হিটলার কর্তৃক ইহুদি জাতিকে জার্মান থেকে বিতাড়িত করার প্রতিশোধ নিতেই তারা তাদের বিশাল ধনবলকে যুদ্ধে বিনিয়োগ করে।

যুদ্ধে ১৯৪৫ সালে বিজয় লাভ করার পর ইহুদি জাতিকে বিজয়ী অক্ষশক্তি হিসেবে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেয় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। ইহুদিরা দাবি জানায় যে, ফিলিস্তিনে তাদেরকে স্থায়ী আবাসভূমি কায়েমের সুযোগ দেওয়া হোক। ইঙ্গ-মার্কিন-রুশ অক্ষশক্তি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা আমেরিকার বিশাল খালি এলাকায় ইহুদি জাতিকে আবাসভূমি বরাদ্দ দিতে পারত; কিন্তু ইহুদিরা হাজার বছর পূর্বে বিতাড়িত এলাকায় তাদের ধর্মরাষ্ট্র কায়েমের জন্য জিদ ধরল।

কুরআনে তাদের পরিচয় হলো বনি ইসরাঈল। এককালে তাদের পূর্বপুরুষ ফিলিস্তিনে ছিল এবং মুসলিমদের হাতেই তারা বিতাড়িত হয়। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জঘন্য উদ্দেশ্যেই এ দাবিতে তারা অনড় রইল। মুসলিম মিল্লাতের প্রথম কিবলা বাইতুল মাকদিস দখল করা তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

www.bjilibrary.com

ফিলিস্তিনের লাখ লাখ মুসলিম আরব অধিবাসীকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদিদের ধর্মরাষ্ট্র কায়েম করা হলো। মুসলিমরা উদ্বাস্তু অবস্থায় নিকটবর্তী আরব বিশ্বে আশ্রয় নিল। মধ্যপ্রাচ্যের কলিজায় একটি হিংস্র ছোরা হিসেবে ইসরাঈলকে বসিয়ে দেওয়া হলো। পাশ্চাত্যের সাথে মুসলিম উম্মাহর বিরোধের প্রধান কারণ এটাই।

ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে পিএলও (Palestine Liberation Organization) দীর্ঘ ৪০ বছর মুক্তিযুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে আমেরিকার উদ্যোগে এবং মিসরের সহযোগিতায় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়।

এর বদলে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কায়েমের দীর্ঘমেয়াদি ওয়াদা করা হয়। ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ফিলিস্তিনে অবিরাম মুসলিমদের হত্যা করে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের ওয়াদা অনুযায়ী আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, যাতে জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার কায়েম হয়।

ইয়াসির আরাফাতের পর মাহমুদ আব্বাস ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আমেরিকা আশা করেছিল যে, নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাসের সমর্থক দল বিজয়ী হবে; কিন্তু দেখা গেল, বিপুল ভোটাধিক্যে শায়খ ইয়াসিনের হামাস পার্লামেন্টের দু-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়।

গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী আমেরিকার পছন্দনীয় দল মুসলিম দেশে নির্বাচিত না হলে আমেরিকা ঐ নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয় না। মিসরে হোসনি মুবারকের প্রহসনমূলক নির্বাচনই আমেরিকার পছন্দ। আলজেরিয়ার নির্বাচন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। পাকিস্তানে সামরিক পোশাকধারী সশস্ত্র বাহিনীপ্রধানকেই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই। এ জাতীয় গণতন্ত্র আমেরিকায় গ্রহণযোগ্য না হলেও মুসলিম দেশে আপত্তিকর নয়। আমেরিকার তাঁবেদার হলে মুসলিম দেশে রাজতন্ত্রও গণতন্ত্রের চেয়ে অধিক সমর্থনযোগ্য। ফিলিস্তিনের জনগণ আমেরিকার পছন্দনীয় দলকে নির্বাচিত না করায় হামাস সরকারকে তারা স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

আমেরিকা কয়েক লাখ ইহুদির রাষ্ট্রের খাতিরে ১৫০ কোটি মুসলিম জাতির ঘৃণা কুড়াতেও রাজি। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকার সন্ত্রাসী ভূমিকার ফলে বিশ্বের শতকরা আশি ভাগ রাষ্ট্র তাদের বিরোধী। আমেরিকা ইসরাঈলের বিপক্ষে জাতিসংঘের সকল প্রস্তাব ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাতিল করে দিয়েছে। আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইসরাঈল জাতিসংঘের নির্দেশ দাপটের সাথে অমান্য করে চলেছে।

আমেরিকার ইসলামফোবিয়া

পাশ্চাত্যে ইসলাম শুধু ধর্ম হিসেবেই পরিচিত ছিল। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মকেও বাধা দেওয়া তারা প্রয়োজন মনে করেনি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদ কায়েমও আপত্তির কারণ ছিল না। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত মাদরাসাকেও দূষণীয় মনে করা হয়নি।

www.bjilibrary.com

কিন্তু ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়ার পর থেকেই পাশ্চাত্যে ইসলামফোবিয়া (ইসলামাতঙ্ক) শুরু হয়। এরপর সুদানে সামরিক বাহিনী ড. হামাস তোরাবীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সহযোগী হয়ে ইসলামী সরকার কায়েম করার পর সে আতঙ্ক এতটা বেড়ে যায় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তারা গবেষণা চালানো প্রয়োজন মনে করল। সবশেষে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার কায়েমের পর ইসলামের পুনরুত্থানের আশঙ্কা প্রবল আকার ধারণ করল।

আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভাড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের ১০ বছরের গবেষণার ফসল 'The Clash of Civilization and the Remaking of World Order' নামক সাড়ে তিন শ' পৃষ্ঠার গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। আমি ১৯৯৯ সালে আমেরিকা সফরে গেলে শিকাগোতে ইসলামী আন্দোলনের এক ভাই মোঃ আসাদ বইটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

বইটির শেষ কভার পেজে লেখকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনামলে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনার ডাইরেক্টর ছিলেন এবং তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির প্রেসিডেন্ট।

তাঁর উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এর বিভিন্ন পরিচ্ছেদ নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই সরকারি পলিসি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন থেকেই তিনি সরকারকে জোরদার পরামর্শ দিতে থাকেন যে, 'ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। এককালে ইসলামী সভ্যতা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি রাশিয়ার সমাজতন্ত্র হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ৭০ বছরের মধ্যে সে হুমকি খতম হয়ে গেছে। এখন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো শক্তি নেই, যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। একমাত্র ইসলামই স্থায়ী হুমকি। তাই ইসলামী আন্দোলনকে সারা বিশ্বেই প্রতিহত করতে হবে। তিনি উক্ত গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষিত মহল– প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত বিরাট সংখ্যায় ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়। এরা ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখে এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

হান্টিংটনের এ পরামর্শ ও সতর্কবাণী আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পিতা সিনিয়র বুশ ক্ষমতাসীন থাকাকালেই এ পলিসি অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। ১৯৯০ সালে ইরাকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের নিকট 'বিরোধিতা না করার' নিশ্চয়তা পেয়েই সাদ্দাম হোসেইন কুয়েত দখল করে। কুয়েত সরকার সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করে। সৌদি আরব ইরাকের হামলার আশঙ্কা করে আমেরিকার সাহায্য চায়। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের এ গুরুত্বপূর্ণ উপসাগরীয় এলাকায় সামরিক অবস্থান গ্রহণ করার মহাসুযোগ পেয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে আমেরিকার বর্তমান পলিসি

১. মিসরের হোসনী মুবারক ও পাকিস্তানের জেনারেল পারভেজ মোশাররফের মতো অনুগত ব্যক্তিদেরকে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিহত করা।

২. মুসলিম দেশের ইসলামী আন্দোলনকে মৌলবাদী ও জঙ্গীবাদী আখ্যায়িত করে জনগণের নিকট বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালানো।

৩. যত দেশে রাজতন্ত্র বহাল আছে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, যাতে সেখানে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ না করে।

৪. যে কয়েকটি দেশে গণতন্ত্র আছে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হাতে যাতে ক্ষমতা থাকে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৫. ইরান ও সুদানকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, যাতে অন্য কোনো মুসলিম দেশ ইসলামী সরকার হিসেবে গড়ে ওঠার হিম্মত না করে। আফগানিস্তানকে তো দখল করেই নিল। দুই দশক পূর্বে আলজেরিয়ায় নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হওয়ার পর সামরিক বাহিনী নির্বাচন বাতিল করে ক্ষমতা দখল করে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করছে।

ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নতুন কৌশল

পঞ্চাশের দশকে মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক জামাল আবদুল নাসেরের সময় থেকেই ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ শুরু হয়েছে। জঙ্গিবাদীরা ইসলামের নামে সন্ত্রাস করছে বলে এ অজুহাতে ইসলামী আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

সম্প্রতি (২০০৫) বাংলাদেশে ইসলাম ও জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু হলে ইসলামবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা জামায়াতে ইসলামীকে এসবের গডফাদার হিসেবে প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

আরব বিশ্বে 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' ও এশীয় উপমহাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী' এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে বিভিন্ন নামে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেসব ইসলামী আন্দোলন চলছে, সেসবকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই তথাকথিত 'জঙ্গিবাদী ইসলাম' সৃষ্টি করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক পথে ইসলামকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিহত করার প্রতিক্রিয়ায় কতক আবেগপ্রবণ যুবক গেরিলা পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকতে পারে। ইসলামবিরোধীরাও এ জাতীয় জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামের বিজয়কে বাধগ্রস্ত করার জন্য নতুন এ কৌশল ইসলামী আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হচ্ছে। এটাকে উপলক্ষ করে ইকামাতে দীনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর মহাসুযোগ তারা পেয়েছে।

www.bjilibrary.com

খুশির বিষয় যে, ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী সকল মহল সুস্পষ্ট ভাষায় জঙ্গিবাদকে ইসলামবিরোধী পদ্ধতি হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং জনগণও তাদের পক্ষে রয়েছে।

ইসলাম নিজস্ব শক্তিতেই এগুচ্ছে

ইসলাম এমন এক মহাসত্য, যাকে শক্তি প্রয়োগ করে খতম করা সম্ভব নয়। সত্য তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ শক্তিতেই টিকে থাকে। সারা বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চলছে। এর ফলে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় গত কয়েক বছরে বেশ সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ইসলামী আন্দোলন সর্বত্রই বিস্তার লাভ করছে। বিরোধিতার মোকাবিলায় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় যারা মুসলিম নাম ও পরিচয় নিয়ে অবস্থান করছে তারা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা এ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে যে, হয় তাদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে দাঁড়াতে হবে, আর না হয় মুসলিম পরিচিতি পরিত্যাগ করতে হবে; কিন্তু দ্বিতীয় বিকল্পটি গ্রহণ করা বাস্তবে বড়ই কঠিন।

মনে হয় ইসলামের উপর বর্তমান যে আঘাত এসেছে, তা অচেতন মুসলিমদের মধ্যেও চেতনা সৃষ্টি করছে। বিদেশে মুসলিম কমিউনিটি হিসেবে সংহতির অনুভূতি একেবারে দুর্বল নয়। কমিউনিটির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেও ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করার চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের মধ্যে কর্মতৎপরতার প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যাচ্ছে। একসময়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে

ম্যানচেস্টারে আমার পঞ্চম ছেলে নোমানের বাসায় পাঁচ দিন থেকে ৮ সেপ্টেম্বর (২০০৬) দ্বিতীয় ছেলে আমীনের বাড়িতে পৌঁছলাম। মনে হয় এ বাড়িটিই এদেশে আগমন (Arrival) ও প্রস্থান (Departure) স্টেশনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আমার ভাতিজা সোহায়লের ভাষায় 'Arrival and Departure Lounge'. ১৫ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় বিমান উড়বে। তাই ৭টার আগেই বাড়ি থেকে বের হতে হবে। মাগরিব বিমানবন্দরে ও এশা বিমানে পড়তে হবে।

নোমানের বাসায় পাঁচ দিন ছিলাম। ওর বড় ছেলে ইউসুফের কথা আগেই লিখেছি। একমাত্র মেয়ে নাওমী এবার সেকেন্ডারি স্কুলে গেল। ইসলামী গার্লস স্কুল। সুন্দর হিজাবপরা পোশাকই স্কুল ড্রেস। নাওমী ছোট সময় থেকেই আবেগপ্রবণ। সে সবার কাছ থেকেই আদর আদায় করতে অত্যন্ত দক্ষ। সকল আত্মীয় বিশেষ করে মুরব্বিদেরকে গলা জড়িয়ে ধরা, চুমু দেওয়া ওর স্থায়ী অভ্যাস। নোমানের ছোট ছেলে দুবছরের মাশআল এ বংশের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। আমার এক কুড়ি নাতি-নাতনির মধ্যে সবার ছোট বলে সে সবার আদরের খেলনা। এখনো কথা তেমন ফোটেনি; কিন্তু সব সময় কথা বলতেই থাকে। ওর ভাষা ওর বাপ-মা ও ভাই-বোন বোঝে। ওর মুখে বাবা,

www.bjilibrary.com

মামা (মা) বাই (ভাই), দাদা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে খুবই চঞ্চল, সবাইকে ব্যস্ত রাখার জন্য সে একজনই যথেষ্ট। ওর হাতে সব সময়ই বল থাকে। সারাক্ষণ একাই বল খেলে। অন্যান্য প্রচুর খেলনা থাকলেও বলই প্রিয়তম।

আমাদের উপস্থিতি উপলক্ষে আমার ছেলেদের এবং ভাতিজার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পালা শেষ করে নোমানের বাসায় থাকাকালে দাওয়াতে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে দোআ করা হলো। এ উপলক্ষে নসিহত করতে গিয়ে বললাম, 'খুশির বিষয় যে, তোমরা সবাই ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক, কিন্তু সবাই সক্রিয় নও। সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় না হলে নামায-রোযা করা দ্বারা ধার্মিক হওয়া গেলেও দীনের দাবি পূরণ হয় না।'

মোমেনের একমাত্র মেয়ে শাম্মা ও-লেভেল পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভাতিজা সোহায়লের বড় ছেলে হিশামও এবারই কলেজে গেল। ঢাকা থেকে সুখবর এল যে, ৪র্থ ছেলে ব্রিগেডিয়ার আমানের বড় মেয়ে নাবীহা এইচএসসি পরীক্ষায় ভিকারুন্নিসা ন্যূন কলেজ থেকে গোল্ডেন A+ পেয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক বিষয়ে লেটার মার্ক পেয়েছে। সে বুয়েটে আর্কিটেকচার পড়তে চায়।

আমীনের বড় মেয়ে আতিয়া ডাক্তারি পাস করে লন্ডনে এক হাসপাতালে কর্মরত আছে। স্বামীর বাড়ি লন্ডনেই। দ্বিতীয় মেয়ে আলিয়া ক্যামব্রিজে ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স শেষবর্ষে আছে; ছাত্রীদের হলে থাকে। তৃতীয় মেয়ে জীনাত ইউনিভার্সিটিতে 'ল্যাঙ্গুইসটিক্‌স'-এ দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পড়ছে। ছোট মেয়ে মারইয়াম মেডিক্যাল কলেজে এবার ভর্তি হয়েছে। একমাত্র ছেলে রাইয়ান নবম শ্রেণীতে পড়ে।

২৮৬.

ঢাকায় রওয়ানা

১৫ সেপ্টেম্বর (২০০৬) আমরা দুই বুড়ো-বুড়ি ঢাকার উদ্দেশে ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। আমাদের তৃতীয় ছেলে মোমেন ও বৌমা নাহার অর্ধেক পথ পর্যন্ত আমাদের সাথী। ওরা ওমরা করতে মক্কা যাচ্ছে।

আমাদেরকে বিদায় জানাতে সালমান-শাহীন ওদের দুমেয়ে নাবা ও সাফাকে নিয়ে লন্ডন থেকে দুপুরে আমীনের বাড়িতে পৌঁছল। ওদের সাথে মামূনের মেয়ে লুবাবা ও নুসাইবাও আসল। পরে বড় নাতি নাবীল ও নাতবৌ নাসরিন লন্ডন থেকে এসে পৌঁছল। নাবীল ৪ তারিখে চাকরিতে যোগদান করেছে। দুই সপ্তাহও হয়নি। সে একটু চিন্তিত ছিল যে, ছুটি পাবে কি না। দাদা-দাদুকে বিদায় জানানোর কথা বলায় ছুটি পেল। ওর বস্ ওর কাজে খুব সন্তুষ্ট বলে জানা গেল।

মোমেন ঢাকায় বিকম পাস করার পর থেকে ট্রাভেল কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে আজীবন এ লাইনে আছে। ম্যানচেস্টারে এক কোম্পানিতে ভালো পজিশনেই আছে। কোম্পানি থেকে ফ্রি টিকিটে সস্ত্রীক সৌদি আরব যাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

আমরা গত বছরও কাতার এয়ারলাইন্সে সফর করায় আমাদেরকে ওদের প্রিভিলেজ ক্লাবের মেম্বার করে নেওয়া হয়েছে। তাই এবার সফরে ১৫ কেজি ওজন বেশি নেওয়ার সুবিধা পেলাম। কাতারের রাজধানী দোহায় বিমান বদল করতে হয়।

ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে

রাত ৯টায় বিমান ছাড়ার কথা। আমরা সাড়ে ৬টায় বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। কয়েক গাড়িতেও সবার জায়গা না হওয়ায় অনেকেই বিমানবন্দরে আসতে পারল না। তারা গাড়িতে ওঠার সময়ই বিদায় জানাতে বাধ্য হলো। আমাদের চার ছেলে সে দেশে থাকে। একজন তো আমাদের সফরসাথীই হয়ে গেল। বাকি তিন ছেলে ও তিন বৌমা এবং ভাতিজা সোহায়ল ও বৌমা এল। সাথে এল তাদের ছোট ছেলে। বড় নাতিদের মধ্যে নাবীল ও আনাস গাড়ি থেকে মাল-সামান ট্রলিতে তুলে ভেতরে আনল। সবার ছোট নাতি মাশআল (দুই বছর) মায়ের সাথে এল। নাতনীদের মধ্যে কলেজে পড়ুয়া মেয়ে শাম্মা। নোমানের ১১ বছর বয়সী মেয়ে নাওমী, সালমানের ১০ বছর বয়সী মেয়ে নাবা ও পাঁচ বছর বয়সী মেয়ে সাফা উপস্থিত ছিল।

নাওমী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। সে দাদা-দাদুর বিদায়ে বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই কাঁদতে থাকল। নাবা বিমাবন্দরে কাঁদতে লাগল। তাদেরকে আদর করে সান্ত্বনা দিলাম যে, নয় মাস পর ইনশাআল্লাহ আবার তোমাদের কাছে আসব। তাদের কান্না থামাতে বেশ সময় লেগে গেল। বিদায়ের সময় ওদের দাদুও কাঁদলেন। তিনি সব সময়ই বিদায় নিতেও কাঁদেন এবং বিদায় দিতেও কাঁদেন। মহিলাদের মন স্বাভাবিকভাবেই নরম।

গতবার বিদায়ের সময় বিমানবন্দরে আগাগোড়াই বিমর্ষ হয়ে সাফা বারবার বলতে থাকল 'তোমরা চলে যাচ্ছ কেন?' ওদেরকে ফেলে কেন আমরা চলে আসছি সে দুঃখে সে বিমর্ষ।

বিমানে ৭ ঘণ্টা

সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় বিমানে উঠলাম। আমরা দুজন হুইল চেয়ারে চলি। আমাদের মতো আরো যারা হুইল চেয়ারের যাত্রী, তাদেরকে বিমানে পৃথক দরজা দিয়ে তুলে নেওয়া হলো। প্রথমে এক বিশেষ গাড়িতে হুইল চেয়ার ওঠাল, গাড়িসমেত আমাদেরকে বিমানের দরজা পর্যন্ত উপরে ওঠালে আমরা চেয়ার ছেড়ে বিমানে প্রবেশ করলাম। আমি ক্র্যাচে ভর দিয়ে চলি, যাতে সায়েটিকায় আক্রান্ত পায়ে চাপ কম পড়ে।

মোমেন ও নাহার অন্যসব যাত্রীর সাথে অন্য দরজা দিয়ে বিমানে উঠল। বিমানে তাদের আসন আমাদের থেকে বেশ দূরে ছিল। আমাদের আসন টয়লেটের কাছে দেওয়া হয়।

আমরা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ভ্রমণ করছি। আর সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে যাচ্ছে। ফলে আমাদের রাতের সময়টা কমে গেল।

www.bjilibrary.com

দোহা বিমানবন্দরে

দোহা বিমানবন্দরে পৌঁছার আগেই সূর্যের আলো দেখা গেল। স্থানীয় সময় সাড়ে ছয়টায় বিমান থেকে পেছনের দরজা দিয়ে হুইল চেয়ারে উঠলাম। অন্য পথে মোমেন-নাহার গেল। বিমানবন্দরের কর্মচারীরা আমাদের দুজনকে লাউঞ্জে পৌঁছিয়ে দিল। হুইল চেয়ার ঠেলে যারা আনল তারা নেপালি।

আমাকে লাউঞ্জে বসিয়ে রেখে আমার স্ত্রী মোমেনদের তালাশে বের হলো। ঢাকাগামী বিমান সকাল সাড়ে ৯টায় এবং মোমেনের সৌদিগামী বিমান দুপুর ১টায় ছাড়ার কথা। ওরা দুজন আমাদের লাউঞ্জে এল। সাড়ে ৮টায় ওরা আমাদেরকে বিদায় দিল।

গত বছর বিমানবন্দর ছোট ছিল। যাত্রীরা ঠাসাঠাসি করে কোনো রকমে সময় কাটিয়েছে। এবার দেখলাম বিরাট লাউঞ্জ। উন্নয়ন আরো হচ্ছে।

ঢাকার পথে

বিশাল বিমানভর্তি যাত্রী। প্রায় সবাই বাংলাদেশি। আরবের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশের যাত্রীরা দোহায় এসে কাতার এয়ারলাইন্সে ঢাকা যায়।

দোহা থেকে ১০টায় বিমান উড়ল। আমরা পূর্বদিকে যাচ্ছি। আর সূর্য পশ্চিম দিকে দৌড়াচ্ছে। দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরই যখন ঢাকায় বিমান থেকে বের হলাম, তখন সন্ধ্যা ৬টা বেজে গেল। দোহা ও ঢাকার মধ্যে সময়ের ব্যবধান তিন ঘণ্টা। দোহার সময় তিনটায় ঢাকায় পৌঁছলাম।

মোমেন বলেছিল যে, বিমানে ওঠার পর নাশ্‌তা দেবে এবং দুপুরে লাঞ্চ দেবে। বিমানে বসার এক ঘণ্টা পর যে নাশ্‌তা দিল তা লাঞ্চের পরিমাণেই ছিল। একদম পেট ভরে গেল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর মাত্র তিন ঘণ্টা সফর বাকি। তাই ধারণা হলো যে, লাঞ্চ হয়তো দেবে না। দিলেও পেটে খিদে লাগবে না। লাঞ্চ দিল না। দোহায় লাঞ্চের সময়েই আমরা ঢাকা পৌঁছলাম।

ঢাকা বিমানবন্দরে

সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহ্‌সান মোহাম্মদ মুজাহিদ বিমানবন্দরের ভিআইপি এলাকার পথে আমাদের বের হয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। আমার ছেলে আমান যে কয়েক বছর মিরপুর মিলিটারি স্টাফ কলেজে ইনস্ট্রাক্টর ছিল তখন সে-ই ভিআইপি এলাকার ব্যবস্থা করত। সে ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ার পর মুজাহিদ সাহেবই ব্যবস্থা করেন।

বিমান থেকে বের হয়েই আমরা হুইল চেয়ার পেলাম। সামান্য এগুতেই আমানকে দেখলাম। সে আমাদেরকে রিসিভ করতেই ঢাকায় এসেছে। ভিআইপি লাউঞ্জে এসে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও ঢাকা মহানগর আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানকে পেয়ে খুব খুশি হলাম। মহানগর আমীর যাওয়ার সময়ও বিদায় দিতে এসেছেন, আর এখন রিসিভ করতে এলেন। আমানের

www.bjilibrary.com

একমাত্র ছেলে নয় বছরের নায়েফও ওর বাবার সাথে এসেছে। বাড়ি থেকে আমাদের বিল্ডিং-এর ম্যানেজার আযাদ, আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক ও কামিয়াব প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী হেলাল (আমার নাতি— ওর আম্মা আমাকে বাবা ডাকে) এসেছে। আমরা বিদেশে যাওয়ার সময়ও ওরা বিমানবন্দরে আমাদেরকে বিদায় জানিয়েছে।

ইতঃপূর্বে যত বার আরব দেশের কোনো বিমানে ঢাকা এসেছি, প্রত্যেক বারই লাগেজ পেতে বিলম্ব হয়েছে। কারণ, আরব দেশে চাকরিরত বাংলাদেশিরা অনেক মাল নিয়ে আসে এবং মাল খালাস করতে ভিড় জমে ও বিলম্ব হয়। এ কারণে আমান, আযাদ ও হেলাল একটু দেরি করে গিয়ে দেখল, সেখানে কয়েকটা সুটকেস রয়েছে। আর কোনো লোকজনই নেই। দেখা গেল সবক'টি সুটকেসই আমাদের। জানা গেল, বিমানভর্তি বাংলাদেশিরা সবাই খালি হাতে এসেছে। অর্থাৎ, তারা ভুয়া ভিসায় গিয়েছিল বলে তাদেরকে ফেরত পাঠিয়েছে।

বিদেশে লোক পাঠানোর এজেন্সির নামে ব্যাপক ধোঁকাবাজি চলে। হাজার হাজার লোক জমিজমা-ভিটেমাটি বিক্রি করে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে নিঃস্ব হচ্ছে। মানুষ বিদেশে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে প্রতারকদের বিশ্বাস করে সর্বহারা হচ্ছে। সরকার এখন পর্যন্ত এসব বন্ধ করতে পারছে না।

যাহোক, মাল-সামান অল্প সময়ে পাওয়ায় বাড়িতে তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম। বেশ ক্লান্ত-শ্রান্ত বোধ হলো। একরাত ও একদিন পুরোই লেগে গেল সফরে। এর মধ্যে মোটেই ঘুমাতে পারিনি। অথচ এককালে ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে বসে বসেও ঘুমাতাম।

আড়াই মাস যেখানে অবস্থান করে দেশে ফিরে এলাম, সেখানের সাথে এখানের সময়ের পাঁচ ঘণ্টা ব্যবধানের ফলে কয়েক্ দিন ঘুমের সমস্যা চলবে। সেখানে গিয়েও কয়েক দিন ঘুম সমস্যায় ভুগতে হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছতে প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে যায়।

আমাদের অনুপস্থিতিতে আমার চতুর্থ বৌমা (আমানের স্ত্রী) নীরু আমাদের মগবাজারের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। তাদের মেয়ে নাবীহা আমাদের সাথেই থাকে। তাই ওর প্রয়োজনেই ওর মাকে থাকতে হয়েছে।

বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমাদের দরজা-জানালার পর্দা ও থাকার ঘরের সোফার কভার সব নতুন নতুন ও চমৎকার সুন্দর ডিজাইনের। কত খরচ হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে নীরু বলল, বাবা! গিফটের মূল্য জানতে হয় না। আমাদের কোন্ জিনিসটা দরকার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে তা গিফট করা ওর শখ। আমার পছন্দনীয় পানির মগ ও জগ, ওষুধ রাখার প্লাস্টিক পাত্র, এমনকি পিঠ চুলকানোর প্লাস্টিক হাতিয়ার পর্যন্ত সে তালাশ করে এনেছে।

তাফহীমুল কুরআন থেকে সংগৃহীত বিষয়ে লেখা বই

ইতঃপূর্বে বলেছিলাম, তাফহীমুল কুরআনে মাওলানা মওদূদী তাফসীর লিখতে গিয়ে কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারকে উন্মোচন করেছেন। যারা গবেষক তারা সেখান থেকে

www.bjilibrary.com

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অগণিত পুস্তক রচনা করতে পারেন। আমি এর ভিত্তিতে যেসব বই লিখেছি সেগুলোর পরিচয় দিচ্ছি :

১. 'কুরআন বোঝা সহজ'। আমি বাংলা ও ইংরেজিতে কয়েকটি তাফসীর অধ্যয়নের চেষ্টা শুরু করেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাইনি। কারণ, আমার এ যোগ্যতা নেই বলেই মনে হলো; কিন্তু তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করে ধারণা হলো যে, কুরআন বোঝার কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে আর কঠিন মনে হয় না। সে কৌশলটিই তাফহীম থেকে সংগ্রহ করে 'কুরআন বোঝা সহজ' বইটি লিখেছি।

২. 'আদম সৃষ্টির হাকীকত'। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকূ'তে আদম ও ইবলিসের মধ্যে বিরোধের যে কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কাহিনীর বিভিন্ন অংশ আরো ৬টি সূরায় রয়েছে।

ছোট বয়স থেকেই বহু ওয়াজ-মাহফিলে এ কাহিনীর যে বিবরণ শুনেছি, তাতে আমার মনে বহু খটকা ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে ঐ কাহিনীর ব্যাখ্যা পড়ে আমার সকল খটকা দূর হয়েছে এবং সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়েছি।

আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম করা হলো কেন? ইবলিস তো জিন ছিল, ফেরেশতা ছিল না, সে সিজদা না করায় অপরাধী হলো কেন? সে-ই বা সিজদা না করার পক্ষে যুক্তি দেখানো প্রয়োজন মনে করল কেন? দুনিয়ায় পাঠানোর আগে আদম ও হাওয়াকে বেহেশতে পাঠানো হলো কেন? আদম ইবলিসের ধোঁকায় পড়লেন কীভাবে? আদমকে দুনিয়ায় খলীফার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সে দায়িত্বটা কী? আদম সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে ফেরেশতাদেরকে জানানো দরকার মনে করলেন কেন?

এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব তাফহীমুল কুরআনের সাতটি সূরা থেকে সংগ্রহ করে বইটিতে লিখেছি। ১৯৯২-৯৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক থাকাকালে বইটি লিখেছি।

বইটির বিরুদ্ধে আওয়ামীপন্থি কতক আইনজীবী রংপুর, পটুয়াখালী ইত্যাদি কয়েকটি শহরে জজ কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। তাদের অভিযোগ ছিল যে, বইটির বক্তব্য তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করেছে। জজ সাহেবগণ এ বিষয়ে তদন্ত করে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য পুলিশকে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। এরপর এ বিষয়ে আর কিছু শোনা যায়নি।

বইটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে দায়িত্ব দিয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আমার সাক্ষাৎকারও নিয়েছে। এরপর আর কিছুই জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

ঐ মামলা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তের নির্দেশের ফলে বইটি অনেক উকিল ও জজ সাহেবকে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কয়েকজনকে পড়তে হয়েছে।

৩. 'কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের চার দফা কর্মসূচি'। সূরা হাজ্জের ৪১ নং আয়াতে ঐ চার দফা কর্মসূচি রয়েছে। তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা পড়ে বইটি লেখার প্রয়োজনবোধ করেছি। এটাও জেলখানায়ই লেখা।

৪. 'বাইয়াতের হাকীকত' নামক বইটির ভিত্তি হলো সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াত। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর সাথে মুমিনের এ কেনা-বেচার ব্যাপারটিকেই 'বাইয়াত' বলা হয়। এ পরিভাষাটি পীর-মুরীদির সম্পর্কেও ব্যবহার করা হয়। আরবের বাদশাহগণও জনসাধারণ থেকে বাইয়াত গ্রহণ করেন। 'বাইয়াত' পরিভাষাটি আনুগত্যের শপথ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। আসল আনুগত্য তো আল্লাহরই। এ আনুগত্যের সহায়ক হিসেবে ইসলামী সংগঠনেও আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বইটিতে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৫. 'ইকামাতে দীন' বইয়ে দীন শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা তাফহীমুল কুরআনেই পেয়েছি। দীন কায়েম না থাকলে সমাজের অবস্থা কী দাঁড়ায়, আর দীন কায়েম হলে কেমন অবস্থা হয়, এর চিত্র বইটিতে তুলে ধরেছি। দীন কায়েমের আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি, দীন কায়েম করতে গেলে বাতিল শক্তির সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য কেন, ওলামায়ে কেরাম সকলে ইকামাতে দীনে সক্রিয় নন কেন, দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে গঠিত জামায়াতের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বইটিতে আলোচনা করেছি। এ বইটি ইংরেজি ভাষায় অনূদিত।

৬. 'আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি'। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ায় তাঁর দীনকে কায়েম করে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যই যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সে চেতনার অভাবেই মুসলিম জাতি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পালন করলেও দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব সবাই বোধ করে না।

এ দায়িত্ব যে পদ্ধতিতে রাসূল (স) পালন করেছেন সে পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ঐ পদ্ধতি ছাড়া খিলাফত কায়েম হতে পারে না।

৭. 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ'। আধুনিক সভ্যতা Divine Guidance বা স্রষ্টার বিধানের প্রয়োজন মনে করে না। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার জন্য নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা ও অভিজ্ঞতাকেই যথেষ্ট মনে করে। তারা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। কারণ, তাদের ধর্মে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রের জন্য কোনো বিধান নেই; বরং তারা ধর্মের নামে গির্জার শাসন চালু করে জনগণকে উন্নতি ও প্রগতির পথে বাধা দিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

বইটিতে যুক্তির মানদণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পর্যালোচনা করে এর মারাত্মক পরিণাম তুলে ধরা হয়েছে। প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে তারা কিছুতেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই বলেই এ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমরাও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে।

৮. 'নবীজীবনের আদর্শ'। এ বইয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল (স) শুধু ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, তিনি ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেই আদর্শ নন, তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ আইনদাতা, আদর্শ শাসক, আদর্শ বিচারক, আদর্শ সেনাপতি। তাই যারাই জীবনে আদর্শস্থানীয় মর্যাদা পেতে চায়, তাদেরকে বিশ্বনবীর জীবন থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৯ 'রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তাআলার ভূমিকা'। সূরা আলে ইমরানের ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ দাবি করেছেন যে, তিনিই যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসান, যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।

বইটিতে এ দাবির বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বে চিরকাল রাষ্ট্রক্ষমতার উত্থান-পতন তাঁরই রচিত চিরন্তন বিধান অনুযায়ীই হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধানই চালু থাকবে। ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় আল্লাহ তাআলা ঐ বিধানকেই চলতে দেন। তিনি কোনো পক্ষ অবলম্বন করেন না।

কিন্তু যারা দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রাসূল (স)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী চেষ্টা করেন অর্থাৎ আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের উদ্দেশ্যে যারা প্রচেষ্টা চালান, আল্লাহ তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের ব্যাপারে স্বাভাবিক বিধান প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য কতক শর্ত পূরণ করতে হবে। বইটিতে রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস থেকে পাঁচটি শর্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা পূরণ হলে আল্লাহর সাহায্য অনিবার্য এবং বিজয় নিশ্চিত।

১০. 'মুসলিম মা-বোনদের ভাবনার বিষয়'। তাফহীমুল কুরআনে সূরা নূর ও সূরা আহযাবে মহিলাদের পর্দার আয়াতগুলোর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা থেকেই বইটিতে মহিলাদের বাড়ির ভেতরে পর্দার বিধান কী এবং বাড়ির বাইরেই বা কেমন তা দেখানো হয়েছে, যেন মুসলিম মা-বোনেরা যথাযথভাবে বিবেচনা করতে পারেন।

আরেকটি নতুন বই

আমি প্রতি মাসে ছাত্রছাত্রী, সংগঠনের পুরুষ ও মহিলা দায়িত্বশীলগণের কয়েকটি স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করি। গত কয়েক সপ্তাহে সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

www.bjilibrary.com

আলোচনা করেছি। তাফহীমুল কুরআনে যা পেলাম, এর ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয় দাঁড়িয়ে গেল 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব'।

এ বিষয়ে একটি নতুন বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আল্লাহ তাওফীক দিলে শিগ্‌গিরই লেখা হয়ে যাবে বলে আশা রাখি।

২৮৭.

আমার পিতৃতুল্য শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকাল

১৯৯৩ সালের ১৫ জুন হাইকোর্টের আদেশে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পাই। আমার নাগরিকত্ব মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঘাদানিক ও গণ-আদালতের সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাত্র দেড় মাস পর আমার সর্বশেষ মুরব্বি পিতৃতুল্য শ্বশুর সাহেব তাঁর গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার সৈয়দপুরে ইন্তিকালের পূর্বে তাঁকে শয্যাগত অবস্থায় গিয়ে দেখতে পারলাম না বলে বেদনাবোধ করছি।

ইন্তিকালের দুই দিন আগেই ফোনে খবরদাতা ভুলে মৃত্যু সংবাদ দিয়েছে। ঢাকায় অবস্থানরত তাঁর সকল ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি গিয়ে জীবিত দেখতে পেয়ে সান্ত্বনাবোধ করেছে। তাদের উপস্থিতিতেই তিনি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। তিনি ঢাকায় এলে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার (আমার স্ত্রী) কাছেই বেশি সময় থাকতেন। তাই আমার স্ত্রী যদি তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে না পেতেন, তাহলে আজীবন দুঃখবোধ করতেন।

ধারাবাহিক লেখায় আমি ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি পৌঁছে গেছি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে শ্রদ্ধেয় শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকালের গুরুত্বপূর্ণ খবরটি যথাসময়ে লিখতে পারিনি। তাঁর সম্পর্কে লেখার এ উপলক্ষে আমার শ্বশুরপক্ষের আত্মীয়দের কথাও লিখতে চাই। আমার স্ত্রীর ভাই-বোন ও আমার ভায়রাদের কথা ইতঃপূর্বে লেখা হয়নি। আমার ভাই-বোন ও ভগ্নিপতিদের কথা বিভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯২ সালের মার্চ মাসে আমি গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে শ্বশুর সাহেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর এ মুরব্বির সাথে আমার দেখা হয়নি। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে আমার শাশুড়িআম্মা ঢাকায় আমার বাড়িতে ইন্তিকাল করেছেন। ১৫ বছর শ্বশুর সাহেব স্ত্রীহারা অবস্থায় জীবন যাপনের পর ইন্তিকাল করেছেন। সড়ক দুর্ঘটনায় কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ায় প্রায় দশ বছর কিছুটা পঙ্গু অবস্থায়ও কর্মতৎপর ছিলেন। শেষদিকে মৃত্যুর পূর্বে তিন মাস শয্যাগত থাকার পর ৯৮ বছর বয়সে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটেছে।

www.bjilibrary.com

আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি

আমার মুহতারাম শ্বশুর মাওলানা মীর আবদুস সালাম আমার পিতৃতুল্য মুরব্বি ছিলেন। আমার আব্বার ইন্তিকালের পর তাঁকেই আমার আব্বার স্থলাভিষিক্ত পেয়েছি। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে যখন আব্বার ইন্তিকাল হয়েছে, তখন আমি বিদেশে বাধ্যতামূলক নির্বাসনে ছিলাম।

১৯৭২ সালে আমার শ্বশুর ও শাশুড়ি এবং নানীশাশুড়ি হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফ গিয়েছেন। দুই বছর পর সেখানে তাদের সাথে দেখা হলো। তখন আমার সম্বন্ধি এ্যাডভোকেট এ টি সাদীও মক্কা শরীফে নির্বাসন জীবন যাপন করছিলেন।

আমি শ্বশুর সাহেবকে আব্বাজান বলে সম্বোধন করতাম। মক্কা শরীফে তাঁকে পেয়ে মনে হলো যেন আমার আব্বার অভাব পূরণ হলো। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমি দেশে আসা পর্যন্ত আব্বাজানের সাথে আমার নিয়মিত চিঠির আদান-প্রদান হতো। তাঁর চিঠি আমার জন্য প্রেরণার বিরাট উৎস ছিল। প্রতিটি চিঠির শুরুতে আরবীতে আমার জন্য দীর্ঘ দু'আসূচক কথা লেখা থাকত। প্রায় চিঠিতেই তিনি আমাকে সান্ত্বনা ও সাহস দেওয়ার উদ্দেশ্যে সূরা তালাকের ২ নং আয়াতের এ অংশটুকু উদ্ধৃত করতেন, যার অনুবাদ হলো 'যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তার জন্য (অসুবিধা থেকে) বের হয়ে আসার কোনো উপায় করে দেবেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' তাঁর এসব চিঠি প্রবাসজীবনে সত্যি আমার হিম্মত বৃদ্ধি করত। তাঁর প্রেরণাদায়ক চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম। তাঁর চিঠি পেলে অবিলম্বে আবার চিঠি লেখা প্রয়োজন মনে করতাম।

ইসলামী আন্দোলনের প্রতি তাঁর আগ্রহ

১৯৫১ সালে যখন আমার বিয়ে হয়েছে, তখন তিনি নওগাঁ ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৫৪ সালে আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর রংপুর থেকে নওগাঁয় বেড়াতে গেলাম। খাওয়ার সময় এক মেহমানকে দেখলাম। তিনি হলেন নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা ইবরাহীম নগরী। তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সভা করার জন্য নওগাঁ গিয়েছিলেন। তখন জানতে পারলাম যে, মাওলানা আবদুর রহীম নওগাঁয় জামায়াতের কোনো প্রোগ্রামে গেলে তাঁকেও এ বাড়িতে দাওয়াত করে মেহমানদারি করা হয়। নওগাঁ শহরে চকদেব নামক মহল্লার এ বাড়িটি আমার শ্বশুর সাহেবই তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন। যেকোনো উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যক্তি নওগাঁয় গেলে তাঁকে এ বাড়িতে মেহমান হতে হতো। ঢাকায় আমার বাড়িতে বেড়াতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। ঢাকায় তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের অভাব ছিল না। তাঁর বড় ছেলের বাড়ি গুলশানে। অথচ তিনি ঢাকায় এলে আমার বাড়িতেই বেশি অবস্থান করতেন। এর এক

www.bjilibrary.com

কারণ হলো, আমার এখানে তাঁর অতি আদরের কন্যা রয়েছে, যে পিতাকে পেলে সেবার হক আদায় করে ছাড়ে। আমি লক্ষ করেছি, আমার এখানে আরেকটা কারণে তাঁর আকর্ষণ রয়েছে। তা হলো মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখা উর্দু সাহিত্য। তিনি এলেই মাওলানার বই চেয়ে নিতেন। এমনকি যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেল, তখনো মাওলানার বই চাইতেন। আমার বড়ই মায়া লাগত, যখন দেখতাম যে তিনি বইকে একেবারে চোখের অতি কাছে নিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। মাওলানা মওদূদী (র)-এর বই সম্পর্কে তাঁর দুটো মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. ইবনে তাইমিয়ার পর তাওহীদের এমন বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য অন্য কারো লেখাতে দেখিনি।

২. মাওলানা মওদূদী (র) যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, পরিপূর্ণ হক আদায় করে ছেড়েছেন।

কুরআনের প্রেমিক

কুরআনের হাফেজগণ তাদের হিফ্জ বহাল রাখার প্রয়োজনে সারা দিনও তিলাওয়াত করতে পারেন; রমযান মাসে তারাবীহ্ পড়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়তে থাকেন। কিন্তু আমার আব্বাজানকে যেভাবে দীর্ঘ সময় কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখেছি, হাফেজ ছাড়া এমন অন্য কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তিনি কুরআনের অনুবাদ করার সময় আরবী ব্যাকরণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। মাঝে মাঝে আমার সাথে আলোচনা করতেন। সম্ভবত এ বিষয়ে আমার মধ্যে তেমন আগ্রহ লক্ষ না করায় তিনি একদিন মাওলানা আবদুর রহীমকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে বললেন। সে সময় মাওলানা আবদুর রহীমের জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক না থাকায় তাঁর সাথে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবু ফোনে মাওলানাকে অনুরোধ করলাম। তিনি আমার শ্বশুর সাহেবের আগ্রহের কথা জেনে আমার বাড়িতেই দেখা করতে এলেন। তাঁরা দুজন কয়েক ঘণ্টা একান্তে আলোচনা করলেন।

তিনি কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, এর প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারলাম না। আল্লাহ্ তাআলা যখন চান তখনই ব্যবস্থা হবে। তাঁর এ আশা পূরণের ব্যবস্থা হবে, এ আশায়ই তিনি রইলেন। সে ব্যবস্থা হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাঁর বড় কন্যা ও বড় পুত্রের ঘরের নাতিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ মহান কাজটি সমাধা হচ্ছে। তাঁর সুযোগ্য নাতিরা এ মহান প্রচেষ্টায় আত্মীয়-স্বজনকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হওয়ায় প্রকাশনার অর্থ সংগ্রহের জন্য বাইরে কারো কাছে সাহায্য চাইতে হয়নি। প্রয়োজনীয় টীকাসংবলিত অনুবাদটি প্রকাশনার দায়িত্ব এ দেশের প্রখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'খোশরোজ কিতাব মহল' গ্রহণ করায় আমি অত্যন্ত উৎসাহবোধ

www.bjilibrary.com

করে প্রকাশক জনাব মহিউদ্দিন আহমদকে ফোনে মোবারকবাদ জানালাম। অনুবাদকের আশা আল্লাহ্ তাআলা পূরণ করায় আমার ধারণা হয়েছে যে, আল্লাহর দরবারে এ অনুবাদ মকবুল হয়েছে।

একজন স্বকৃত (Selfmade) সফল ব্যক্তিত্ব

মাওলানা মীর আবদুস সালাম একজন স্বকৃত ব্যক্তিত্ব। বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়া সত্ত্বেও কিশোর বয়সে হিম্মত করে তিনি ইয়াতীম অবস্থায় নিজের উৎসাহ ও প্রেরণাকে সম্বল করে নিজের উদ্যোগে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেছেন। আরবী, উর্দু ও ফার্সি ভাষা তো মাদরাসার মাধ্যমেই আয়ত্ত করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় মনের ভাব স্বাচ্ছন্দে প্রকাশ করার যোগ্যতাও অর্জন করেছেন। তাঁর মুখেই আমি শুনেছি, ইংরেজি ও বাংলা শেখার ব্যাপারে মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী ও তাঁর ভাই মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন।

হাই স্কুলে আরবী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে ক্রমে কলেজে আরবী ভাষার অধ্যাপনা করেছেন। পূর্ণ কর্মজীবনে স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করার পর অবসর জীবনে কামিল মাদরাসায় বুখারী শরীফের উস্তাদ হিসেবে সফল হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর। এতে বোঝা যায়, স্কুল-কলেজে শিক্ষকতাকালেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাদীস গ্রন্থের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। তা না হলে ৩০-৪০ বছর পর হঠাৎ করে বুখারী শরীফের উস্তাদ হওয়া কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

কুরআনের অনুবাদের কাজটিও সহজসাধ্য নয়। কুরআন চর্চা তাঁর আজীবন সাধনার বিষয় ছিল। আরবী ভাষার অধ্যাপক হিসেবে তিনি কুরআনের ভাষাকে গবেষণার দৃষ্টিতে চর্চা করতেন বলেই অনুবাদের সঠিক কাজটি তিনি সমাধা করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর শিক্ষকতার পেশায় অর্জিত সামান্য আয়ে আল্লাহ্ তাআলা যথেষ্ট বরকত দিয়েছেন। তিনি নিজ জেলা বগুড়ার গ্রামে জমিজমা খরিদ করে আয় বৃদ্ধি করেছেন এবং নওগাঁ শহরে তিন তলা বাড়ি করেছেন। তিনি শুধু ছেলেদেরকে উচ্চশিক্ষিত করাননি, কন্যাদেরকেও নিজে পড়িয়ে মাদরাসা পাস করিয়েছেন। তাঁর বড় মেয়ে এ দেশে প্রথম কামিল পাস মহিলা। আমার স্ত্রীকে আলিম পাস করিয়েছেন; কিন্তু আমি আর তাকে পড়ার সুযোগ দিতে পারিনি।

আমার শ্বশুর সাহেব আহলে হাদীস ছিলেন। ঐ মহলে বড় আলেম হিসেবে গণ্য ছিলেন। তাঁর ছোট বোনের সাথে জমিয়তে আহলে হাদীসের আজীবন সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশীর বড় ভাই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের এককালীন সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর বিয়ে হয়েছে। তাঁরই বড় ছেলে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী জমিয়তে আহলে হাদীসের আজীবন সভাপতি ছিলেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.bjilibrary.com

শ্বশুর সাহেবের সন্তানগণ

তাঁর পাঁচ ছেলে ও চার কন্যা। বড় ছেলে সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট মীর এ. টি. সাদী। কুষ্টিয়া কলেজে ইংরেজির অধ্যাপনাকালে তাঁরই উদ্যোগে আমার সাথে তাঁর দ্বিতীয় বোন সাইয়েদা আফিফার বিয়ে হয়েছে। তিনি '৭১ সালে জাতিসংঘে পাকিস্তান ডেলিগেশনের সদস্য ছিলেন। নিউইয়র্কে তাঁর অবস্থানকালেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। শেখ মুজিব সরকার তাঁকে আরো অনেকের সাথে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। তিনি সৌদি আরবের প্রিন্স মুহাম্মদ আল ফায়সালের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বছর নির্বাসিত জীবন যাপন করেছেন।

অধ্যাপিকা সাইয়েদা যাকিয়া খাতুন তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর স্বামী মাওলানা শফিউর রহমান কামিল ও এমএ পাস করে আর্কিওলজি (পুরাততত্ত্ব) বিভাগে অফিসার হয়েছেন। যেদিন তাঁর বিদেশে উচ্চডিগ্রির জন্য রওয়ানা হওয়ার কথা, সেদিনই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি দুবছর ও পাঁচ মাস বয়সের দুটো ছেলে রেখে গেছেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তাঁর স্ত্রী বাকি জীবন অবিবাহিতা থেকে শিক্ষকতা করে দুই ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজে ডবল এমএ পাস করেছেন। সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন।

আমার স্ত্রী শ্বশুর সাহেবের তৃতীয় সন্তান। তাঁর চতুর্থ সন্তান সাইয়েদা মুহসিনা। তার স্বামী অধ্যক্ষ শাহ রুহুল ইসলাম রংপুর কারমাইকেল কলেজে বিএ ক্লাসে আমার ছাত্র ছিল। তার পিতা রংপুর জেলা নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ও পাকুরিয়া শরীফের পীর সাহেব মাওলানা শাহ আফযালুল হক। শাহ রুহুল ইসলামও পীর হিসেবেই পরিচিত।

আমার ছাত্র ও ভায়রা শাহ রুহুল ইসলাম বহু বছর বৃহত্তর রংপুরে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ঐ পুরো সময় কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার বেসরকারিভাবে তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করার পর রংপুর সেনাসদরে ব্যালটবাক্স নিয়ে স্বৈরশাসক এরশাদের নির্দেশে ফলাফল বদলে দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৬ সালে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে এক মহাসম্মেলনে গিয়েছিলাম। মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান তখন সে দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তিনি আমার দূরসম্পর্কে আত্মীয়। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করে একান্তে জানালেন যে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে তিনি জিওসি থাকাকালে এরশাদের নির্দেশে পীর সাহেবের বিজয়কে ছিনিয়ে নেওয়ার অপরাধ যেন পীর সাহেব ক্ষমা করেন। আমাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন যেন আমি পীর সাহেবকে

www.bjilibrary.com

এ কথা বলি। দেশে ফিরে পীর সাহেবকে বলেছি। তিনি ক্ষমা করেছেন কি না জানি না। আমি সেকথা জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করিনি।

আব্বাজানের পঞ্চম সন্তান অধ্যাপক মীর আবুল খায়ের আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব। গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল থেকে ঢাকায় শিক্ষা অধিদপ্তরে বদলি হয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছে। সে আমার চার শালা সাহেবদের মধ্যে সবার বড়।

ষষ্ঠ সন্তান মীর আকরাম। এককালে গ্রাজুয়েট শিক্ষক ছিল। এখন একটি বস্ত্রশিল্পের তত্ত্বাবধায়ক।

সপ্তম সন্তান মীর আবুল ফযল। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি সাংবাদিক হিসেবে আজীবন কর্মরত থেকে এখন অবসর জীবন যাপন করছে।

অষ্টম সন্তান মীর ইসহাক। এমএ পাস করে সরকারি ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় কর্মকর্তা ছিল। পরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে স্কুল শিক্ষক।

নবম সন্তান আমার আদরের শালী সাইয়েদা নাসীমা। আমার বিয়ের সময় সে ছোট্ট শিশু ছিল। বড় শালী তখন বিয়ের বয়সের। তাই পর্দার কারণে সে শালীগিরি করার সুযোগ পায়নি। শালী-দুলাভাই সম্পর্ক শুধু একজনের সাথেই গড়ে উঠেছে।

নাসীমার ছোট ফুফু (ড. এমএ বারীর আম্মা) তাঁর ছোট ছেলে আনওয়ারের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য বড় ভাইয়ের নিকট আবদার জানালে তার সাথে নাসীমার বিয়ে হয়েছে। এ বিয়ের ফলে আমার প্রিয় শালা ভায়রার প্রমোশন পেল। এমএসসি, বিএল পাস করার পর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলে শিক্ষকতা, পারিবারিক সম্পত্তির (বিরাট বাড়ি ও বহু জমিজমা) তদারকি ও জামে মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব নিয়ে গ্রামেই থেকে গেছে। সম্প্রতি প্রধানশিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করে ঐতিহ্যবাহী পরিবারের উত্তরাধিকারীর দায়িত্ব সে-ই পালন করছে।

আমার শ্বশুর সাহেব তাঁর ছেলেদের দীর্ঘ দীর্ঘ নাম রেখেছেন। আরবী অক্ষরের 'আবজাদ' পদ্ধতির সংখ্যা অনুযায়ী জন্মের সালের মিল করে রাখতে গিয়ে নামগুলো বিরাট আকার ধারণ করেছে। আত্মীয় মহলে যে নামে তারা সহজে পরিচিত, সে নামই আমি উল্লেখ করেছি। তিনি কন্যাদের নামের পূর্বে সাইয়েদা এবং পুত্রদের নামের পূর্বে মীর লিখতেন।

আমার ভাই-বোনদের সন্তানাদি

আমার ছয় ছেলে ও বিশ জন নাতি-নাতনির কথা বিভিন্ন উপলক্ষে বেশ কতক কিস্তিতে লেখা হয়েছে। আমার ভাই-বোনদের কথা বিভিন্ন সময় লেখা হলেও তাদের সন্তানাদির কথা লেখা প্রয়োজনবোধ করছি। তাদের কথা লিখলে তারা আমার এ সব লেখা পড়ে

www.bjilibrary.com

খুব খুশি হবে। বিশেষ করে আমার মেয়ে না থাকায় আমার ভাই-বোনদের মেয়েরাই সে অভাব পূরণ করছে। আমি তাদের মাধ্যমেই নানা হয়েছি।

আমরা ৪ ভাই ও ৫ বোন ছিলাম

আমি সবার বড়। ডা. মু গোলাম মুয়াযযাম দ্বিতীয়। এরপর প্রথম বোন শামসুন নাহার। তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বোন নূরুন্নাহার ও আনওয়ারা। ৪র্থ ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. মুহাম্মদ মাহদীউযযামান। চতুর্থ ও পঞ্চম বোন জাহান আরা ও জান্নাত আরা।

আল্লাহর রহমতে আমরা চার ভাই-ই এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বোন আব্বা-আম্মার জীবিতকালেই মারা যায়। প্রথম বোন তিন ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছে। দ্বিতীয় বোন বিয়ের বয়স হওয়ার পর মারা গেছে। আব্বা তখন কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় ছিলেন। সেখানেই ঐ বোনের কবর। মোকামবাড়ি মসজিদের পাশেই কবরটি সংরক্ষিত।

প্রথম বোনের বড় মেয়ে ফেরদৌস, এরপর তিন ছেলে কামাল, জামাল, জালাল। ছোট মেয়ে নাঈমার (বর্তমানে অধ্যাপিকা) বয়স যখন মাত্র ৪০ দিন, তখনই ওর মা মারা গেছে। আব্বা মগবাজারের জমি বন্টনের সময় এদের মা বেঁচে থাকলে যতটুকু জমি পেত, ততটুকুই দান করেছেন। সে জমিতে বর্তমানে নির্মাণ কোম্পানি বিল্ডিং তৈরি করছে। এরা ৫ ভাই-বোন প্রত্যেকেই একটি করে ফ্ল্যাট পাচ্ছে। এদের পিতা ডা. আবদুল হাই এখনো বেঁচে আছেন। বয়স নব্বই বছর।

আমার ছোট ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযামের এক মেয়ে ও দুই ছেলে। বড় মেয়ে ডা. নাঈমা (ডাক নাম মুনীরা) ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি ও মাইক্রো-বাইওলজির প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। আমার ভাই তৃপ্তির সাথে উল্লেখ করে যে, আমার মেয়ে ঐ অফিস ও ঐ চেয়ারেই বসে, যেখানে আমি বসতাম। ডা. মুয়াযযাম ঐ পদেই একসময় ছিল। তার মেয়ের পর দু ছেলে। বড়টি সোহায়ল। সে ব্রিটিশ নাগরিক। ম্যানচেস্টারে নিজের বাড়িতেই থাকে। আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীনের সাথে ব্যবসায়ে জড়িত। ছোট ছেলে ডা. ফায়সাল শল্য-চিকিৎসক। স্ত্রী ও তিন কন্যাসহ বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছে। সেখানেও চিকিৎসা পেশায় কর্মরত।

তৃতীয় ভাই চিফ ইঞ্জিনিয়ার (অব) মুহাম্মদ গোলাম মুকাররাম। তার তিন মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে ফৌজিয়া আমেরিকায়। তার স্বামী আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ার। সে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিল। বর্তমানে সরকারি ল্যাবরেটরিতে উর্ধ্বতন পদে কর্মরত। দ্বিতীয় সন্তান সালেহ ঢাকায়ই প্রিন্টিং ব্যবসায় কর্মরত। দ্বিতীয় মেয়ে ফারহানার স্বামী ঢাকায় ব্যবসায়ী এবং তৃতীয় মেয়ে ফাহীমার স্বামী ঢাকায় চাকরি করে।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় বোন আনওয়ারার নয় ছেলে ও দুই মেয়ে। তার স্বামী এ্যাডভোকেট মসীহুর রহমান আমার সহপাঠী বন্ধু। মোমেনশাহী শহরে বাড়ি করে বসবাস করতেন। ২০০১ সালে তিনি এবং ২০০৫ সালে আমার বোন মারা গেছে। মেয়ে কাউসার ও ইসমাতের স্বামী হাফেজ ও আলেম। নয় ছেলের মধ্যে দুজন হাফেজ, এক ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আরেক ছেলে কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। ছেলেদের নাম খালেদ, যুবায়ের, শোয়াইব, সা'দ, রাশেদ, তারেক, সাদেক, সুফিয়ান ও জাবের। এরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত।

চতুর্থ ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. মুহাম্মাদ মাহদীউয্যামান। তার প্রথম স্ত্রীর ঘরে তিন মেয়ে ও এক ছেলে। সবার বড় সন্তান মাহবুবা ঢাকায়। স্বামী শিক্ষক। দ্বিতীয় সন্তান ড. মুনীরুয্যামান সম্প্রতি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করল। সে ব্রিটিশ নেভিতে বেসামরিক অফিসার। তার ছোট দুবোন ডা. মাকসুদা ও ডা. মুসাররাত ঐ দেশেই সরকারি জিপি (জেনারেল প্র্যাকটিশনার)। তিনজনের জন্ম ঐ দেশেই। এরা বাংলা খুব সামান্যই বোঝে; কিন্তু বলতে পারে না। মাহদীর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে মাত্র একটি মেয়ে সানজিদা। এর বিয়ে হয়েছে কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত এক বাংলাদেশির সাথে। ড. মাহদী সায়েন্স ও টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এ ডীন হিসেবে কর্মরত থেকে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ বোন জাহান আরা এমএ (বাংলা)। সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকার আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মরহুম মাওলানা আলাউদ্দীন আল আযহারী তার স্বামী। তাদের কোনো সন্তান হয়নি। আমাদের প্রথম বোন ৪০ দিনের যে শিশুকে রেখে মারা গেছে নাঈমা নামের সে মেয়েটিকে জাহান আরাই লালন-পালন করেছে। বিয়ের পর তার স্বামীও এ মেয়েটিকে সন্তানের মতোই গণ্য করেছেন এবং তাঁর প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুফায্যাল হোসাইন খানের নিকট বিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্তান জাহান আরার সাথেই নাঈমা ও ওর স্বামী বসবাস করে। জাহান আরার প্রিয় সন্তান হিসেবে তারা দায়িত্ব পালন করছে। নাঈমা ঢাকায় এক কলেজে বাংলার শিক্ষক। সে এমএ ও এমএস। মাওলানা মুফায্যাল হেসাইন খান (এমএ) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অবসরপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর। তাদের বড় মেয়ে সামিনা। বিমানবাহিনীর অফিসার খালেদ সাইফুল্লাহ্র সাথে ওর বিয়ে হয়। এরপর দুছেলে। বড়টি মারূফ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ছোট ছেলে মুবিন কলেজে পড়ে।

আমাদের সর্বকনিষ্ঠ ও পঞ্চম বোন জান্নাত আরা। তার স্বামী পীরজাদা মাওলানা সৈয়দ শরিয়তুল্লাহ মগবাজারে নিজের বাড়িতেই আছেন। তিনি এ এলাকার ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এবং বাংলাদেশ কাজী সমিতির সভাপতি। জান্নাতের বড় ছেলে মুস্তাকীম সপরিবারে আমেরিকায় আছে। মেজ ছেলে মুস্তাঈন ঢাকায়ই থাকে। ছোট ছেলে মুসতাহসিন মারা গেছে। মুস্তাকিমের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন (রাবু)। ওদের তিন ছেলে নাভিদ, রাকিব ও রাইয়ান। মুস্তাঈনের স্ত্রী আফসানা আলী (লিভ)। ওদের দুমেয়ে মুসতাহসিনা ও দাহেকা, ছেলে নাকীব।

www.bjilibrary.com

আমার চাচাদের কথা

আমার দাদা মাওলানা আবদুস সুবহানের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। আমার আব্বা মাওলানা গোলাম কবীর সবার বড়। তাঁর চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ের বিবরণ উপরে লিখেছি। ১৯৭৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেছেন। মগবাজার কাজী অফিস লেনে তাঁর নির্মিত মসজিদের পাশেই তাঁর কবর।

দাদার দ্বিতীয় ছেলে মরহুম মাস্টার গোলাম কিবরিয়া গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ে। আমরা চার ভাই ও পাঁচ বোন, আর ওরা পাঁচ ভাই ও চার বোন। এ চাচা ৮৩ বছর বয়সে ১৯৮৪ সালে ইনতিকাল করেছেন। সবার বড় যহুরে সারওয়ার কমার্স গ্রাজুয়েট এবং আজীবন একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত থেকে অবসর নিয়েছেন। ঢাকায় নিজের বাড়িতেই ছেলেদের সাথে থাকেন। তার স্ত্রী ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সচিব শাহ আবদুল হান্নানের বোন। তিনি ক্যান্সারে মারা গেছেন।

এর ছোট ভাই গোলাম মুস্তাফা শৈশবেই বর্ষাকালে পানিতে ডুবে মারা গেছে। এ নামটা আমি রেখেছিলাম বলে ওর মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছি। তৃতীয় ভাই প্রফেসর কুদরত-ই-খোদা (ডাক নাম হুমায়ুন) বরিশাল সরকারি বিএম কলেজে দর্শনের অধ্যাপক থাকার পর ঝালকাঠি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছে। সপরিবারে ঢাকায়ই থাকে। আপন চাচাত বোন বুলবুলকে বিয়ে করেছে এবং ঐ চাচার প্রতিষ্ঠিত নিজ গ্রামের হাই স্কুলের পরিচালক কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছে।

চতুর্থ ভাই মাহবুব (বিএ) সৌদি আরবে চাকরি করে বর্তমানে ঢাকায় চার তলা বাড়ির মালিক। বাড়ির ভাড়ায়ই তার সংসার চলে।

পঞ্চম ভাই মাহমূদ (বিকম) ঢাকায়ই সরকারি কর্মচারী। বোনদের মধ্যে সবার বড় নূরুল কামার। তার মরহুম স্বামী নূরুল হক পেশকার, মালিবাগে পাঁচ তলা বাড়ি রেখে গেছেন। সেখানেই সে বড় ছেলের সাথে থাকে। দ্বিতীয় বোন রোকেয়া কয়েক বছর আগে মারা গেছে। ওর স্বামীও পরে মারা গেছেন। ঢাকায় তিনি নিজস্ব বাড়ি রেখে গেছেন। তৃতীয় বোন হাসিনার স্বামী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছে। বেচারি কষ্ট করে ব্যবসা চালিয়ে ছেলেদেরকে মানুষ করেছে। ঢাকায় নিজের বাড়িতেই থাকে। বড় ছেলে ব্যবসায় চালায়। চতুর্থ বোন শওকত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রেখে অল্প বয়সেই মারা গেছে। ওর স্বামী সন্তানদেরকে মানুষ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের তৃতীয় চাচা আবু তাইয়েব ঢাকা কলেজে পড়ার সময় যক্ষারোগে মারা গেছেন। তখন এ রোগের চিকিৎসা ছিল না। আমি তখন খুব ছোট। মৃত চাচার কথা সামান্য মনে পড়ে।

চতুর্থ চাচা মরহুম জনাব জহিরুল হক দীর্ঘদিন বিভিন্ন হাই স্কুলে প্রধানশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর নিয়েছেন। তিনি বিবাহ ও চাকরি উপলক্ষে মৌলভীবাজার জেলার কমলপুর থানা এলাকায় বাড়ি করে স্থায়ী হয়েছেন এবং সেখানেই মারা গেছেন।

www.bjilibrary.com

এ পক্ষের সন্তানাদি সেখানেই বসবাস করে। তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান শিরীন। তিনি প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। শিরীনকে আমার আব্বাই লালন-পালন করে বিয়ে দিয়েছেন।

ছোট চাচার কথা

আমাদের ছোট চাচা এ্যাডভোকেট শফীকুল ইসলাম ১৯৯০ সালে ঢাকায় ইন্তিকাল করেছেন। বয়সে আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়। ছোট সময় একসাথে খেলেছি বটে, কিন্তু তিনি আমার মুরব্বি হিসেবেই গণ্য ছিলেন। তিনি আজীবন মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন। শেখ মুজিব সরকার তাঁর নাগরিকত্বও হরণ করেছে। '৭২ সালে তিনিও আমার মতো পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানেই থেকে গেছেন এবং লাহোর হাই কোর্টে আইন-ব্যবসায় করেছেন; পাকিস্তানে বসবাসরত বাংলাভাষীদের অধিকার সংরক্ষণে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন।

তিনি শেখ মুজিবের সমবয়সী ও কলকাতায় বেকার হোস্টেলে থেকে দুজনই পড়াশোনা ও মুসলিম ছাত্রলীগ করতেন। তাঁদের মধ্যে তুই-তোখার সম্পর্ক ছিল। মুসলিম লীগ নেতৃত্বে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আর আমার চাচা খাজা নাজিমুদ্দীনের সাথে রাজনীতি করতেন। চাচার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি তাঁর সামান্য অনুগ্রহও কামনা করেননি। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহালের কোনো চেষ্টা করাও পছন্দ করেননি। অসুস্থ অবস্থায় পাকিস্তানি পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে ঢাকায় এসেছেন এবং সরকারের নিকট থেকে নাগরিকত্বের স্বীকৃতি ছাড়াই নিজের জন্মগত নাগরিকত্ব নিয়ে বনানীর বিখ্যাত গোরস্তানে নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। ছোট চাচার স্ত্রী দূরসম্পর্কে আমার ভাগ্নি। আমি তাকে চাচি ডাকি। তিনি আমাকে মামা ডাকেন।

আমাদের একজন মাত্র ফুফু ছিলেন। তাল শহর গ্রামের বিখ্যাত মৃধা পরিবারের জনাব আবদুল হামীদ মৃধার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছে। তিনি ভৈরব বন্দরে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। ফুফুর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তানের মতো আদর করতেন।

ছোট চাচার সন্তানাদি

ছোট চাচার নয় ছেলে ও তিন মেয়ে। সবার বড় বুলবুল, যার সাথে বড় চাচার ছেলে হুমায়ূনের বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়ে বকুলের স্বামী ঢাকায় ব্যাংকার। তৃতীয় মেয়ে শিমুলের স্বামী ইঞ্জিনিয়ার ও এক কোম্পানিতে কর্মকর্তা।

নয় ছেলের মধ্যে সবার বড় বেলাল। কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। জাতিসংঘের একটা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা। দ্বিতীয় ছেলে হেলাল আমেরিকার ফ্লোরিডায় বহু বছর

www.bjilibrary.com

থেকেই আছে। তৃতীয় ছেলে দুলাল ও চতুর্থ ছেলে ডা. নেহাল তাদের পিতার অভিভাবকত্বে পাকিস্তানে লেখাপড়া করেছে। দুলাল সিএসপি পাস করে সরকারের বৈদেশিক বিভাগে কূটনীতিক। অল্প দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবে। চতুর্থ ছেলে নেহাল ডাক্তারি পাস করে কয়েক বছর ইরানে ছিল। বর্তমানে আমেরিকায় আছে। পঞ্চম ছেলে বাবুলও সেখানেই। ষষ্ঠ ছেলে রুমেল ও নবম ছেলে ফযল দেশেই আছে। তারা দুজনই গ্রাজুয়েট। সপ্তম ছেলে বাহলুলও অষ্টম ছেলে ইকবাল আমেরিকায় থাকে।

এ চাচাত ভাইদের একজন ছাড়া সবারই ডাক নাম ও আসল নাম আলাদা। আমি ডাক নামই লিখেছি। আত্মীয়-স্বজন এ নামেই চেনে।

আমাদের পূর্বপুরুষ

দাদার কাছে শুনেছি যে, দাদার আব্বা শায়খ মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন মুন্সীর পূর্বে আরো ছয় পুরুষ পর্যন্ত একজন করে বেঁচে ছিলেন। তাই আমাদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি। পূর্বপুরুষগণের নাম দাদার নিকট থেকে জেনে নেওয়ার সুযোগ হয়নি। আব্বার নিকট থেকে আমার ছোট ভাই ডা. মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম আরো দুপুরুষ পর্যন্ত জানতে পেরেছে। আমার দাদার দাদার নাম শায়খ মুহাম্মদ বখতিয়ার এবং তাঁর পিতার নাম শায়খ মুহাম্মদ যাকী। আমার দাদা বংশীয় পদবি হিসেবে শায়খ শব্দটি লিখেননি। এভাবেই পরবর্তীতেও আর লেখা হচ্ছে না।

এসব নামের ধরন ও আমাদের দৈহিক গঠন থেকে মনে করা হয় আমাদের পূর্বপুরুষ অন্য কোনো দেশ থেকে এ দেশে এসেছেন; কিন্তু সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

২৮৮.

শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশিত আমার লেখা 'শেখ হাসিনার দুঃশাসনের পাঁচ বছর' নামের বইটিতে লিখেছি :

বিগত পাঁচ বছরের কুশাসনকে আমি আওয়ামী লীগের শাসন না বলে, শেখ হাসিনার অপশাসন বলাই অধিকতর সঠিক বলে মনে করি। কারণ, তিনি তার দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দাম্ভিক, হিংস্র, উগ্র, সন্ত্রাসী, কটুভাষী, চাপাবাজ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও আক্রমণাত্মক। তার শাণিত জিহ্বা বিষ দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়।

সাধারণত, দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরমপন্থি ও উগ্র কিছু লোক থাকে। দলীয় প্রধান তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। নেতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করার গুণটা না থাকলে চলে না। বিশ্বে শেখ হাসিনাই এ বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম। তার উদাহরণ একমাত্র তিনিই। দুটো উদাহরণই এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট :

www.bjilibrary.com

"চট্টগ্রামে এইট মার্ডারের ঘটনার পরপরই তিনি সেখানে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল এর সুষ্ঠু তদন্তের নির্দেশ দান এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া। তিনি এর বিপরীত আচরণই করলেন। বিনা তদন্তে তিনি তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে তার দলের সন্ত্রাসীদেরকে এজন্য ভর্ৎসনা করলেন যে, তারা এর প্রতিক্রিয়ায় কেন আট জনের বদলে ৮০ জনকে খুন করল না। তিনি তাদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে? তিনি নির্দেশ দিলেন, যেন একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলা হয়। শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে তিনি এ হিংস্র ভূমিকা পালন করেননি। দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রধান দায়িত্বে অবস্থান করেও তিনি এমনভাবে কেমন করে বলতে পারলেন তা বিশ্বের বিষম বিস্ময়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হলো, তার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকুল ইসলামকে অপসারণ করে মোহাম্মদ নাসিমকে এ পদে নিয়োগদান। যে নরহিংস্রতা ও প্রতিহিংসা নিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা তিনি জরুরি মনে করেন, মেজর রফিক সে বিবেচনায় সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হলো।

শেখ হাসিনার এমন একজন যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজন ছিলেন, যিনি তার মানের সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনে সক্ষম, যার জিহ্বা তার মতোই শাণিত, যে গোটা পুলিশ বাহিনীকে দলীয় সন্ত্রাসীদের দোসরের ভূমিকা পালনে বাধ্য করতে সক্ষম, যে বিরোধী দলকে চরমভাবে দমনের জন্য তার প্রতিটি নির্দেশ সন্তোষজনকভাবে পালনে পারঙ্গম, যে বোমা বিস্ফোরণের নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিনা তদন্তে ও বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে হামলা, মামলা, যুলুম ও নির্যাতন চালাতে বাহাদুরির পরিচয় দিতে পারে এবং যে বিচারপতিগণকে লাঠির ভয় দেখিয়ে শেখ হাসিনার ইচ্ছা মোতাবেক আদালতকে রায় দিতে বাধ্য করার কৌশল জানে।

এ দুটো প্রমাণই আমার এ দাবির জন্য যথেষ্ট যে, আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেশের সর্বনাশের জন্য প্রধান দায়ী নয়, প্রধান দায়ী শেখ হাসিনা। এ দলের একমাত্র মূলধন শেখ মুজিব। তাই এ দলের নেতৃত্বে মুজিবকন্যার মর্জির সাথে সামান্যও খাপ খায় না এমন চিন্তার লোকের কোনো স্থান নেই। যদি কেউ সামান্য ধৃষ্টতাও প্রদর্শন করে তাহলে তার দশা অবশ্যই ড. কামাল হোসেন ও কাদের সিদ্দিকীর মতোই দল ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে।"

উক্ত পুস্তকে আমি স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছি যে, তিনি বাংলাদেশের মহাসর্বনাশ করেছেন। কী কী সর্বনাশ করেছেন, এর বিবরণ ৫টি শিরোনামে পরিবেশন করছি :

১. বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি বানানো।

২. গণতন্ত্র হত্যার অপচেষ্টা।

www.bjilibrary.com

৩. ইসলামকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র।

৪. আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ধ্বংস করা।

৫. জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি।

মাত্র ৪০ পৃষ্ঠার এ বইটিতে আমি অখণ্ডনীয় তথ্য-প্রমাণ দিয়েছি। মানুষ এত কথা মনে রাখতে পারে না বলে আমি সেসব তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছি। বর্তমানে (নভেম্বর ২০০৬) শেখ হাসিনা চরম সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই ঐসব বিষয় জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি

২০০৫ সালের মার্চ মাসে উপরিউক্ত শিরোনামে ২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকায় ঐ রাজনীতির বিবরণ দিয়েছি। নিম্নে উক্ত পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনের দিন শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে 'স্থূল কারচুপি' হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি শপথ নেবেন না বলে ঘোষণা করেন। বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত শপথ নেন বটে, কিন্তু এক বছর পর্যন্ত তার দলীয় সদস্যদেরকে সংসদে যেতে দেননি।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে তার দলকে পরাজিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ, সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধানকে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করেন। তার স্বভাবসুলভ অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কয়েকবার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়ার পর অতিষ্ঠ হয়ে প্রেসিডেন্ট অতীব শালীন ভাষায় এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান।

তিনি প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচন দাবি করেন। ২০০২ সাল থেকেই তিনি জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আসছেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে তার দলের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বেগম জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। ৩ অক্টোবর (২০০৪) পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে তিনি বেগম জিয়াকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান।

প্রশ্ন হলো, আবার নির্বাচন হলেই তার দলের ক্ষমতাসীন হওয়ার নিশ্চয়তা কে দেবে? যদি তিনি বিজয়ী হতে না পারেন তাহলে আবার তিনি নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবেন। তাকে বিজয়ী করার যোগ্য প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকার প্রধান, নির্বাচন কমিশন প্রধান, সেনা ও পুলিশপ্রধান তিনি কেমন করে জোগাড় করবেন? সুতরাং নতুন করে নির্বাচনে কেমন করে তার বিজয় নিশ্চিত হবে?"

www.bjilibrary.com

পুস্তিকাটিতে শেখ হাসিনার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বের রাজনীতি, ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজনীতি ও ক্ষমতা হারানোর পরের রাজনীতির তুলনামূলক আলোচনা করেছি। আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে সুফল না পেয়ে শেষ ভরসা হিসেবে ভারতে গিয়ে কী করলেন তাও লিখেছি।

এরপর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হুমকি, আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক ও কারা স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ তা আলোচনা করেছি। সর্বশেষে আওয়ামী লীগ যে বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায় এর তথ্যভিত্তিক প্রমাণ দিয়েছি।

এ পুস্তিকা আসলে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' নামক বইয়ের অংশবিশেষ। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ৭২ পৃষ্ঠার উক্ত বইটির ভূমিকা এখানে উদ্ধৃত করছি, যাতে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় :

"২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে এমন আজব ধরনের রাজনীতি চালু হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নির্বাচিত সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও জনবিচ্ছিন্ন বামপন্থিরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যকে তারা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী উত্থান বলে আখ্যা দিয়ে চারদলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিধ্বংসী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জোট সরকারকে অপসারণ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' রক্ষার জন্য সরাসরি ভারতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের পত্র-পত্রিকার প্রচারাভিযান তাদেরকে উৎসাহ জোগাচ্ছে এবং ভারতও তাদের এ তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

এসব ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। তাদের তৎপরতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তারা ইসলামী শক্তির উত্থানকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ভারতের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য মনে করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদানকে পুঁজি করে তারা দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকারী বলে মনে করতে পারেন; কিন্তু দেশের জনগণ ভারতের আধিপত্যের চরম বিরোধী।

তাই যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপ করার আকাঙ্ক্ষী তাদেরকে জনগণ স্বাধীনতার পক্ষশক্তি বলে কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না। তাদের হাতে আজ স্বাধীনতা বিপন্ন কি না, তা বিবেচনা করার জন্য এ পুস্তিকায় যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

বিদেশে শেখ হাসিনার দেশবিরোধী অপপ্রচার

বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেতা সরকার ও সরকারি দলের বিরুদ্ধে যা কিছু বলার তা দেশের জনগণের নিকট প্রকাশ করেন। কেউ বিদেশে গিয়ে সেসব প্রচার করে বেড়ান না। নিজের দেশের দুর্নাম হোক, তা কেউ চাইতে পারেন না।

গত শীতকালে (২০০৫) আমাদের কাওমী মাদরাসার আলেমগণের এক সম্মেলন পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মেহমান হিসেবে পাকিস্তান পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় নেতা মাওলানা ফযলুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন। কোনো এক সময় তাঁর সাথে সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ হলে তারা তাঁকে বিরোধী দলের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফের আচরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। সাংবাদিকরা জানেন যে, প্রেসিডেন্টের সাথে বিরোধী দলের গুরুতর বিরোধ চলছে। মাওলানা সাহেব অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেও এ প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'আমার দেশের সরকারি ও বিরোধী দলের মতবিরোধ অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিদেশে এ বিষয়ে আমি কিছু বলা সমীচীন মনে করি না।' এটাই হলো গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও দেশপ্রেমের প্রমাণ।

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নিউইয়র্কে ২০০২ ও ২০০৩ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অপপ্রচার চালিয়েছে, যাতে আমেরিকা আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশেও হামলা চালায়। তারা চারদলীয় জোট সরকারকে তালেবানী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সরকার, এমনকি বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলে অপবাদ দিতে থাকেন।

শেখ হাসিনা ব্রিটেন ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়েও এসব প্রচারণা চালিয়েছেন। তার অপপ্রচারের আরেকটি বিষয় আরো মারাত্মক। জোট সরকার নাকি বাংলাদেশের অমুসলিম সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপক হারে নির্যাতন চালাচ্ছে।

বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইউরোপের যে রাষ্ট্রদূত আছেন, তাদের নিকট থেকে শেখ হাসিনার মিথ্যা অভিযোগের সামান্য সত্যতাও না পেয়ে তারা শেখ হাসিনার প্রচারণায় একটুও প্রভাবিত হননি।

হতাশ-হাসিনার ভারত সফর

'বাংলাদেশ বর্তমানে একটি তালেবানী রাষ্ট্র এবং জোট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে' বলে প্রচারণা চালিয়েও আমেরিকাকে উত্তেজিত করতে না পেরে শেখ হাসিনা হতাশ হয়ে ভারতের হস্তক্ষেপের আশায় তার কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে ২৭০ নং কিস্তিতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ঐ সময়ই ভারতের আহমেদাবাদে ব্যাপকভাবে মুসলিম গণহত্যা চলেছে, যার কোনো প্রতিবাদ শেখ হাসিনা করেননি। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অপবাদের প্রতিক্রিয়া ভারতে হতে পারে। ভারতের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব আক্রমণাত্মক প্রচারণা তখন চলেছে, তার উপাদান শেখ হাসিনাই জোগান দিয়ে থাকবেন।

শেখ হাসিনার গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন

২০০৪ সালের ৩০ এপ্রিলের গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরও ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত 'বেগম খালেদা-নিজামী' সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে বারবার গণ-অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

যে জনগণ ২০০১ সালে চারদলীয় জোটকে সংসদ নির্বাচনে দু-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিজয়ী করল, তারা নিজেদের নির্বাচিত সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া কেন দেবে? তাই স্বাভাবিক কারণেই তথাকথিত গণ-অভ্যুত্থান আন্দোলন প্রত্যেক বারই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলন

ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির ঐক্যের কারণে জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী ও ভারতের দালাল হিসেবে পরিচিত আওয়ামী লীগ ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারবে না বলে আশঙ্কা করেই চারদলীয় জোটের আদলে সরকারি জোটের বাইরের দলগুলোকে নিয়ে একটি মহাজোট গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। উল্লেখযোগ্য কোনো দলই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হতে সম্মত হয়নি। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টিও রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৩টি রাজনৈতিক এতিম দল নিয়ে শেখ হাসিনা ১৪ দলীয় জোটের নেতৃত্ব লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন।

নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা না দেখে শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে তারা বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বিদেশের সহযোগিতায় গণ-অভ্যুত্থানের নামে ক্ষমতা দখলের বদনিয়তে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন।

২০০৫ সালের ১৫ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সংস্কার-প্রস্তাবের নামে ৩১ দফা দাবিনামা পেশ করে শেখ হাসিনা জোট সরকারকে হুমকি দেন যে, এসব দাবি না মানলে দেশে নির্বাচন হতেই দেবেন না। এ দেশটাকে তিনি তার পিতার তালুক মনে করেন কি না জানি না। তিনি যে দাপটের ভাষায় কথা বলেন, তাতে মনে হয় তিনিই দেশের কর্তৃত্বের অধিকারী।

www.bjilibrary.com

সংস্কার আন্দোলনের প্রধান দাবি

আগামী নবম সংসদ নির্বাচন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করবে এর প্রধান উপদেষ্টা সংবিধান অনুযায়ী যার হওয়ার কথা তিনি ২৫ বছর হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং সর্বশেষে প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বে এ্যাডভোকেট থাকাকালে তিনি বিএনপি'র দলীয় কোনো পদে থাকায় তাকে শেখ হাসিনা কিছুতেই প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। এটাই তার প্রধানতম সংস্কার দাবি।

বিচারপতিগণও নির্বাচনে ভোট দেন। নিশ্চয়ই সব বিচারক একই দলের প্রার্থীকে ভোট দেন না। কিন্তু তারা যে দলকেই ভোট দেন, দীর্ঘ দিন বিচারপতি হিসেবে নিরপেক্ষভাবে রায় দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমন 'জুডিশিয়াল মাইন্ড' গড়ে ওঠে, যার ফলে তারা যেকোনো দায়িত্ব পালনের বেলায় ন্যায়নীতি মেনে চলায় অভ্যস্ত হন। তাই যখনই কোনো তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়, তখন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিই করা হয়। বিশ্বের সর্বত্রই বিচারকদের এ মর্যাদা স্বীকৃত।

শেখ হাসিনা বিচারপতি কে এম হাসানকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়ার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসী তৎপরতা চালান। ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরদিন ২৮ তারিখে বিচারপতি কেএম হাসানের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা।

শেখ হাসিনা দুমাস আগেই সংবিধানের এ স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার দলীয় ক্যাডারদেরকে নির্দেশ দেন যে, যদি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হয় তবে সারা দেশ থেকে যেন তারা লাঠি-বৈঠা ও লগি নিয়ে ঢাকায় হাজির হয়।

এ জাতীয় নির্দেশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোনো রাজনৈতিক নেতার মুখ থেকে আসা স্বাভাবিক নয়। তার পিতা শেখ মুজিব পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, যার হাতে যা আছে তা নিয়ে যেন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শেখ হাসিনা দেশের জনগণ ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ভূমিকা পালনের ডাক দিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের মতো একজন ভদ্রলোক এর মোকাবিলা কী দিয়ে করবেন? ২৮ অক্টোবর তাঁর শপথ নেওয়ার কথা ছিল।

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব

২৭ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ দিন। পরের দিন রাত ৮টায় বঙ্গভবনে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে বিচারপতি কে এম হাসানের শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা। শিডিউল অনুযায়ী বঙ্গভবনে এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো।

www.bjilibrary.com

সেদিন বিএনপি জনসভা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে পল্টন ময়দান ব্যবহারের অনুমতি নিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ঐতিহ্য অনুযায়ী লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে আগের রাতেই পল্টন ময়দান দখল করে মঞ্চ তৈরি করে নেয়। পুলিশ প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার স্বার্থে তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী পল্টনে ১৪৪ ধারা জারি করে। বিএনপি পল্টন ময়দানের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পুলিশের সাথে লড়াই না করে নয়াপল্টনের রাজপথে জনসভার অনুষ্ঠান করে।

শেখ হাসিনা পুলিশের বে-আদবি(!) সহ্য করতে রাজি না হয়ে তার লাঠি-বৈঠা-লগি বাহিনীকে পল্টন ময়দানে জনসভা করার উদ্দেশ্যে সারা দিন পুলিশবাহিনীর সাথে লড়াই করার নির্দেশ দেন। তিনি জাঁদরেল জেনারেলের মতো পুলিশের সাথে লড়াই করার যোগ্য একদল মহিলা ক্যাডারও গড়ে তোলেন, যাদেরকে প্রতিটি মিছিলে তৎপর দেখা যায়। ঐ দিন পল্টন দখলের জন্য অবশ্য তাদেরকে ময়দানে দেখা যায়নি।

পুলিশবাহিনী পল্টন ময়দান দখল করে রাখায় আওয়ামী লীগ মুক্তাঙ্গনে জনসভা করতে বাধ্য হয়। পুলিশবাহিনীর গোটা শক্তি পল্টনেই ব্যস্ত। বিএনপির জনসভায়ও প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাব পাহারায় ছিল।

পূর্বঘোষণা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীর জনসভা উপলক্ষে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্বেচ্ছাসেবকগণ সমাবেশস্থলে কর্তব্যরত ছিল।

মুক্তাঙ্গনে ১৪ দলের সমাবেশ। আর বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে জামায়াতের জনসভা। দুটোর দূরত্ব বেশি না হলেও পৃথক পৃথক স্থানে দুটো সমাবেশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধা স্বাভাবিক নয়।

শেখ হাসিনার সন্ত্রাসীরা পল্টনে সমাবেশ করতে পারছে না, আর জামায়াতে ইসলামী সমাবেশ করছে– এটা তাদের কেমন করে সহ্য হয়? তা ছাড়া তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দুশমন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব তাদের ঐ মতবাদের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় বলে তাদের ধারণা।

জামায়াতের সমাবেশ বিকাল তিনটায় শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু সমাবেশস্থলের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যারা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিল তাদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা লাঠি-বৈঠা-লগি ও পিস্তল নিয়ে দুপুর সাড়ে এগারোটায়ই হামলা শুরু করল। স্বেচ্ছাসেবকরা জীবনবাজি রেখে প্রতিরোধ করতে থাকল, যাতে সমাবেশ সফল করা যায়।

মঞ্চ থেকে তখন হামদ-না'ত ও ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতাকে তৃপ্তি দান করা হচ্ছে।

সন্ত্রাসীরা একদল প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল, কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আক্রমণ চালায়। এমনকি জনসভা চলার সময়ও হিংস্র বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকে। বিকেল

www.bjilibrary.com

৫টায় যখন আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বক্তৃতা শুরু করেন, তখন নিকটবর্তী উঁচু দালানের ছাদ থেকে হায়েনার দল বোমা ছুড়তে থাকে এবং গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ আগের দিন শেষ হয়ে গেলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল পুলিশবাহিনীর কর্তব্য ছিল হামলাকারীদের দমন করা। সাড়ে ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে হামলা অব্যাহত থাকে। পুলিশ তামাশা দেখাই যথেষ্ট মনে করে।

ঐ দিনের নৃশংস হামলায় ইসলামী আন্দোলনের ছয় জন ভাই শহীদ হন এবং প্রায় ৬০০ আহত হন।

টিভিতে প্রদর্শিত হায়েনাদের লাঠি ও বৈঠার আঘাতের করুণ দৃশ্য দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সবাইকে বিমর্ষ ও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে মানুষ পশুর চেয়েও এতটা হিংস্র হতে পারে– আওয়ামী দুষ্কৃতকারী গুণ্ডারা এর জঘন্য প্রমাণ দিয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ নৃশংসতার নিন্দা জানিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশী কূটনীতিকগণ শুধু দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নিন্দা জানানো প্রয়োজন মনে করেনি। শেখ হাসিনারা তো নিশ্চয়ই উল্লসিত হয়েছেন এবং এটাকেও তাদের বিজয় মনে করেছেন।

বিশ্বের অন্য কোনো দেশে শেখ হাসিনার মতো এমন রাক্ষসী ও হিংস্র নেত্রী আছে কি না জানা নেই। তিনি লাঠি-বৈঠা-লগি নিয়ে ময়দানে কী উদ্দেশ্যে তার বাহিনীকে নিয়োগ করলেন? এ জাতীয় পশুত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনিই এককভাবে দায়ী। এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতার এক নম্বর আসামি তিনি। দুনিয়ায় এর বিচার না হলেও আল্লাহ অবশ্যই এর বিচার করবেন।

২৮৯.

চুরির উপর সিনাজুরি

পত্রিকায় পড়লাম, ১৪ দলের পক্ষ থেকে মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে খুনের মামলা করা হচ্ছে। ২৮ অক্টোবর '০৬ জামায়াতের সমাবেশে হামলাকারীদের মধ্যে কে নাকি নিহত হয়েছে। এ খুনের আসামি নাকি মাওলানা নিজামী।

দুনিয়ার সব দেশেই এ আইন আছে যে, হামলাকারী যদি আক্রান্ত লোকের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাকালে নিহত হয়, তাহলে এ খুনের জন্য হামলাকারীই দায়ী। আক্রান্ত লোকের আত্মরক্ষার অধিকার থাকায় হামলাকারীকে হত্যা করা অপরাধ বলে গণ্য নয়।

www.bjilibrary.com

জামায়াতের সমাবেশে যারা হামলা করতে এল, তাদের সবাইকে হত্যা করলেও আইনত জামায়াতের কেউ দণ্ডনীয় নয়। তাই মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে মামলা করা হলে তা আদালতে ডিসমিস হয়ে যাবে।

এ হামলা নতুন নয়

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের এ ফ্যাসিবাদী বদঅভ্যাস আওয়ামী লীগের পুরনো ঐতিহ্য। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ আমার নাগরিকত্ব বহাল করার পর চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানের জামায়াতের সমাবেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র হামলা চালালে জামায়াতের দুজন ভাই শহীদ হন এবং শতাধিক আহত হন। আর সন্ত্রাসীদের তিন জন মারা যায়।

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভায় আওয়ামী সশস্ত্র গুণ্ডারা হামলা চালায়। ময়দানের পশ্চিম গেট দিয়ে সভাস্থলে প্রবেশের চেষ্টা করলে দুঘণ্টা পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। আমি সভাপতিত্ব করছিলাম। আমি উপস্থিত পুলিশবাহিনীকে বারবার আহ্বান জানালাম যে, হামলাকারীদেরকে যেন হটিয়ে দেয়। বিলম্বে হলেও যখন পুলিশ গেটে অবস্থান নিল তখন আমি সরল বিশ্বাসে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে গেট থেকে সরে আসার নির্দেশ দিই। ডিসি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্ত্রাসীদেরকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ দিলে তারা যে তাণ্ডব চালাল, 'জীবনে যা দেখলাম' তৃতীয় খণ্ডে এর বিবরণ রয়েছে। ডিসি যে কাদিয়ানী হিসেবেই জামায়াতের চরম দুশমনের ভূমিকা পালন করেছেন, সে কথা পরে জানা গেল। ঐ হামলায় জামায়াতের দুজন শহীদ হন।

বিবেকহীন আওয়ামী নেতৃত্ব

২৮ অক্টোবর '০৬ জামায়াতের সমাবেশে নৃশংস হামলার পাশবিক দৃশ্য টেলিভিশনে দেশে-বিদেশে অনেকেই দেখেছেন। শুধু রাজনৈতিক বিদ্বেষবশত আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এক-একজন নিরপরাধ মানুষকে লাঠি-বৈঠা ও লগি দিয়ে অব্যাহতভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। তাদেরকে নিহতের লাশের উপর দাঁড়িয়ে যেভাবে উল্লাস করতে দেখা গেছে, পৃথিবীতে এর নজির পাওয়া কঠিন। মানুষকে এমন যোগ্য নরপিশাচ হিসেবে গড়ে তোলার কৃতিত্ব শেখ হাসিনাকে দিতেই হয়। শেখ হাসিনা ও ১৪ দলীয় নেতারা নিশ্চয়ই টিভিতে এ দৃশ্য দেখেছেন। যদি তাদের বিবেক বলে কোনো সত্তা থাকত, তাহলে অবশ্যই এর নিন্দা জানাতেন। নিজের সন্তানও যদি কোনো জঘন্য কাজ করে তাহলে পিতার বিবেক সন্তানকে শাস্তি দিতে বাধ্য করে।

শেখ হাসিনার আরো একটি সর্বনাশা কীর্তি

পাঁচ বছর ক্ষমতাসীন থাকাকালে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের কী কী সর্বনাশ করেছেন, এর বিবরণ পূর্বে কয়েকটি কিস্তিতে আলোচনা করেছি। বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে তার

www.bjilibrary.com

নেতৃত্বে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন আরো একটি সর্বনাশা কীর্তি সংযোজন করল। গণতন্ত্র হত্যা তো তার পিতারই আদর্শ। লগি-বৈঠা দিয়ে তো সে আদর্শের অনুসরণ করেই বিচারপতি কে এম হাসানকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা হলো। তিনি না হয় ২৫ বছর আগে বিএনপি করার অপরাধে দোষী। কিন্তু বিচারপতি এমএ আজিজ তো কোনো দল করতেন বলে অভিযোগ নেই। তবুও একই কায়দায় অবরোধ ও লগি-বৈঠার হুমকি দিয়ে তাঁকেও পদত্যাগে বাধ্য করতে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকারী। সংবিধান রক্ষার শেষ ভরসাই সুপ্রিম কোর্ট। যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে এভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকারে পরিণত করে লাঞ্ছিত করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কোনো বিচারপতিই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না। ফলে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শেখ হাসিনা এ সর্বনাশটিই কি করতে চাচ্ছেন?

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ফর্মুলাই কেয়ারটেকার সরকার

শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টি দখল করেন। জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র বহাল করলেও ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তাঁর দলের দু-তৃতীয়াংশ আসন নিশ্চিত করেন। এর মানে পার্থক্য থাকলেও এ দুটো নির্বাচন মোটেই নিরপেক্ষ ছিল না।

নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তার ফর্মুলা হিসেবেই জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার প্রস্তাব পেশ করে। স্বৈরশাসক এরশাদের সাথে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত ঐ সংলাপে উভয় জোটকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, যাতে ১৫+৭+জামায়াত = মোট ২৩ দল একসাথে সংলাপে কেয়ারটেকার সরকার ফর্মুলা পেশ করে। উভয় জোট এ প্রস্তাবে সম্মত হলে ঐ বছরই স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতো। যাহোক বিলম্বে হলেও ১৯৯০ সালে সকল দল এ বিষয়ে একমত হওয়ায় স্বৈরশাসন খতম হলো এবং কর্মরত প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের পরিচালনায় দেশে প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের ঐ সুনামের কারণেই শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। ২০০১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য শেখ হাসিনা জনাব এম এ সাঈদ নামক এক আমলাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করেন। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হন। শেখ হাসিনা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং তার নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে স্থূল কারচুপির অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশালীন উক্তি করেন।

www.bjilibrary.com

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্রপতি, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশনকে তিনি মেনে নেবেন না। এর জন্য তিনি লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ করতেই থাকবেন।

১৯৯১, '৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ ও অবাধ হয়েছে বলে দেশের ও বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক এমনকি আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের সকল রাজনৈতিক দলই স্বীকার করেছে। এ পদ্ধতিকে অকার্যকর করে শেখ হাসিনা নির্বাচনপদ্ধতিকেই বানচাল করতে চাচ্ছেন। বারবার তিনি ঘোষণা করছেন, তার দাবি না মানলে বাংলার মাটিতে তিনি নির্বাচন হতেই দেবেন না।

তার দাপটের ভাষা শুনলে মনে হয়, তিনিই এ দেশের মালিক। তার খুঁটির গোড়া কোথায় জানি না। ২৮ অক্টোবর তিনি যে পশুশক্তির মহড়া দেখালেন, সেটাই যদি তার শক্তির উৎস হয়ে থাকে তাহলে তিনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন। সেদিন তিনি যে শক্তি জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছেন, তা বিএনপির উপর প্রয়োগ করার হিম্মত করেননি। সে দিন কোনো সরকার ছিল না; সরকারি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছিল। কোনো সরকারই তার ঐ ধরনের শক্তি প্রয়োগের সুযোগ দেবে না, দিতে পারে না।

শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনারদের ওপর এত ক্ষিপ্ত কেন?

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা এত খেপা কেন? তিনি কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত বলে কোনো অভিযোগও এ পর্যন্ত কেউ করেননি। ২০০১ সালে শেখ হাসিনার আমলে যে ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাতে বিরাটসংখ্যক ভুয়া ভোটার ছিল বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে।

প্রতি পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন হয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক লোক নতুন ভোটার হওয়ার বয়সে পৌঁছে। মৃত্যুর কারণে অনেক লোক তালিকা থেকে বাদ পড়ার কথা। পুরনো তালিকায় ভুয়া ভোটার থাকলে নতুন তালিকায় তারাও বাদ পড়বে। তাই আগের সকল নির্বাচনের সময় যেমন নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে, ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্যও নতুন তালিকা তৈরি করা প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রয়োজন মনে করেছেন– এটাই তাঁর প্রধান অপরাধ। আওয়ামী আইনজীবীরা হাইকোর্টে মামলা করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার পক্ষে রায় পেয়ে যান। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন আপিল বিভাগে মামলা করে। আপিল বিভাগ ঐ রায় বহাল রাখায় নির্বাচন কমিশন নতুন তালিকা বাতিল করে হালনাগাদ তালিকা তৈরি করে। এ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমা করতে রাজি নন। তার আমলে প্রণীত ভোটার তালিকা প্রথমে মেনে নিতে অসম্মত হওয়ার অপরাধ শেখ হাসিনার নিকট অমার্জনীয়। তাই তাঁকে অপসারণ করতেই হবে।

www.bjilibrary.com

নির্বাচনে কারচুপি কীভাবে হয়?

আমাদের দেশে শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের আমলে বিভিন্ন মাত্রায় নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে। শেখ মুজিবের আমলে পাইকারি হারে, জিয়ার আমলে নিম্নহারে এবং এরশাদের আমলে উচ্চহারে কারচুপি হয়েছে।

কীভাবে কারচুপি করা হয়েছে? ভোটকেন্দ্রে ভোট দান সম্পন্ন হলে কেন্দ্রে ভোট গণনার সময়ও কারচুপি করে একজনের ভোট আরেকজনের হিসাবে যোগ করতে পারে। সব প্রার্থীর এজেন্ট সেখানে হাজির থাকলে এমনটা করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

সকল ভোটকেন্দ্র থেকে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তালিকা রিটার্নিং অফিসারের অফিসে জমা হলে সেখানে যখন সকল তালিকার যোগফল তৈরি করা হয়, সেখানে রিটার্নিং অফিসার ও গণনাকারীদের যোগসাজশে কারচুপি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হয়ে থাকে।

রিটার্নিং অফিস থেকে ভোটের যোগফল ঘোষণা করার পরও উপরের চাপে ব্যালট বাক্স রদবদল করে ফলাফল পাল্টিয়ে দেওয়ার নজির ১৯৭৯ পর্যন্ত সকল নির্বাচনেই কম-বেশি পাওয়া যায়।

দলীয় সরকারের আমলে রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের চাপে রিটার্নিং অফিসাররা চাকরি রক্ষার প্রয়োজনে নির্বাচনী ফলাফল কর্তাদের মর্জি অনুযায়ী বদলে দিতে বাধ্য হয়। এ দুর্নীতিমূলক জঘন্য কারচুপি থেকে নির্বাচনকে রক্ষার প্রয়োজনেই নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বিগত তিনটি নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসাররা তা করেননি। কারণ, কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় থাকায় উপর থেকে কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের পক্ষ থেকে রিটার্নিং অফিসারদের উপর চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচনী ফলাফল বদলে দেওয়ার কোনো নজির নেই। এ জাতীয় কাজ দলীয় সরকারই করতে সক্ষম। এখানে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সরাসরি জড়িত। নির্বাচন কমিশনের এমন কোনো রাজনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালক ও নির্বাচন কমিশনের উপর কারচুপির আশঙ্কা করা সম্পূর্ণ অমূলক ও অবাস্তব। বিচারপতি কে এম হাসান ও বিচারপতি এম এ আজিজের পরিচালনায় ঐ জাতীয় কারচুপির আশঙ্কা আছে বলে মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক।

২০০১ সালে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ এবং পুলিশপ্রধান ও সেনাপ্রধান রিটার্নিং অফিসারদেরকে চাপ দিয়ে শেখ হাসিনাকে হারিয়ে দিয়েছেন বলে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ শেখ হাসিনা দাঁড় করাতে পারেননি। এ সত্ত্বেও তার পরাজয়ের জন্য উপরিউক্ত সম্মানিত পাঁচ জনের বিরুদ্ধেই শেখ হাসিনা অত্যন্ত অশালীন ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

www.bjilibrary.com

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা কীভাবে বিজয়ী হন?

আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত সচিব আবু হেনা রিটার্নিং অফিসারদের উপর চাপ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনাকে জিতিয়ে দিয়েছেন। ঐ নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিজয়ের কারণসমূহ আমার লেখা 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন' বই থেকে উদ্ধৃত করছি :

"১৯৭৯ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত তিনটি সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে জুনের নির্বাচনে কী কী কারণে এতটা এগিয়ে গেল তা উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করি। নির্বাচনী অভিযানের একপর্যায়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বেই ওমরা করতে যান। ওমরার পোশাক মাথায় রেখেই হাতে তাসবীহ্ নিয়ে তিনি ফিরে আসেন এবং এ অবস্থায়ই অবশিষ্ট নির্বাচনী অভিযান চালান। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অন্তত একটিবারের জন্য সেবা করার সুযোগ ভিক্ষা চান। গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও তিনি তার পিতার হত্যার বিচার দাবি করেননি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তার আদর্শ বলে ঘোষণা করেননি। তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ভাষাও তেমন একটা প্রয়োগ করেননি।

জনগণ হয়তো ধারণা করেছে যে, এ আওয়ামী লীগ আগের মতো উগ্র নয়, মোটামুটি সংশোধন হয়ে গণতন্ত্রমনা হয়ে উঠেছে। ১৯৯৬ সালে যারা ভোটার ছিল তাদের অধিকাংশই ২১ বছর আগের আওয়ামী কুশাসন ও দুর্নীতি, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন দেখেনি। '৯৪-এর এপ্রিল থেকে '৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী শরীক থাকায় হয়তো জনগণের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, আওয়ামী লীগ আগের মতো আর ইসলামবিরোধী হবে না। বিশেষ করে বিএনপি কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি অগ্রাহ্য করায় কোনো রাজনৈতিক দল '৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় এবং নির্বাচনের পর বিএনপি পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ার কারণে চরমভাবে মর্যাদা হারায়। বিএনপির বিকল্প রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণ হয়তো বাধ্য হয়েই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। কারণ, অন্য কোনো দল বিকল্প হওয়ার মর্যাদায় গণ্য ছিল না।

'উপরিউক্ত বহুবিধ অনুকূল পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে পারেনি। দীর্ঘ ছয় বছর পর্যন্ত কারারুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদের জাতীয় পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে এবং এরশাদকে কারামুক্তির লোভ দেখিয়ে ঐ দলের সমর্থন জোগাড় করে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন।"

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনার বিজয়ের প্রধান কারণ কি অন্য কিছু?

আমার ধারণা অনুযায়ী শেখ হাসিনার বিজয়ের কারণ উপরে উল্লেখ করেছি। কিন্তু শেখ হাসিনা নিজে অন্য কোনো কারণকে প্রধান বলে মনে করেন কি না, সে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসেবে তিনি 'সূক্ষ্ম কারচুপি' এবং ২০০১ সালে 'স্থূল কারচুপি'র কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তার বিজয় কী কারণে হলো সে বিষয়ে তিনি মুখে কিছু না বললেও আচরণে মনে হয়, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বিরাট অবদান ছিল বলে তিনি মনে করেন।

তিনি ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম কারচুপি এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে বিচারপতি লতিফুর রহমানের বিরুদ্ধে স্থূল কারচুপির অভিযোগ করেছেন এবং বিচারপতি কে এম হাসান সুস্পষ্ট কারচুপি করবেন আশঙ্কায় তিনি লগি-বৈঠা দিয়ে অবরোধ করলেন। তাহলে হয়তো তিনি ধারণা করে থাকতে পারেন যে, বিচারপতি হাবিবুর রহমান তার পক্ষে কারচুপি করে তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন।

গত ৩০ অক্টোবর '০৬ দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রেস কাউন্সিলের সাবেক ডিজি ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী উপসম্পাদকীয় কলামে লিখেছেন :

"এ কথা সত্য, বিচারপতি হাবিবুর রহমান মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করুক আওয়ামী লীগ। তিনি জনতার মঞ্চের লোকদের বেছে বেছে রিটার্নিং অফিসার করেছিলেন।' [১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকার মেয়র ও আওয়ামী লীগের নগর-সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে বেগম জিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে 'জনতার মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত মঞ্চে সচিবালয়ের আওয়ামীপন্থি অনেক বড় বড় আমলা আওয়ামী নেতাদের সাথে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন– জনতার মঞ্চ সম্পর্কে এ পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম।] আমি (ড. রেজোয়ান) তখন তাঁর উপ-প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি পত্রিকা ঘেঁটে খুঁজে খুঁজে জনতার মঞ্চের লোকদের নাম বের করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এরা বিতর্কিত লোক। এদের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলে আপনার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। সে তালিকা হাতে পেয়ে তিনি রেডি লিস্ট নিয়ে তাদের প্রায় সবাইকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বিচারপতি হাবিবুর রহমানের এসব সিদ্ধান্তের ফলেই ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছিল, এমন কথা আমি মনে করি না। আমার ধারণা, আওয়ামী লীগ সে রকমই মনে করে। আর সে কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদটি নিয়ে তারা এত জেদাজেদি করছে বলে আমার ধারণা।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যদি তাদের অনুকূলে থাকে, তবে ২০০৭ সালের নির্বাচনেও তাদের বিজয় অবধারিত।

www.bjilibrary.com

বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরী আওয়ামী লীগের খুব প্রিয়ভাজন লোক। আর সে কারণে কমপক্ষে চারজন সিনিয়রকে ডিঙিয়ে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল মাহমুদুল আমীন চৌধুরীকে (শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে)। সুতরাং তাকেই চাই আওয়ামী লীগের।"

প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের জন্য আবার অবরোধ

শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন, লগি-বৈঠা ও অবরোধ প্রয়োগ করে যেভাবে বিচারপতি কে এম হাসানকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে, ঠিক একই পন্থায় ১১ নভেম্বরের পর বিচারপতি এম এ আজিজকেও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। বিচারপতি হাসান তো পদ গ্রহণই করেননি। বিচারপতি এম এ আজিজ এ সাংবিধানিক পদে বহাল আছেন। তিনি নিজে সরে না গেলে তাঁকে সরানোর কোনো উপায় নেই। এ পরিস্থিতিতে এটাই দেখার বিষয় যে, রাষ্ট্রপতি কি শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশ শাসন করবেন?

বিজয়ের নিশ্চয়তা কে দেবে শেখ হাসিনাকে?

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হলো, বিজয়ের নিশ্চয়তা না জেনে তিনি নির্বাচনে যেতে চান না। এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও এর উপদেষ্টামণ্ডলী এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারগণ এমন লোক হতে হবে, যাদের উপর শেখ হাসিনার পূর্ণ আস্থা হয়। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে সরকারের সচিবালয়ে জোট সরকারের আমলে যাদেরকে বসানো হয়েছিল তাদের সবাইকে বদলি করতে হবে এবং সেসব পদে যাদেরকে বসানো হবে তাদের নিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট শেখ হাসিনা থেকে নিতে হবে।

বিশেষ করে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে শেখ হাসিনার ১১ দফা দাবি মেনে প্রমাণ দিতে হবে যে, তিনি নিরপেক্ষ।

এসব দাবি পূরণ না হলে তিনি অক্টোবরের ২৭-২৮-২৯ তারিখের মতো লগি-বৈঠা নিয়ে অবরোধ করে তার সব দাবি মেনে নিতে বাধ্য করবেন।

সারকথা হলো, নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তাবোধ না করলে তিনি নির্বাচন হতেই দেবেন না; কিন্তু এ নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে রাজনীতির গতিধারা

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। স্বাধীন দেশ মানে দেশের সকল বিষয়ে জনগণ ও জনগণের নির্বাচিত সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বশীল। স্বাধীন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিদেশিদের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকে না। বিশেষ করে দেশের রাজনীতি বিদেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলে সত্যিকার স্বাধীন রাষ্ট্র বলে গণ্য হতে পারে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরাসরি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত এ দেশে ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছে। ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সঙ্গত কারণেই শেখ মুজিব অনেক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। ১৯৭৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকায় যে ২৫ বছরব্যাপী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এর দরুণ কোনো দিক দিয়েই ভারতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-বিপ্লবের পর খন্দকার মুশতাক আহমদের সরকার ভারতের চাপকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস করলে ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সামরিক বিপ্লব ঘটান। সেনাবাহিনীর জোয়ানরা এটাকে ভারতপন্থি বিপ্লব মনে করে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহে সিপাহিদের সাথে জনগণ সংহতি প্রকাশ করে। অনেকটা অলৌকিকভাবেই ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার যৌথ বিপ্লবের মাধ্যমে বন্দি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে বিদেশের আধিপত্যমুক্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। নিখাদ দেশপ্রেম, ধীশক্তি ও নিঃস্বার্থতার গুণে ভূষিত জিয়া দেশ গড়ার ক্ষেত্রে জনসমর্থন নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর কী উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করলেন, তা এখনো রহস্যই রয়ে গেল। সেনাবাহিনী দেশের ক্ষমতা দখলের সিদ্ধান্ত নিলে রাজধানী দখলের পরিকল্পনা ছাড়া মফস্বলে প্রেসিডেন্ট হত্যা করা মোটেই স্বাভাবিক নয়। মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে গ্রেফতার করার পর হত্যা করা না হলে এ রহস্য উদ্ঘাটিত হতো। কারা কেন তাকে হত্যা করল, সেসবের কোনো তদন্তও করা হলো না। এটা বিস্ময়কর।

তখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল এরশাদ। সেনাপ্রধানের সম্মতি ছাড়া মফস্বলের এক জিওসি দেশের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদি ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্টকে হত্যা না হয়ে থাকে তাহলে এ হত্যার উদ্দেশ্য আর কী হতে পারে, তা মোটেই বোধগম্য নয়। সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ছাড়া এ জাতীয় হত্যার সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

জেনারেল এরশাদের রাজনীতি

শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালান এবং দেশে বহুদলীয় রাজনীতি চালু করার পদক্ষেপ নেন। গণতন্ত্র অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করলেন।

তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে আস্থায় নিতে সক্ষম হন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মতপার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে তার স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করেন। সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতার জোরে তিনি নয় বছর স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৯০ সালে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিতে নির্বাচনের ফর্মুলায় সকল দল ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় প্রবল গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসনকে বহাল রাখতে অস্বীকার করায় এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরশাদের স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান হয় এবং গণতন্ত্র পুনর্বহাল হয়।

১৯৯১ সালে বাংলাদেশের রাজনীতি

১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে বিএনপি ক্ষমতা লাভ করে। জাতীয় সংসদের সকল দলের ঐকমত্যের পদ্ধতির বদলে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার কায়েম হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এরশাদের জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর সমন্বয়ে সংসদের বিরোধী দল গঠিত হয়। চমৎকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে ব্রিটিশ ধাঁচের পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি চালু হয়। আশা করা গিয়েছিল যে, সংসদীয় গণতন্ত্র স্বাভাবিক গতিতে এগুতে থাকবে।

এ নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হবেন বলে নিশ্চিত হয়ে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল যে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তারা বিজয়ী হবেন।

বিজয়ী হতে না পেরে তিনি নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ করলেও সংসদে শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রীর ভূমিকা পালন করতে থাকেন। অবশ্য 'সরকারকে এক দিনও শান্তিতে থাকতে দেব না' বলে তার স্বভাবসুলভ হুমকি দিলেও তিনি প্রথম থেকেই সংসদ বর্জন করেননি।

১৯৮৬ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংসদে বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ভূমিকা পালন করে এসেছে, যদিও তাদের মেজাজ অনুযায়ী মাঝে মাঝে অসংসদীয় আচরণও তারা করেছে। এ গণতান্ত্রিক ধারা ১৯৯৪ সালে স্তব্ধ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতিধারা চলতে থাকলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই উন্নত হতো, কিন্তু ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর আসনটি উপনির্বাচনে বিএনপি কেড়ে নিলে সংসদীয় গণতন্ত্র সংকটের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগ ঘোষণা দেয় যে, বিএনপি সরকারের পরিচালনায় আর কোনো উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না এবং কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার যে বিল সংসদে জমা দেওয়া হয়েছে, তা অবিলম্বে পাস করার জন্য আন্দোলন করবে।

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ঐ বছরই জুন মাসে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংসদে পেশ করার জন্য কেয়ারটেকার সরকার বিল জমা দেন। এরপর আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি অনুরূপ বিল জমা দেয়; কিন্তু বিএনপি সরকার কোনো বিলই সংসদে আলোচনার সুযোগ দেননি।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি জামায়াতেরই আবিষ্কার। আওয়ামী লীগ এ ইস্যুতে আন্দোলন করলে ঐ আন্দোলনে জামায়াতের শরীক হতেই হবে। অথচ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনে শরীক হওয়া জামায়াতের পক্ষে কী করে সম্ভব? এ সমস্যা বিরাট হয়ে দাঁড়াল। এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখেছি।

ঐ আন্দোলনের পরিণামেই ১৯৯৬ সালের জুন মাসের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। বিএনপি যদি শুরুতেই কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস করতে সম্মত হতো তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না এবং ঐ আন্দোলন না হলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারত না। শেখ হাসিনা ক্ষমতার স্বাদ না পেলে পূর্বের মতোই বিরোধীদলীয় নেতার ভূমিকাই পালন করতেন। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর তিনি যে আজব রাজনীতি শুরু করলেন, তা হয়তো করতেন না।

শেখ হাসিনার আজব রাজনীতি

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের জুন থেকে পাঁচ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে দুঃশাসন চালিয়েছেন, তাতে কয়েকটি পরিকল্পনা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা।

২. মুজিব হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষাকে হয় সংশোধন, না হয় পঙ্গু করে রাখা।

৪. সরকারি গণভবনকে ব্যক্তিগত মালিকানায় পুনর্বহাল করা (২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকার ঐ ভবনের ব্যক্তিগত মালিকানা বাতিল করেছিল)।

www.bjilibrary.com

৫. ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহে যাতায়াতের জন্য ভারত সরকারকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করা।

৬. সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করা।

৭. ভারতের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশের গ্যাস বিক্রয় করা।

৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করার কৃতজ্ঞতা হিসেবে বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য স্থাপন করা।

এসবের কোনোটাই বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জনগণের স্বার্থের পক্ষে নয় বলে নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে সমর্থন করা স্বাভাবিক নয়। তাই ক্ষমতা হাসিল করতে হলে বিদেশের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই বলেই তিনি ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আজব রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছেন। আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের দুয়ারে ধরনা দিয়ে হতাশ হয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি কূটনীতিকদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিয়ে চলেছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের কূটনীতিকগণ অতি উৎসাহের সাথে মুরব্বিয়ানার ভঙ্গিতে রাজনৈতিক উপদেশ খয়রাত করছেন। কূটনীতিকগণ প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে, শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য অনেক অযৌক্তিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করার সাহস পেয়েছেন।

সঙ্গত কারণেই কূটনীতিকগণ মনে করেন যে, প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে গণতন্ত্র সংহত হতে পারে না। শেখ হাসিনা টের পেয়ে গেছেন যে, তার দল নির্বাচন বর্জন করলে গণতান্ত্রিক বিশ্বে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তাই তার অযৌক্তিক সব দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি জিদ ধরেন। শেষ পর্যন্ত তিনি গত ২৮ অক্টোবর '০৬ শক্তি প্রয়োগ করে বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। এর জন্য রাজধানী ঢাকায় তিনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালান এবং সারা দেশেই তার লগি-বৈঠা-লাঠিধারীরা ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

অক্টোবরের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে শেখ হাসিনার অবরোধের সময় টেলিভিশনে কূটনীতিকগণ শেখ হাসিনার গণতন্ত্রের নমুনা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, শেখ হাসিনা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তাই তারা শেখ হাসিনার আজব রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ

কোনো স্বাধীন দেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। এতে বিদেশের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ থাকার কথা নয়।

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে তিনটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়ে গেল। রাজনৈতিক দলসমূহ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনো এক দলের পাঁচ বছরের বেশি এক দিনও

www.bjilibrary.com

ক্ষমতায় টিকে থাকার ইখতিয়ার নেই এবং নির্বাচনে কোনো দলেরই কারচুপি করার পথ নেই। এ অবস্থায় বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংহত হওয়ারই কথা।

কিন্তু শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ফলাফল মেনে না নিয়ে বিদেশের নিকট ধরনা দিলেন। তার এ আজব ভূমিকার কারণেই বিদেশিরা এ দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছেন। চারদলীয় জোট সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান বারবার প্রতিবাদ না করলে তারা মাথায় চড়ার চেষ্টা করতেন। তাদের নাক গলানোর জন্য শেখ হাসিনাই এক শ' ভাগ দায়ী।

কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টাদের ভূমিকা

২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর সংবিধান অনুযায়ী ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন।

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় হওয়ার কথা, কিন্তু প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলের নিকট উপদেষ্টাদের নাম চাইলেন। রাজনৈতিক দল যাদের নাম দিলেন তাদের মধ্যে দলীয় মনোভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। সকল দলের তালিকা থেকে যদি কমন কোনো নাম পাওয়া যায়, তাহলে তিনি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় হিসেবে গণ্য হতে পারেন। যারা কমন নন তারা তো দলীয় হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ সত্ত্বেও কোনো সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব হলো না। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে পরামর্শ করেও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য সর্বসম্মতভাবে কারো নাম জোগাড় করতে পারলেন না।

এ পরিস্থিতিতে উপদেষ্টাগণ রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে সংলাপ করে মীমাংসায় পৌঁছানোর দুঃসাহস করতে গিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করলেন। অবরোধের নামে একটানা চার দিন গোটা দেশকে অচল করে রেখে যারা কেয়ারটেকার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন তাদেরকে তোয়াজ করে আরো আশকারা দিলেন।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখা ও দেশকে সচল রাখার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের। যারা অবরোধ করে সরকারকে ব্যর্থ প্রমাণ করলেন তাদেরকে খোশামোদ করে উপদেষ্টাগণ কী পেলেন? তাদের উচিত ছিল সংলাপের পূর্বে অবরোধ মুলতবি করতে রাজি করানো।

আওয়ামী লীগের মেজাজ অনুযায়ী তারা সরকারকে আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার দাবিই জানালেন। যাহোক, উপদেষ্টাগণ আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর আশা করি আওয়ামী লীগ কী চিজ তারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

হয়তো তারা আন্তরিকতার সাথে চেয়েছেন, যেন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসে। তারা যে ১১ দফা দাবি বাস্তবায়নের শর্ত দিয়েছেন তাতে কি প্রমাণ হয় যে, তারা নির্বাচন চান? তাহলে আইডি কার্ডসহ নতুন ভোটার তালিকার দাবি কেমন করে করলেন? এর জন্য কমপক্ষে এক বছর প্রয়োজন। অথচ ২০০৭ সালের জানুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন হতে হবে।

www.bjilibrary.com

বিচারপতি কে এম হাসানকে বিব্রত করে শেখ হাসিনা কি বিজয়ী হলেন?

শেখ হাসিনা কথায় কথায় বিজয় নিয়ে গর্ব করেন। চৌদ্দদলীয় জোট ও চারদলীয় জোটের মধ্যে সংলাপে জামায়াতের উপস্থিতির কারণে সংলাপে বসলেন না। দুদলের মহাসচিবের মধ্যে বৈঠক হওয়ায় জামায়াতকে ছাড়া সংলাপ হওয়াকে তিনি বিজয় বলে তৃপ্তিবোধ করলেন।

বিচারপতি কে এম হাসানকে লগি-বৈঠা-লাঠি নিয়ে সন্ত্রাস করে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করলেন। এটাকে শেখ হাসিনা বিরাট বিজয় মনে করলেন। বিচারপতির বদলে বিএনপির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা হলেন। বিচারপতি এ দায়িত্ব নিলে কি এর চেয়ে বেশি ভালো হতো না?

জুন ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি নেতা জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিএনপি সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন। তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনা বিজয়ী হলেন। জনগণ ভোট দিলে প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ও নির্বাচন কমিশন বিজয় ঠেকাতে পারেন না। এ কথা শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই বোঝেন। আসলে নির্বাচনপ্রক্রিয়া বানচাল করে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। উপদেষ্টাগণ সে কথা উপলব্ধি করলে তারা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবেন। অহেতুক আওয়ামী লীগকে তোয়াজ করে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না।

২০০১ সালের নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনার মনোনীত প্রেসিডেন্ট ও তার নিয়োগকৃত প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ ছিলেন। জনগণ চারদলীয় জোটকে সংসদের দু-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে বিজয়ী করেছে। শেখ হাসিনার প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতিত্ব করে চারদলীয় জোটকে জিতিয়ে দেননি।

শেখ হাসিনার ক্ষমতালিপ্সাই রাজনৈতিক সংকটের আসল কারণ

শেখ হাসিনা একবার ক্ষমতায় গিয়ে যে মজা পেয়েছেন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় যাওয়ার যে নীল নকশা এঁকেছিলেন, তাতে ব্যর্থ হয়ে মেজাজের ভারসাম্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়। সংবিধানের মর্যাদা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনগণের সুখ-শান্তি তার ক্ষমতালিপ্সার নিকট একেবারেই মূল্যহীন। প্রথমবার তিন দিন ও দ্বিতীয়বার চার দিন লাগাতার অবরোধ করে দেশকে অচল করার যে যোগ্যতার প্রমাণ তিনি দিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে, দেশ ও জনগণের মঙ্গল করার কোনো যোগ্যতা না থাকলেও ক্ষতি করার প্রচুর সামর্থ্য তিনি রাখেন।

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পন্থায় চেষ্টা করার পরিবর্তে ফ্যাসিবাদী উপায়ের আশ্রয় নিয়ে তিনি জনগণের প্রতি আস্থাহীনতারই প্রমাণ দিলেন। ২০০১ সালে জনগণ কেন তাকে ক্ষমতায় বসতে দিল না এরই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ১৪ কোটি মানুষকে অবরোধের মাধ্যমে জিম্মি করে রাখলেন। এতে জনগণ যে তার প্রতি ক্ষিপ্ত হচ্ছেন তা তিনি টের পাচ্ছেন না।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনা আস্ফালন করে বলেন, তার সংস্কার দাবি জনগণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। যদি এ কথা সত্য হতো তাহলে কবেই তার পক্ষে গণ-অভ্যুত্থান হয়ে যেত। চারদলীয় জোট সরকারের সময় বারবার গণ-অভ্যুত্থানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু বর্তমান দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের আমলেও তো জনগণ তার পক্ষে সাড়া দিল না। তার লাঠি-লগি-বৈঠার দাপটে সরকারের উপদেষ্টাগণ তার দরবারে বারবার ধরনা দিয়ে যে চরম দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও জনগণ এগিয়ে এল না। জনগণ বরং তার বাড়াবাড়ি বরদাশ্‌ত করছে এবং দুর্বল সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হচ্ছে।

শেখ হাসিনা যদি নির্বাচন বানচাল করতে ব্যর্থ হন এবং কেয়ারটেকার সরকার যদি নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয় তাহলে আশা করা যায় যে, জনগণ ব্যালটের অস্ত্র প্রয়োগ করে তার ক্ষমতার লিপ্সা মিটিয়ে দেবে।

২৯১.

গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ

গণ মানে পাবলিক বা জনগণ। গণতন্ত্র অর্থ জনগণের শাসন। জনগণ সরাসরি শাসন করতে পারে না। তাই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনগণের পক্ষ থেকে শাসন করেন। গণতান্ত্রিক দেশে কয়েক বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর যে সরকার কায়েম হয় এর মেয়াদ শেষ হলে আবার নির্বাচন হয়। জনগণ যাদেরকে নির্বাচিত করে তারা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংবিধান বা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কোন্ বিভাগের ক্ষমতার সীমা কতটুকু— এসব যেমন সুস্পষ্ট ভাষায় সংবিধানে উল্লেখ থাকে, তেমনি নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কেও সংবিধানে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ধার্য করা থাকে।

সাধারণত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমেই সংবিধান বা শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রের সকলকেই তা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হয়। সরকার ও জনগণ সংবিধানকে পবিত্র দলিল হিসেবে স্বীকার করে এবং এর মর্যাদা রক্ষা করা নাগরিক কর্তব্য বলে গণ্য করে।

প্রকৃতপক্ষে এ সংবিধানই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। আর রাজনৈতিক দল ছাড়া নির্বাচন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলসমূহ যদি বিশ্বস্ততার সাথে সংবিধান মেনে চলে তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। রাজনৈতিক দলই নির্বাচিত হয়ে দেশ শাসন করে এবং শাসনতন্ত্র সংরক্ষণ করে। রাজনৈতিক দল ছাড়া সংবিধান লঙ্ঘন করার সাহস অন্য কারো নেই। রাজনৈতিক

www.bjilibrary.com

দলই যদি সংবিধান অমান্য করে তাহলে গণতন্ত্র অবশ্যই বিপন্ন হয়। এটাই গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার আসল কারণ। সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখলের কারণে অবশ্যই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়; কিন্তু রাজনৈতিক সরকারের অযোগ্যতার ফলেই সশস্ত্র বিপ্লব সফল হয়ে থাকে। তাই গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বই আসল দায়ী।

সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন এক কথা নয়

সংবিধান প্রণয়নের সময়ই তাতে উল্লেখ করা হয় যে, এর সংশোধন করা প্রয়োজন হলে কোন্ পদ্ধতিতে তা করা যাবে। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন ছাড়া কোনো সংশোধনই বৈধ বলে গণ্য হবে না। কোনো সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জরুরি নয়। তাই সংসদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কোনো সংশোধনের বিরোধী হলেও তা বৈধ হবে।

এ পর্যন্ত সংবিধানের যতগুলো সংশোধনী সংসদে পাস হয়েছে, এর মাত্র অল্প কয়েকটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে; কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী পাস হওয়ার কারণে সব কয়টিই বৈধ। কোনো সংশোধনীই অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে হয়নি।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারপদ্ধতি পরিবর্তনসহ এমন কতক পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা গণতন্ত্র হত্যার শামিল। ঐ সংশোধনীকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিলেও অসাংবিধানিক বলা চলে না। কারণ, তা সংসদে প্রায় সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে। মাত্র দুজন সদস্য এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা হলেন জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

সংশোধনী দ্বারা সংবিধানে যত বড় পরিবর্তনই আসুক এবং তা নিয়ে রাজনীতিকদের মধ্যে যত বড় মতপার্থক্যই থাকুক, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সংশোধন করা হলে তাকে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে দাবি করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, সংবিধান সংশোধন ও লঙ্ঘন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

সংবিধানের ব্যাখ্যা

সংবিধানের কোনো ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হতেই পারে। সংবিধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

বর্তমানে (২০০৬) কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ ও নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ব্যাপক সাংবিধানিক মতবিরোধ ও বিতর্ক চলছে। আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ বিরাটসংখ্যক লোক এ বিতর্কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। রাজনীতিকদের মধ্যে তো বিতর্ক আছেই; সকল মহলই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নিকট মীমাংসার জন্য না গিয়ে বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন।

www.bjilibrary.com

সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘন

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংবিধান বাতিল বা মুলতবি হলে অবশ্যই সংবিধান লঙ্ঘন হয়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যতবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এর বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হবে যে, রাজনৈতিক বেসামরিক সরকারের অযোগ্যতা ও কুশাসনের ফলে সরকার জনপ্রিয়তা হারালে সশস্ত্র বাহিনী ক্ষমতা দখল করার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তান যেমন ১৯৪৩ সালের নির্বাচনে ভোটের জোরেই কায়েম হয়, বাংলাদেশও তেমনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের রায়ের ফলেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পন্থায়ই জনগণের বিজয় হয়েছে; কিন্তু বিজয়ের পর যে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা এল, তাদের চরম অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিণামে যখন তারা জনপ্রিয়তা হারালেন তখনই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

তাই আমি মনে করি, রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বই সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী। তারা যদি বিশ্বস্ততার সাথে সংবিধান মেনে চলেন তাহলে সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া স্বাভাবিক নয়। সংবিধান সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখার দায়িত্ব তাদেরই।

বাংলাদেশে সংবিধান লঙ্ঘনের প্রথম দৃষ্টান্ত

সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সংবিধান মুলতবি করে সামরিক শাসন চালু করেন। এক বছর পর তিনি ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু করার সুযোগ দান করেন। এরইমধ্যে তিনি সংবিধান বহাল করার পূর্বেই তা সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, সংসদে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় তখন ছিল।

রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সমস্বরে এর বিরুদ্ধে আপত্তি করা কর্তব্য ছিল। বলা উচিত ছিল যে, সংবিধান জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত। একমাত্র জনপ্রতিনিধিদের উপরই এর সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে এর সংশোধনের যে বিধান রয়েছে, তা লঙ্ঘন করে সংশোধন করার কোনো ইখতিয়ার কারো নেই।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত তখনকার ১৫ দলীয় জোট দাবি জানায় যে, চতুর্থ সংশোধনী পর্যন্ত বহাল রেখে এবং পরবর্তী সংশোধনী বাতিল করে সংবিধান বহাল করা হোক। কাজী জাফর আহমদের দল দাবি জানাল যে, ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধান বহাল করা হোক এবং সকল সংশোধনী বাতিল করা হোক। এভাবে বিভিন্ন দল সংবিধান সংশোধন করার ইখতিয়ার সামরিক স্বৈরশাসকের হাতে তুলে দেয়। তারা এটুকুও চিন্তা করলেন না যে, সামরিক শাসকের হাতে এ ক্ষমতা তুলে দিলে তিনি তাদের কারো মতামতেরই পরওয়া করবেন না। তিনি স্বেচ্ছাচারের সুযোগ পেয়ে তার মর্জিমতোই সংশোধন করবেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে সংবিধান লঙ্ঘনের এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী ১৯৮৩ সালের ২৮ মার্চ রাজধানীসহ সারা দেশে একটি হ্যান্ডবিল বিলি করে। তাতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, সংবিধান দেশের পবিত্র দলিল। সংবিধানে এর সংশোধনের যে পদ্ধতি রয়েছে, সে পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় সংশোধন করার কোনো ইখতিয়ার কারো নেই।

ঐ সময় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রচারসংখ্যা সর্বোচ্চ ছিল। এ পত্রিকার ২৯ মার্চ ১৯৮৩ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স করে এ বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হয়। কোনো হ্যান্ডবিল দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার নজির নেই। কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপনটির আলোচ্য বিষয়ের বিরাট গুরুত্বের কারণেই কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ করে থাকবেন।

এরপর এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের পূর্ব-প্রস্তাবের আর পুনরাবৃত্তি করেনি এবং সামরিক স্বৈরশাসকও এ বিষয়ে আর মুখ খোলেননি।

সংবিধান লঙ্ঘনের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

১৯৯৬ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন। শপথ গ্রহণের সময় তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছে যে, 'আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব'।

রাষ্ট্রের যে কয়টি আদর্শ ১৯৭২-এ প্রণীত সংবিধানে উল্লেখ ছিল তার প্রথমটির নাম ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'। ১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর স্থলে লেখা হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'।

শেখ হাসিনা যখন শপথ নেন তখন ঐ সংশোধিত সংবিধানেরই রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ নিয়েছেন। অথচ ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই তিনি দাপটের সাথে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন। তার শাসনকালের সময় বারবার তিনি তার এ প্রিয় আদর্শের কথা উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেননি।

তিনি যদি সংবিধান সংশোধন করে পুনরায় তার এ আদর্শ সংবিধানে বহাল করতে সক্ষম হতেন তাহলে সংবিধান লঙ্ঘন হতো না; কিন্তু সংবিধানকে লঙ্ঘন করে তিনি চরম অনৈতিকতার পরিচয় দিলেন।

সংবিধান লঙ্ঘনের তৃতীয় দৃষ্টান্ত

শেখ হাসিনার শাসনামলে সরকারের আমলা জনাব এম এ সাঈদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়। সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে শরীক বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী এর প্রতিবাদে হরতাল করে। এটা অবশ্যই সংবিধান লঙ্ঘন। তবে এটা সাময়িক লঙ্ঘন ছিল, স্থায়ী লঙ্ঘন নয়। বিচারপতি লতিফুর রহমান কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর ঐ তিন দলসহ সকল রাজনৈতিক দলই কোনো আপত্তি না করে ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এভাবে ঐ তিন দল সংবিধান লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকায় সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা পায়।

www.bjilibrary.com

সংবিধান লঙ্ঘনের চতুর্থ দৃষ্টান্ত

২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধান অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা ছিল সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির। বর্তমান (২০০৬) প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাসসির হোসেন ২০০৫ সালে অবসর গ্রহণ করলে তিনিই সংবিধান অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা হতেন; কিন্তু চারদলীয় জোট সরকার ২০০৪ সালে সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিম ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণের চাকরির বয়সসীমা দুবছর বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বর্তমান প্রধান বিচারপতি গত বছর অবসর নেননি। এর ফলে সংবিধান অনুযায়ী সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানেরই প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা।

আওয়ামী লীগ আবিষ্কার করল যে, ২৫ বছর পূর্বে বিচারপতি কে এম হাসান বিএনপির দলীয় কোনো পদে ছিলেন বিধায় তিনি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ নন। তাই তারা তাঁকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে মেনে নেবে না।

যারা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কমপক্ষে ১০ বছর এ্যাডভোকেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাধারণত তাদের মধ্য থেকেই বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। এ্যাডভোকেট থাকাকালে তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকতেই পারেন। বিচারপতি হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাদেরকে রাজনৈতিক বা দলীয় ব্যক্তি গণ্য করে তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা মোটেই সমীচীন নয়। বিচারপতি হিসেবে নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন বলেই তাদেরকে সবাই তদন্ত কমিশনের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি জানায়।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের সময় বিচারপতি হাবিবুর রহমান কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনে বামপন্থি ছাত্রসংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর নেওয়ার পর থেকে তিনি আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিদের বলয়ে একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাদৃত। তাঁর এ পরিচিতি অজানা ছিল না। এ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কেউ আপত্তি তোলেনি। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাংবিধানিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে সকল রাজনৈতিক দলই তাঁকে মেনে নিয়েছে।

আওয়ামী লীগ মনে করে যে, বিচারপতি কে এম হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা করার উদ্দেশ্যেই বিচারপতিগণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সব ব্যাপারেই অপরপক্ষের বদ নিয়ত তালাশ করা তাদের অভ্যাস। যদি বয়সসীমা বৃদ্ধি করা না হতো তাহলে বর্তমান প্রধান বিচারপতি সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতেন। তখন কি আওয়ামী লীগ তাঁকে মেনে নিতে সম্মত হতো?

বর্তমান প্রধান বিচারপতির সাথে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামীপন্থি আইনজীবীগণ যে আচরণ করেছেন তাতে এ বিচারপতি সম্বন্ধে তাদের মনোভাব স্পষ্ট। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বর্তমান প্রধান বিচারপতি সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বাদ দিয়ে জুনিয়রদেরকে আপিল বিভাগে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সংবিধান লঙ্ঘনের পঞ্চম দৃষ্টান্ত

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার আন্দোলনও সংবিধান লঙ্ঘনের আরেকটি দৃষ্টান্ত। তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় রাজনীতির অভিযোগ করা হয়নি। তাঁর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণও বোধগম্য নয়। ভোটার তালিকা নতুনভাবে করাই তাঁর প্রধান অপরাধ। ইতঃপূর্বে প্রত্যেক নির্বাচনের পূর্বে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ২০০৭ সালের নির্বাচনের জন্য নতুন ভোটার তালিকা করা দূষণীয় হবে কেন? শেখ হাসিনার আমলে প্রণীত ভোটার তালিকা বহাল রেখে তাকে হালনাগাদ করার দাবি প্রথমে তিনি মানতে রাজি হননি; কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পর তিনি মেনে নিয়েছেন। তবু তাঁকে অপসারণের দাবি কি সংবিধানসম্মত?

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই এখন বিপন্ন

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যেই সকল রাজনৈতিক দল ১৯৯০ সালে একমত হয়ে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পদ্ধতিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই ১৯৯১ সালে এ পদ্ধতিতে এ দেশে প্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশে তা প্রশংসিতও হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হওয়ায় এ পদ্ধতির কোনো সংস্কার তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ায় তিনি নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতেই অস্বীকার করেন। অথচ সে নির্বাচন তারই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও তারই নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের বিরুদ্ধেও নির্বাচনের পূর্বে তিনি রাজনৈতিক দলীয় ব্যক্তি বা অনিরপেক্ষ হিসেবে কোনো অভিযোগ করেননি।

২০০৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে শেখ হাসিনা প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আন্দোলন করে সংবিধান লঙ্ঘনের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, এর পরিণামে ভবিষ্যতে যদি বিচারপতিগণ এসব পদ গ্রহণ করতে বিরত হন তাহলে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিটিই বিপন্ন হয়ে পড়বে। শেখ হাসিনার সংবিধানবিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত সম্মানিত বিচারপতিগণকে যে চরমভাবে অপমানিত করল এবং তার দলের নেতারা তাঁদের বিরুদ্ধে যে ইতর ভাষা প্রয়োগ করেছেন, এরপর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কোনো বিচারপতি এসব পদ গ্রহণ করতে সম্মত না হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে।

দেশের রাজনীতি যে দুই প্রান্তিক মেরুতে বিভক্ত, তাতে কোনো ব্যক্তির পক্ষে উভয় মেরুতে অবস্থানরত নেতৃবৃন্দের ঐকমত্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। এ পরিস্থিতিতে কেয়ারটেকার সরকার গঠনে চরম সংকট দেখা দিতে পারে।

শেখ হাসিনার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

শেখ হাসিনা দেড় বছরব্যাপী সংস্কার আন্দোলন করলেন। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার হরতাল, রোডমার্চ, লংমার্চ, মহাসমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল করলেন। কয়েকবার গণ-অভ্যুত্থানের হুমকিও দিলেন।

www.bjilibrary.com

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে। এর পূর্বে মাসখানেক দুই পক্ষের দুই মহাসচিব নিষ্ফল সংলাপ চালান। আওয়ামী লীগ চার বছর পর্যন্ত জোট সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার ঘোষণা দিতেই থাকল; কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।

নবগঠিত কেয়ারটেকার সরকার গঠনের সময় শেখ হাসিনা ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর একটানা তিন দিন অবরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে গোটা দেশকে অচল করে রাখেন। লাঠি-বৈঠা-লগি এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে দেশের ১৪ কোটি মানুষকে জিম্মি করে ফেলেন। দেশে তখন সরকার ছিল না বললেই চলে।

২৯ অক্টোবর কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা এবং পরের দিন ১০ জন উপদেষ্টা শপথ নিলে নতুন সরকার কায়েম হয়। এ সরকারকে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য চার দিন সময় দিয়ে ৪ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত তারা আবার অবরোধের নামে নৈরাজ্য কায়েম করলেন। কয়েকজন উপদেষ্টার অনুরোধে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য আরো সময় দিয়ে ২০ থেকে ২৩ নভেম্বর অবরোধ অব্যাহত রাখলেন।

সংস্কার আন্দোলনের বিরাট সাফল্যের জন্য বিজয় উৎসব করা হলো, কিন্তু কী বিজয় হলো তা বোধগম্য নয়। অবরোধ করে ২৮ অক্টোবর বিচারপতি কে এম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হওয়া থেকে বিরত রেখে নাকি তারা প্রথম বিজয় অর্জন করলেন, আর ২৩ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ছুটি নিতে বাধ্য করে নাকি দ্বিতীয় বিজয় অর্জন করলেন।

বিচারপতি কে এম হাসান ২৫ বছর পূর্বে দলীয় ব্যক্তি ছিলেন। ১৪ দল তাঁকে দায়িত্ব গ্রহণে বাধা দিয়ে দলীয় নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ঐ দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দিল। বিচারপতি এম এ আজিজকে সরিয়ে বিচারপতি মাহফুজুর রহমানকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যবস্থা করে শেখ হাসিনা কী অর্জন করলেন?

শেখ হাসিনার বিজয় লাভের হিসাবটা কি শূন্যের কোঠায় বলে মনে হয় না? তার সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল শুধু শূন্য নয়, মাইনাসই বলা চলে। যে দুজনের বিরুদ্ধে এমন মহাআন্দোলন করা হলো তাঁদের কি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করার কোনো সামান্য আশঙ্কাও ছিল? তাঁদের বদলে যাদের উপর দায়িত্ব এল তাঁরা ঐ দুজনের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে ধারণা করার যুক্তি কী?

আসলে শেখ হাসিনার রাজনীতি হলো জিদ ও হিংসার রাজনীতি। যাঁদেরকে অপসারণের জন্য তিনি জিদ ধরলেন তাঁদেরকে সরাতে সক্ষম হওয়া বিজয়ই বটে। তিনি এ বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করুন। তাতে তার প্রতিপক্ষের কিছুই আসে-যায় না।

এটা যদি তার বিজয় হয়ে থাকে তাহলে তা প্রতিপক্ষের পরাজয় বলে গণ্য হওয়া উচিত। ঐ দুই ব্যক্তির বদলে যে দুজনের উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাতে কি প্রতিপক্ষের পরাজয় হয়েছে বলে শেখ হাসিনা সত্যি বিশ্বাস করতে পারবেন?

৭

www.bjilibrary.com

২৯২.

বাংলাদেশের মালিক কে? জনগণ নাকি শেখ হাসিনা?

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের নভেম্বরে শেখ মুজিবের শাসনামলেই প্রণীত হয়। এর ৭(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।'

এই ধারা অনুযায়ী জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৯১ সালে বিএনপিকে, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগকে এবং ২০০১ সালে চারদলীয় জোটকে ক্ষমতা প্রয়োগ করার দায়িত্ব অর্পণ করে।

সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত কোনো সরকার পাঁচ বছর মেয়াদের অতিরিক্ত এক দিনও ক্ষমতায় থাকতে পারে না। মেয়াদ শেষ হলেই সেই ক্ষমতা আবার জনগণের হাতে ফিরে আসে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে আবার যাদের হাতে ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়, তারাই পাঁচ বছর জনগণের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করবে।

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ জাতীয় সংসদের দু-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করে ক্ষমতাসীন করেছে। দেশ-বিদেশের সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষক ঐ নির্বাচনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অবাধ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

কিন্তু শেখ হাসিনা সামান্য কোনো প্রমাণ ও যুক্তি ছাড়াই দাবি করলেন যে, জনগণ চারদলীয় জোটকে ক্ষমতা দেয়নি। জনগণ নাকি তাকেই ক্ষমতা দিয়েছিল; কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশনপ্রধান, পুলিশ প্রশাসনপ্রধান ও সেনাপ্রধান জনগণের ঐ ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে চারদলীয় জোটকে দিয়ে দিয়েছে। তারা সবাই শেখ হাসিনার ভোট চুরি করেছেন।

শেখ হাসিনা যে হামেশা চারদলীয় জোটকে 'ভোটচোর' বলে গালি দেন, এ গালিটি আসলে উক্ত পাঁচ প্রধানকেই দেওয়া হচ্ছে। কারণ, নির্বাচন পরিচালনা তারাই করেছেন, চারদলীয় জোট করেনি।

প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনা জনগণকে ক্ষমতার মালিক মনে করেন না। যদি করতেন, তবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ যে রায় দিয়েছে তা মেনে নিতেন। ১৯৯৬ সালে তাকে ক্ষমতা দেওয়ার কারণেই তিনি সে রায় মেনে নিয়েছেন। এর মানে হলো, জনগণ তাকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে রায় দিলে তিনি তা মেনে নেন না।

এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, শেখ হাসিনা নিজেকেই এ দেশের ক্ষমতার মালিক মনে করেন।

কেয়ারটেকার সরকার আমলে শেখ হাসিনার মালিকসুলভ হুমকি

কেয়ারটেকার সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকার নয়। দেশ শাসন করাও এ সরকারের দায়িত্ব নয়। সংবিধান এ সরকারকে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের

www.bjilibrary.com

দায়িত্ব দিয়েছে এবং সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছে।

স্বাভাবিক কারণেই এ সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারের মতো শক্তিশালী ও সাহসী হতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলো এ সরকারকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন দিলে এবং সর্বদিক দিয়ে এ সরকারের সাথে সহযোগিতা করলেই তারা শক্তি ও সাহস পেতে পারে।

শেখ হাসিনা ২০০৫ সালের জুলাই থেকেই তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনের নামে দেশের মালিকসুলভ হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে তিনি কোনো পাত্তা পাননি। হরতাল ও মহাসমাবেশসহ নাশকতামূলক কর্মসূচি দিয়ে সরকারকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছেন; কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ও জনগণকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া কিছুই অর্জন করতে পারেননি। গণ-আন্দোলন করে সরকারকে তার সংস্কার দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার হুমকি তিনি বহু বার দিয়েছেন। গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 'খালেদা-নিজামী' সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করবেন বলে বারবার দাবি করেছেন। সংসদ বর্জন করে রাজপথে লম্ফ-ঝম্ফ করে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে এ কথা বলে সংসদে যোগদান করলেন যে, তার সংস্কার আন্দোলন সংসদ ও রাজপথ উভয় ময়দানে সমভাবে চলবে।

জোট সরকার তাদেরকে সংসদে স্বাগত জানিয়ে তাদের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে কমিটি পর্যায়ে আলোচনার সুযোগ দান করে; কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর কেউ কমিটিতে থাকলে তারা আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। জোট সরকার শেষ পর্যন্ত প্রধান দুদলের মহাসচিবের মধ্যে সংলাপের সুযোগ দেয়; কিন্তু তারা সাবেক প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা না হওয়ার দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হন।

জোট সরকারের আমলে শেখ হাসিনা অবরোধ করে দেশকে অচল করে দেওয়ার হিম্মত দেখাননি। লগি-বৈঠা নিয়ে সন্ত্রাস করার ধৃষ্টতা প্রদর্শনেরও সাহস পাননি।

কেয়ারটেকার সরকার গঠনের সময়ে শেখ হাসিনা তার ফ্যাসিবাদী অবরোধ কর্মসূচি দিয়ে দুর্বল সরকারকে কাবু করে বিচারপতি কে এম হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেন। আরো একটা অবরোধ দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজকে ছুটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য করেন। এভাবে এ সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংবিধানবিরোধী বড় বড় দুটো দাবি জোর করে আদায় করে নেওয়া হয়।

পূর্ববর্তী কোনো কেয়ারটেকার সরকারকে এ জাতীয় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। শেখ হাসিনার দুটো দাবি পূরণ করতেই সরকারের ৯০ দিন মেয়াদের ২৬ দিন বাজে খরচ হয়ে গেল।

www.bjilibrary.com

নির্বাচন অনুষ্ঠান কি সম্ভব হবে?

কেয়ারটেকার সরকার শেখ হাসিনার চাপে পড়ে তার দুটো দাবি পূরণ করার পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের উপর তার মালিকানা ফলানোর ক্ষমতা বেড়ে গেল। এখন তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, প্রফেসর ড. ইয়াজুদ্দিন আহমেদকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের পদ ত্যাগ করে তার নির্দেশমতো বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীকে সে পদে নিয়োগ করতে হবে। তার ১১ দফা দাবির সকল দাবিই পূরণ করার জন্য তিনি চাপ প্রয়োগ করেছেন। সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে তার দাবি ইতোমধ্যে অনেকখানি মেনে নেওয়া হয়েছে।

হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের পূর্বনিযুক্ত সকল কমিশনারকে অপসারণ না করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হলে তা প্রতিহত করা হবে। কেননা তার মতে, তাদের পরিচালনায় নির্বাচন হলে তা চারদলীয় জোটের 'নীল নকশা'র নির্বাচনই হবে, নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না।

শেখ হাসিনাদের আরেকটি অবাস্তব দাবি হলো, ভোটার তালিকা সংশোধন করতে হবে। তাদের মতে, বর্তমান ভোটার তালিকায় এক কোটি চল্লিশ লাখ ভুয়া ভোটার রয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে যে, অনুমানভিত্তিক কথার কোনো মূল্য নেই। কেউ বাদ পড়ে থাকলে তার নাম দেওয়া হোক এবং কোনো ভুয়া ভোটার থাকলে তা চিহ্নিত করা হোক। নির্বাচন কমিশন সেসব সংশোধন করে নেবে।

কেয়ারটেকার সরকারের যে উপদেষ্টাগণ আওয়ামী লীগকে নির্বাচনমুখী করার উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনাকে তোয়াজ করা প্রয়োজন মনে করলেন তারা কি এ ধারণা করেছিলেন যে, বিচারপতি এম এ আজিজকে সরিয়ে দিলেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত হবে? প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এম এ আজিজের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে ছুটি নিতে সম্মত করার পূর্বে কি কোনো আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, এর ফলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসবে? এমন কোনো আশ্বাস না পেয়ে থাকলে এ পদক্ষেপ তিনি কেন নিলেন? এতে তো এ সরকারের চরম দুর্বলতার প্রমাণ পেয়ে শেখ হাসিনার সাহস আরো বেড়ে গেল।

এ পরিস্থিতিতে কেয়ারটেকার সরকার আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যে কেমন করে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হবে? প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনাকে চিনতে দারুণ ভুল করেছেন। শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান। বিএনপি থেকে দলছুটদের দ্বারা নবগঠিত এলডিপি (লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি) শেখ হাসিনার আন্দোলনে শরীক হওয়ায় তার সাহস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারপতি এম এ আজিজকে অপসারণের আন্দোলনে শেষ মুহূর্তে এরশাদের জাতীয় পার্টিও শরীক হওয়ায় শেখ হাসিনা আশা করেছেন যে, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ছাড়া সকল দলই তার নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারকে অচল করে বিনা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হতে সক্ষম হবেন।

www.bjilibrary.com

যদি নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং সশস্ত্র বাহিনী দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে বাধ্য হবে। ১৯৯১ সাল থেকে দেশে গণতন্ত্রের যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা স্তব্ধ হয়ে যাবে।

এ জাতীয় পরিস্থিতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সংবিধানের ১৪১ক(৩) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রেসিডেন্ট দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন। শেখ হাসিনার নেতিবাচক ও অগণতান্ত্রিক আন্দোলন দেশে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এ থেকে পরিত্রাণের কোনো বিকল্প পথ আছে বলে মনে হয় না। একমাত্র এ পথেই সংবিধানকে সমুন্নত রাখা সম্ভব।

দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শেখ হাসিনার অবদান

১৯৯৬ সালের জুন থেকে পাঁচ বছরের শাসনামলে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও জনগণের প্রতি নিম্নরূপ অবদান রেখেছেন :

১. তার চরম ইসলামবিরোধী মতবাদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে এ দেশে চালু করার উদ্দেশ্যে ইসলামকে দুর্বল করার ব্যাপক ষড়যন্ত্র করেন।

ক. সংবিধান থেকে ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ কুফরী মতবাদের পক্ষে দাপট দেখাতে থাকেন।

খ. ইসলামী দলগুলোকে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করে জনগণের নিকট হেয়প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা চালান।

গ. মাদরাসা শিক্ষাকে সংকুচিত করে ক্রমান্বয়ে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ঘ. মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে বড় বড় আলেমদেরকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখেন।

ঙ. দীনের বিধান জানার জন্য আল্লাহ তাআলা জনগণকে আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলেমগণ যে রায় দেন, এরই নাম ফতোয়া। আল্লাহ স্বয়ং আলেমগণকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন। কোনো এক স্থানে এ ফতোয়ার অপপ্রয়োগকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি গোলাম রাব্বানী কোনো মামলা ছাড়াই নিজের পদের দাপট দেখিয়ে আলেমসমাজের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেওয়া বেআইনি ঘোষণা করেন। বিচারপতির এ রায় শেখ হাসিনার এত পছন্দ হয় যে, এ ধৃষ্টতার পুরস্কারস্বরূপ অন্য সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে এ বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রমোশন দেন।

২. তিনি তার পিতার বাকশালী আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পিতা ১৯৭৫ সালে সকল রাজনৈতিক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি দল গঠন করেন। বাংলাদেশকে ৬১টি প্রদেশে বিভক্ত করে

www.bjilibrary.com

৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করেন। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' শ্লোগান চালু করে শেখ মুজিব এ দেশের ডিকটেটর (স্বৈরশাসক) হন।

এ ব্যবস্থার পূর্ণ বাস্তবায়নের পূর্বেই একদল মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার শেখ মুজিবকে হত্যা করে গণতন্ত্রকে পুনর্বহালের সূচনা করেন এবং বাংলাদেশকে মুজিব পরিবারের সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে তার পিতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন :

ক. তিনি গভর্নরের বদলে গডফাদার নিয়োগ করে বিভিন্ন জেলায় তার দলীয় সন্ত্রাসীদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে থাকেন। ২০০১ সালে আবার ক্ষমতায় যেতে না পারায় সকল জেলায় এ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি।

খ. জাতীয় সংসদকে বাকশালী কায়দায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যাতে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে বাধ্য হয় এবং বিনা বাধায় স্বেচ্ছাচারমূলক আইন পাস করা যায়।

গ. সরকারবিরোধীদেরকে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন তৈরি করেন। শেখ হাসিনা এ আইনকে যথেষ্ট মনে করেননি। সন্ত্রাস দমনের দোহাই দিয়ে তিনি 'জননিরাপত্তা আইন' নামে এক জঘন্য কালা কানুন পাস করে তা বিরোধী দল, এমনকি ছাত্রদের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেন।

ঘ. বিচার বিভাগ গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ। শাসন বিভাগের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আইনগত আশ্রয়ই হলো আদালত। শেখ মুজিব হত্যা মামলায় কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করায় শেখ হাসিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে জঙ্গি লাঠি মিছিল হয়। বিচারপতিদেরকে হুমকি দিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'সঠিক বিচার না করলে কোথায় লাঠি মারতে হয় তা আওয়ামী লীগ জানে।'

ঙ. সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি বাকশালী আচরণ। বাকশাল মানে একদলীয় শাসন। সংবিধান থেকে বাকশাল উৎখাত হয়ে গেলেও শেখ হাসিনার মগজে ও মেজাজে তা পূর্ণরূপে বহাল আছে— যেমন সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ না থাকলেও তার কলবে তা কায়েম আছে। বাকশালী মেজাজের দুটো প্রমাণ দিচ্ছি :

i. বিরোধী দল হরতাল ডাকলে সরকার পুলিশ দিয়ে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটাই সব সময় দেখা যায়; কিন্তু শেখ হাসিনার শাসনামলে বাকশালী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বাকশাল মানে সরকারি দল ছাড়া অন্য কোনো দল না থাকা। তাই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো দলকে ময়দানে তৎপর থাকতে দেওয়া চলে না। তাই আওয়ামী লীগ আমলে প্রত্যেক হরতালের সময়ই দেখা গেছে, আওয়ামী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাজপথে নেমে হরতাল প্রতিহত করছে এবং পুলিশ তাদেরকে এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করছে।

www.bjilibrary.com

ii. যেসব এলাকায় কোনো বিরোধী দলের জনসভা স্থানীয় আওয়ামী নেতারা পছন্দ করেনি, সেখানে বিরোধী দলের জনসভাস্থলে আওয়ামীদের পক্ষ থেকে একই দিন ও একই সময়ে জনসভা আহ্বান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন সংঘাত এড়ানোর দোহাই দিয়ে ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী দলের জনসভা বন্ধ করার পবিত্র দায়িত্ব পালন করে। এ পদ্ধতি জামায়াতে ইসলামীর বেলায়ই সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়।

৩. বাংলাদেশকে তার পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করা এবং তার পিতাকে জোর করে জাতির পিতা হিসেবে জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া।

ক. সারা দুনিয়া সাক্ষী যে, মুজিব হত্যার কারণে জনগণ 'ইন্না লিল্লাহ' পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। সারা দেশে মানুষ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং রাজধানী ঢাকায় উৎসবের আমেজে দলে দলে মানুষ জুমুআর নামাযে যোগদান করেছে। জনগণ যদি তাঁকে জাতির পিতা গণ্য করত তাহলে এমন আচরণ করা স্বাভাবিক নয়।

ইতিহাস ও ঐ সময়কার সংবাদপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, জনগণ শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে মোটেই গণ্য করে না। শেখ হাসিনা ক্ষমতা হাতে পেয়ে তার পিতাকে জনগণের পিতা হিসেবে মানার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন–

i. টাকার নোটে শেখ মুজিবের ফটো ছাপানো।

ii. সরকারি সকল অফিস-আদালতে তার পিতার ছবি ঝোলানো। এমনকি মাদরাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তার পিতার ছবি ঝোলানোর জন্য আইন পাস করা হয়েছিল।

iii. যমুনা সেতু, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল (পিজি হাসপাতাল) ইত্যাদি স্থাপনার নামের সাথে তার পিতার উপাধি যুক্ত করা। এসব স্থাপনা কি তার পিতা নির্মাণ করে গেছেন?

খ. সরকারি গণভবন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা গণভবনকে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বাসভবন হিসেবে ঘোষণা করে এবং নির্লজ্জের মতো তিনি তা গ্রহণ করে জানিয়ে দেন যে, যত দিন তিনি রাজনীতি করবেন তত দিন তিনি গণভবনেই থাকবেন।

শেখ হাসিনা যে যে যোগ্যতার অধিকারী

শেখ হাসিনা ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর থেকে বিগত পাঁচ বছর যেসব যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি করার কোনো যোগ্যতা না থাকলেও নিজের জন্মভূমির জঘন্য দুর্নাম রটনা করায় তিনি অত্যন্ত পারঙ্গম বলে প্রমাণ

www.bjilibrary.com

করতে সক্ষম হয়েছেন। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত সফর করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়েছেন। বাংলাদেশে নাকি হিন্দুদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। জোট সরকার নাকি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী ও তালেবানী। এ অপপ্রচারের মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমেরিকা যেন আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও দখল করে নিয়ে হামিদ কারজাইয়ের মতো তাকে ক্ষমতায় বসায়; আর ভারত যেন হিন্দুদেরকে রক্ষা করার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে আক্রমণ চালায়।

২. শেখ মুজিবের আমলে দুর্নীতির ফলে এ দেশ 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে দুনিয়ায় পরিচিত ছিল। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯৮ সালে বিশ্বে দুর্নীতিতে বাংলাদেশ প্রথম স্থান লাভের গৌরব(!) অর্জন করে। এ দিক দিয়েও তিনি চরম যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন।

৩. তিনি দেশের অর্থনীতির অগ্রগতি সাধনের ব্যাপারে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারলেও হরতাল, অবরোধ ও বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী আন্দোলন করে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করা, পরিবহন বন্ধ করে পণ্য সরবরাহ স্তব্ধ করা, বন্দর অচল করে আমদানি-রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচুর যোগ্যতা রাখেন।

৪. বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল করার গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিদার শেখ হাসিনা অন্যদের হরতাল না করার গণতান্ত্রিক অধিকারের ধার ধারেন না। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাস্তায় যত গাড়ি বের হয় তা পুড়িয়ে বা ভেঙে দেওয়াও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাদের নির্দেশ অমান্য করে কোনো দোকান খোলা হলে তা লুট করাও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। এসব তথাকথিত অধিকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় অর্জন করার যোগ্যতা শেখ হাসিনার অবশ্যই আছে।

৫. জনগণের কল্যাণ করার সামান্য যোগ্যতা না থাকলেও হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে তাদেরকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে বাধ্য করার যোগ্যতা তার যথেষ্ট রয়েছে।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিন কিস্তিতে ১১ দিন একটানা অবরোধ পালন করে তিনি গোটা দেশকে অচল করে রাখার যে যোগ্যতার প্রমাণ দিলেন এবং চতুর্থ কিস্তি লাগাতার অবরোধ শুরু করলেন, এর পরিণামে ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, পণ্য চলাচল ও যাতায়াতে জনগণ, সরকার ও দেশের যে কত বড় ক্ষতি করা হয়েছে তা কোটি কোটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সকল স্কুল-মাদরাসায় পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করে বার্ষিক পরীক্ষা ও এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা হয়ে থাকে। এ সময় অবরোধ করে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে ভোগান্তির শিকার হতে বাধ্য করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৬. জনগণের খেদমত করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার যোগ্যতা না থাকলেও নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট না দেওয়ার অপরাধে তাদেরকে সর্বপ্রকারে যাতনা দেওয়ার যোগ্যতার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

৭. নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতা না থাকলেও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করার অদ্ভুত যোগ্যতা তার রয়েছে। দেশ-বিদেশের সকল পর্যবেক্ষক যে নির্বাচনকে সন্তোষজনক বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, সে নির্বাচনেও স্থূল কারচুপি আবিষ্কার করার যোগ্যতা শেখ হাসিনার অবশ্যই আছে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তাবোধ না করা পর্যন্ত তিনি নির্বাচন হতে দিতে চান না।

২৯৩.

নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ঘ(১) উপধারা নিম্নরূপ :

'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসাবে ইহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহায়তায় উক্তরূপ সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন এবং এরূপ কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজন ব্যতীত কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।'

৫৮ঘ(২) উপধারায় বলা হয়েছে :

'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।'

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তৎপরতা

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা ৩০ অক্টোবর (২০০৬) শপথ গ্রহণ করেন। সংবিধানে নির্ধারিত শপথবাক্য নিম্নরূপ :

'আমি সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব; আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব, আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব।'

উপরিউক্ত শপথ গ্রহণের পর থেকে ৯ ডিসেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত এক মাস দশ দিন উপদেষ্টাগণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সংবিধানের ৫৮ঘ(২) উপধারা অনুযায়ী কোনো 'সাহায্য ও সহায়তা' করেছেন বলে কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন না। তারা যে কর্মতৎপরতা চালিয়েছেন তা নির্বাচন কমিশনের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

www.bjilibrary.com

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কি উপদেষ্টাদের দায়িত্ব?

নির্বাচন কমিশন গঠন করা প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক দায়িত্ব। নির্বাচন বানচালের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনার ১১ দফা দাবির অংশ হলো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন। আওয়ামী লীগ ও তথাকথিত ১৪ দলের এ দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রধান উপদেষ্টার উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করে উপদেষ্টাগণ সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। ১৪ দলের রাজনৈতিক দাবি আদায়ের দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে তারা নির্বাচনের পরিবেশ আরো জটিল করে তুলেছেন।

শেখ হাসিনা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করে সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। তিনি লাঠি-লগি-বৈঠার সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে রাজপথে ২৮ অক্টোবর ছয় জন মানুষ পিটিয়ে হত্যা করে এমন ভয়ানক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে সংবিধান অনুযায়ী যাঁর সেদিন সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেওয়ার কথা ছিল তিনি শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। সেদিন থেকেই অবরোধ শুরু করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার এ দাবি পূরণ হওয়ার পর একই পদ্ধতিতে তিনি অবরোধ চালিয়ে দেশকে অচল করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে অপসারণের কৌশল অবলম্বন করেন। ৩০ অক্টোবর ১০ জন উপদেষ্টা শপথ গ্রহণের পর শেখ হাসিনার এ দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের কয়েকজন গোপনে শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন, যা পত্রিকার মাধ্যমে ফাঁস হয়ে যায়। তারা অব্যাহতভাবে প্রধান উপদেষ্টার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। ময়দানে শেখ হাসিনার অবরোধে দেশ অচল, উপদেষ্টাগণের চাপ ও ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতায় উৎকণ্ঠিত প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করে ছুটি নিতে অনুরোধ করেন। বিনা অপরাধে বেচারা তার সাংবিধানিক মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে প্রেসিডেন্টকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য করতে সম্মত হন।

সংবিধান ও উপদেষ্টাদের শপথ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশনকে 'প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা' করাই উপদেষ্টাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অথচ তারা তাদের এ সাংবিধানিক দায়িত্বের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান মন্তব্য করলেন, খেলোয়াড়রা যে রেফারির উপর আস্থা রাখেন না তার মরে যাওয়াই উচিত। তাঁর জানা উচিত ছিল যে, খেলোয়াড়দের মতামত নিয়ে রেফারি নিয়োগ করা হয় না। এ মন্তব্য করে তিনি নির্দলীয় নন বলেই পরিচয় দিলেন। তিনি ১৪ দলীয় দাবির প্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে শপথ ভঙ্গ করলেন।

উপদেষ্টা সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মশহুদ চৌধুরী বললেন, প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এ কথা দ্বারা তিনি ১৪ দলকে তাদের দাবি আদায়ে আরো কঠোর হতে সাহায্য করলেন।

প্রেসিডেন্ট হয়তো আশা করেছিলেন যে, উপদেষ্টাদের দূতিয়ালির মাধ্যমে এম এ আজিজকে ছুটিতে পাঠাতে পারলে শেখ হাসিনার ১৪ দলীয় জোট খুশি হয়ে নির্বাচনমুখী

www.bjilibrary.com

হয়ে যাবে। এমন আশা না করলে তিনি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ছুটি নিতে অনুরোধ করতেন না।

এম এ আজিজ ছুটি নেওয়ার পর উপদেষ্টাগণ আরো এক মাস ধরে দূতিয়ালির নামে ১৪ দলের সকল দাবি পূরণে সর্বাত্মক তৎপরতা চালালেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে 'সাহায্য ও সহায়তা' দেওয়ার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের ১৪ দলীয় দাবি পূরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এর ফলে নির্বাচন কমিশন চরম সমস্যায় পড়ে উপদেষ্টাদের সাহায্য-সহায়তা ছাড়াই নির্বাচনের প্রস্তুতি চালিয়ে যায়। উপদেষ্টাগণ নির্বাচন কমিশনের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা অব্যাহত রাখেন।

উপদেষ্টাদের সদিচ্ছার দাবি

উপদেষ্টাদের মধ্যে যাঁরা দূতিয়ালি করে রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন তুলতে চাই না। কে কোন্ নিয়তে কাজ করে তা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানার সাধ্য নেই।

তাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে আমার ধারণা যে, প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, সেজন্য আন্তরিকভাবে তারা চেষ্টা করেছেন। হয়তো তাদের ধারণা যে, একটা বড় দল নির্বাচনে অংশ না নিলে বিশ্বে এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। তা ছাড়া তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে দেশে তারা শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেবে না। হয়তো এ কারণেই তাদের ১১ দফা দাবির যে ক'টা পূরণ করে যেন তাদেরকে নির্বাচনমুখী করা যায়, সে উদ্দেশ্যে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

উপদেষ্টাগণের এটুকু সদিচ্ছার স্বীকৃতি দিতে কারো আপত্তি হতো না, যদি তাঁরা ১৪ দলীয় জোটের দাবি আদায়ে সাহায্য করার বিনিময়ে তাদেরকে অবরোধের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হতেন এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ছুটি নেওয়ার পর কমিশনের অন্য কারো বিরুদ্ধে দাবি না জানানোর জন্য তাদেরকে সম্মত করতে চেষ্টা করতে পারতেন। তাই তাঁরা তথাকথিত ১১ দফা দাবি আদায়ে যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাতে তাঁদের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হওয়ার প্রমাণ মেলে না।

সেনাবাহিনীর খেদমত নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা

২৮ অক্টোবর থেকে শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী রাজনীতির নির্যাতন থেকে শিল্প-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, পরিবহন, শিক্ষাব্যবস্থা ও বন্দর রক্ষা করা এবং জনগণকে অবর্ণনীয় ভোগান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথম অবরোধের পরই দেশকে সচল রাখার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্ট এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই দ্বিতীয় অবরোধের পর সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপদেষ্টাগণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতিকে ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন।

www.bjilibrary.com

কয়েক দফা অবরোধে মোট ১৩ দিনে দেশের কত বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, এর হিসাব পত্রিকায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। শিল্প-বাণিজ্যের নেতৃবৃন্দ কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের পূর্বে ১৪ ও চারদলীয় জোটের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। অবরোধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা শেখ হাসিনার দরবারে ধরনা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের নিকট কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তিনি দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন।

উপদেষ্টাগণ পাঁচ সপ্তাহ একাধারে শেখ হাসিনার ১১ দফা দাবি মানানোর জন্য প্রেসিডেন্টকে চাপ দিতে থাকেন। একেক অবরোধে দেশের যে সর্বনাশ হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁদের কোনো উৎকণ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৪ দলের দাবির ভিত্তিতে তাঁরা প্যাকেজ তৈরি করে প্রেসিডেন্টকে সম্মত করানোর চেষ্টা করতে থাকেন। দেশের ১৪ কোটি মানুষ অবরোধের খপ্পরে পড়ে যে জিম্মি হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে তাঁরা নির্বিকার। ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নবনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের বিদায় হওয়ার কথা। উপদেষ্টাদের শপথ নেওয়ার পর ৪০ দিন তারা ১৪ দলীয় জোটকে তোয়াজ করেই কাটিয়ে দিলেন। আর মাত্র ৫০ দিন বাকি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা করার কোনো সময় তাঁদের নেই। ওদিকে শেখ হাসিনা হুমকি দিয়েছেন যে, উপদেষ্টাদের প্যাকেজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেনে না নিলে আবার অবরোধ কর্মসূচি দেবেন। তারা বারবার ওয়ার্নিং দিচ্ছেন যে, অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়নি, মুলতবি করা হয়েছে মাত্র।

সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়েছেন

সংবিধানে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে দেওয়া হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করার ইখতিয়ার প্রেসিডেন্টের রয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়ক হিসেবে মোতায়েন করা অপরিহার্য বিবেচনা করেছেন। তিনি জানেন যে, উপদেষ্টাগণ আগের মতোই আপত্তি করবেন। তিনি তাঁদেরকে না জানিয়েই সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে পারতেন, তবু তিনি তাঁদেরকে পূর্বেই জানিয়েছেন। তাঁদের সম্মতি নেওয়া প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক দায়িত্ব নয়।

যে উপদেষ্টাগণ ১১ দফা দাবি মানার চেষ্টা করছেন তারা জানেন যে, প্রধান উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করার জোর দাবিও শেখ হাসিনা করেছেন। তাদের দাবির কোনো শেষ নেই। নির্বাচন কমিশন উপদেষ্টাদের সাহায্য ও সহায়তার পরিবর্তে শুধু প্রতিবন্ধকতাই পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীকে পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার পর থেকে ১৪ দলীয় জোটের লাগাতার অবরোধ, হরতাল, অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসন ও পুলিশবাহিনী রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে জনগণের নিরাপত্তা

www.bjilibrary.com

বিধানেই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে। এ সুযোগে পেশাদার সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও ছিনতাইকারীরা ময়দানে তৎপর হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থিদের তৎপরতাও বেড়ে গিয়েছে। নির্বাচনের সময় তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

পূর্ববর্তী নির্বাচনে নির্বাচনের কাছাকাছি সময়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন করাই যথেষ্ট ছিল। এবার শেখ হাসিনার বাহিনী স্বয়ং সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। ১৪ দলের সমন্বয়ক ঢাকায় ২০ লাখ লোক জমায়েত করে সরকারকে তাদের দাবি মানতে বাধ্য করার হুমকি দিয়েছেন।

নির্বাচনী সিডিউল অনুযায়ী ২৩ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠানের নতুন তারিখ নির্বারিত হয়েছে। ১৪ দলীয় জোট দেশে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে বেসামরিক সরকারের পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। বেসামরিক প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য নির্বাচনের অনেক আগেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অবরোধ, হরতাল, অবস্থানের মতো ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি বন্ধ, পেশাদার সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং জনগণের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করা অপরিহার্য। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষা, ফল প্রকাশ, প্রমোশন ও নতুন বছরের জন্য ভর্তি ইত্যাদি অবরোধের কারণে আবারো বাধাগ্রস্ত যাতে না হয়, সেজন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

জনগণের মাঝে সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রতিক্রিয়া

এক মাস আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলে শেখ হাসিনা জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেতেন। শেখ হাসিনার ১৩ দিনের অবরোধ জনগণকে যে চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছে, তাতে গোটা দেশবাসী সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানাচ্ছে। সবাই পরম স্বস্তিবোধ করছে। ছাত্রছাত্রীরা উল্লাস প্রকাশ করছে। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘ উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে। পরিবহন আর বন্ধ হবে না বলে জনগণ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হলে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব থেকে ক্রেতারা রক্ষা পাবে বলে আশা করছে।

২২ জানুয়ারি (২০০৭) অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বাকি ছিল। অন্যান্য বার ভোটপ্রার্থীরা দুই মাসেরও বেশি সময় নির্বাচনী অভিযানের সময় পান। এবার শেখ হাসিনার হিংস্র রাজনীতি নির্বাচনী তৎপরতাকে স্তব্ধ করে রেখেছে। সেনাবাহিনী মোতায়েন হওয়ায় ভোটারদের নিকট প্রার্থীদের হাজির হওয়ার পরিবেশ ফিরে এসেছে। শেখ হাসিনার ক্যাডাররা ছাড়া সকল নাগরিক সেনাবাহিনী মোতায়নে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আওয়ামী লীগ সমর্থক ব্যবসায়ীরাও অসন্তুষ্ট বলে প্রকাশ্যে বলতে চাইবেন না।

সেনাবাহিনী ময়দানে অবস্থান নেওয়ার ফলে জনজীবনে স্বাভাবিক গতি সঞ্চার হয়েছে। জনগণ আশ্বস্ত হয়েছে যে, দেশে আর অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে না। তারা অবাধে

www.bjilibrary.com

ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পরবর্তী সরকার কায়েম করতে পারবে। জনজীবনে যারা গত দেড় মাস ধরে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে তাদের হিংস্রতা থেকে নিস্তার পেয়ে মানুষ তৃপ্ত।

শেখ হাসিনার প্রতিক্রিয়া

শেখ হাসিনা বলেছেন, সেনাবাহিনী নিয়োগ করে প্রেসিডেন্ট সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। সংবিধানের কোন্ ধারা লঙ্ঘন করেছেন তা কি তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন? তিনি হাইকোর্টে রিট পিটিশন করে দেখতে পারেন।

তিনি আরো বলেছেন, সামরিক বাহিনী নিয়োগ করার মতো কোনো পরিস্থিতি নাকি এখনো সৃষ্টি হয়নি। তার প্রথম অবরোধের সময়ই দেখা গেছে যে, পুলিশবাহিনী আওয়ামী ক্যাডারদের সহিংসতা দমন করতে সাহস করেনি। তারা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। দেশ অচল হয়ে যাক, মানুষ হত্যা চলুক, জনগণের দুর্ভোগ যতই হোক— পুলিশ তখন নীরব দর্শক। অবরোধের দরুন প্রতিদিন দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হলে প্রেসিডেন্ট একবার সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েও কেয়ারটেকার সরকারের উপদেষ্টাদের চাপে বিরত থাকতে বাধ্য হন।

শেখ হাসিনার একটি মন্তব্য বড়ই হাস্যকর। তিনি যা চান তা-ই জনগণের দাবি বলে মনে করেন। তাই তার ১১ দফা দাবি জনগণের দাবি। অবরোধ করা জনগণের অধিকার। তাই সেনাবাহিনী দিয়ে অবরোধ বন্ধ করা হলে তা জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার হিসেবে গণ্য। তার মতে, তিনিই জনগণ। তার দাবির বিরুদ্ধে গেলেই তা জনগণের প্রতিপক্ষ হওয়া। তাই তিনি প্রেসিডেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন সেনাবাহিনীকে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে তাদেরকে বিতর্কিত করা না হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট গত দেড় বছর ধরে সংস্কার আন্দোলনের নামে যাকিছু করেছে, তাতে তিনি জনগণকেই তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছেন। তার হরতাল-অবরোধে জনগণই জিম্মি ও অসহায়। সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষ হিসেবেই ময়দানে দায়িত্ব পালন করবে এবং জনগণকে তার হিংস্রতা থেকে রক্ষা করবে।

চার উপদেষ্টার ভূমিকা

প্রেসিডেন্টের সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রতিবাদে নিম্নোক্ত চার জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন :

১. অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. এম আকবর আলি খান,

২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা হাসান মশহুদ চৌধুরী,

৩. কৃষি, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা সি এম সফি সামি ও

৪. শিল্প উপদেষ্টা সুলতানা কামাল চক্রবর্তী।

www.bjilibrary.com

এ চার উপদেষ্টার পদত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তাঁরা প্রধান উপদেষ্টাসহ গোটা উপদেষ্টাপরিষদকে ১৪ দলীয় জোটের ১১ দফা দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করেছেন। একেকটি অবরোধের মাধ্যমে একেকটি দাবি আদায় করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টকে দাবি মানতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ১৪ দলীয় জোটের দালালি করতে করতে ৪২ দিন অতিবাহিত করার পরও দাবি শেষ হচ্ছে না। তাঁদের প্রণীত প্যাকেজ প্রেসিডেন্টকে মেনে নেওয়ার জন্য শেখ হাসিনা ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে ২০ লাখ লোককে লগি-বৈঠা-লাঠির সাথে হাঁড়ি-পাতিল-হোগলা-পাটি নিয়ে ঢাকা অবরোধ করার ডাক দিলেন।

চার উপদেষ্টা যদি সরকার ও জনগণের কল্যাণকামী হতেন, তাহলে শেখ হাসিনাকে আল্টিমেটাম দেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করতেন; বলতে পারতেন যে, আমাদেরকে সময় দিন, যাতে মানিয়ে নিতে পারি। তারা তাদের আচরণের দ্বারা প্রমাণ করলেন, তারা জনগণের প্রতিপক্ষ ১৪ দলীয় জোটের পক্ষে। ২৪ ঘণ্টা পর ঢাকায় ২০ লাখ লোকের হামলা কি তাঁরা ঠেকাতে পারতেন? এত বড় হুমকি ঠেকানোর জন্য প্রেসিডেন্ট যে ব্যবস্থা নিলেন এর প্রতিবাদে উল্লিখিত উপদেষ্টামণ্ডলী পদত্যাগ করে তাঁরা কোন্ পক্ষ, তা জনগণের নিকট সুস্পষ্ট করে দিলেন।

তাঁরা পদত্যাগ করায় নির্বাচন কমিশন বিনা বাধায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তৎপরতা চালাতে সক্ষম হবে। এত দিন এ উপদেষ্টাগণ তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্বে অবহেলা করে নির্বাচন বানচালে লিপ্ত জোটের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে কেয়ারটেকার সরকারকে স্থবির করে রেখেছেন।

আমি তাঁদেরকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক অনুসারী বলছি না। প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করার নেক উদ্দেশ্যেই হয়তো তাঁরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে থাকবেন। তবে আমি এ কথা অবশ্যই বলতে চাই যে, তাঁরা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগকে চেনেন না। নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তা বোধ না করা পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে শেখ হাসিনা সম্মত হবেন না। সে নিশ্চয়তা বোধ না করায়ই শেখ হিসানারা গত দেড় বছর ধরে নির্বাচন বানচালের কর্মসূচিতে তৎপর রয়েছেন। তাদের সংস্কার দাবি না মানলে তারা নির্বাচন হতেই দেবেন না বলে অগণিত বার হুমকিও দিয়েছেন।

শেখ হাসিনাকে যদি উপদেষ্টাগণ চিনতে সক্ষম হতেন, তাহলে উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় 'সাহায্য ও সহায়তা' দিতে ব্যস্ত হতেন। দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব তাদেরকে কেউ দেয়নি। এত বড় দায়িত্ব তারা কোন্ সাহসে উপযাচিত হয়ে গ্রহণ করলেন সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। দেশবাসীর নিকট কেয়ারটেকার সরকারের সম্মানিত উপদেষ্টা হিসেবে যে মর্যাদা পাওয়ার কথা তা তাঁদের ভুল সিদ্ধান্তের দরুন নস্যাৎ হয়ে গেল। তাঁরা পদত্যাগ করে ১৪ দলীয় জোটের অভিনন্দন পেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন কি না জানি

www.bjilibrary.com

না। জনগণের নিকট তাঁরা মর্যাদার অধিকারী কি না তা যথাসময়ে হয়তো উপলব্ধি করবেন। এ তৎপরতা দ্বারা তাঁরা উপদেষ্টা হিসেবে যে শপথ নিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করেছেন কি না, তা তাঁদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন। তাঁরা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন বলে কি দেশবাসী মনে করবে?

২৯৪.

শেখ হাসিনা কি নির্বাচন চান?

ইতঃপূর্বে আমি মন্তব্য করেছি, শেখ হাসিনার দাবির বহর দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি নির্বাচন বানচাল করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান, বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর থেকেই তিনি আমেরিকায় গিয়ে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলে অপপ্রচার চালিয়ে আফগানিস্তানের মতো এ দেশেও হামলা করার উদ্দেশ্যে আমেরিকাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

চারদলীয় জোট সরকার সাফল্যের সাথে পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে শেখ হাসিনার অপপ্রচারকে চরম মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে।

কেয়ারটেকার সরকার ৩০ অক্টোবর (২০০৬) দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা দিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে বেশ কয়টি অন্যায় দাবি আদায় করে নিয়েছেন। অবরোধের মতো ফ্যাসিবাদী অস্ত্র প্রয়োগ করে এত সব দাবি আদায়ের পরও তিনি নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তা না পেয়ে নতুন নতুন অবাস্তব দাবি জানাচ্ছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে হতাশ হয়েই তিনি নির্বাচন বানচাল করতে চান।

১৮ ডিসেম্বরে পল্টন ময়দানে শেখ হাসিনার ঘোষণা

সংবিধান অনুযায়ী ২০০৭ সালের ২৫ জানুয়ারির মধ্যে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করতেই হবে। নির্বাচন কমিশন ২২ জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখসহ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করার পর শেখ হাসিনা সিডিউল পরিবর্তনের দাবি জানান। নির্বাচন কমিশন ১৪ দলীয় জোটের সাথে যোগাযোগ করে নতুন সিডিউল ঘোষণা করে। চারদলীয় জোট তা মেনে নেয়। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ সমাধা করা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার দাবিতে কয়েক কিস্তি সময় বাড়িয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে আবার যাচাই করা হয়েছে। ধারণা করা হয়েছিল যে, পল্টন ময়দানে ১৮ ডিসেম্বরের মহাসমাবেশে শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেবেন। উক্ত সমাবেশে সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদ ও পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী যোগদান করে শেখ হাসিনার ১৪ দলীয় জোটকে মহাজোটে পরিণত করেন। এ দুই নেতার দল তো নির্বাচন করার জন্য আগেই প্রস্তুত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু শেখ হাসিনা পল্টন ময়দানে ঘোষণা দিলেন যে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজুদ্দীন বিএনপি জামায়াতকে ক্ষমতাসীন করার উদ্দেশেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। তাই তিনি ঘোষিত সিডিউল অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ নেবেন না। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তিনি যেসব শর্ত পূরণের দাবি জানিয়েছেন, এর মধ্যে একটি হলো ভোটারদের ছবিসহ আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করা। অন্যান্য শর্তের কথা বাদ দিলেও এ শর্তটি পূরণ করতে কমপক্ষে কত সময় লাগতে পারে, সে সম্পর্কে শেখ হাসিনার কোনো ধারণা আছে কি না জানি না। তিনি দাবি করেছেন যে, 'এ কাজটি তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে শুরু করেছিলেন; কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতায় এসে নাকি সে কাজ বন্ধ করে দেয়।' প্রকৃতপক্ষে ভোটার আইডি কার্ডের কাজ বিএনপি সরকারই শুরু করেছিল; পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে এ কাজ স্থগিত করে দেয়।

পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করলেও এ কাজটি সমাধা করতে কমপক্ষে ৬ মাস সময় প্রয়োজন। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা ঐ কাজটি করার দায়িত্ব কোন্ সরকারের হাতে সম্পন্ন করাতে চান? কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি করার কোনো উপায় আছে কি?

সংবিধান সংশোধনের দাবি

শেখ হাসিনার উপরিউক্ত দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনের দাবিও জানালেন। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সংবিধান সংশোধনের বিধান সংবিধানেই রয়েছে। সংসদ বহাল থাকলে সংবিধান অনুযায়ী সংশোধন করা সম্ভব হতো। অষ্টম সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নবম সংসদ কায়েম হওয়ার পূর্বে সংবিধান সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই।

তিনি এ কথাও বলেছেন যে, সংবিধান কুরআন নয় যে তা বদলানো যাবে না। যাক তিনি তো এ কথা স্বীকার করলেন যে, কুরআন বদলানো যায় না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হয়ে তো তিনি বাস্তবে কুরআনের বিধানকে অস্বীকার করেই বসেছেন।

তিনি আরো বলেছেন যে, জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যই সংবিধান প্রয়োজন। তাই অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

কিন্তু এ সময় সংবিধান কেমন করে সংশোধন করা যাবে, সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলছেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশ নিতে সম্মত নন।

নির্বাচনে অংশ নেওয়া বা না নেওয়ার ইখতিয়ার অবশ্য তার আছে। তাকে জোর করে কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে বলবে না। কিন্তু তিনি কোন্ ইখতিয়ারে এ হুমকি দিলেন যে, ঘোষিত সিডিউল অনুযায়ী তিনি নির্বাচন হতেই দেবেন না? তিনি যে দাপট দেখাচ্ছেন এর কি কোনো বৈধতা থাকতে পারে? তিনি কি মনে করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ তার হুকুমের গোলাম?

www.bjilibrary.com

নির্বাচন হতেই হবে

সংবিধান অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি নির্বাচন হতেই হবে। কেয়ারটেকার সরকার ঐ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। শেখ হাসিনার হুমকি নস্যাৎ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর খিদমত নিতেই হবে। সেনাবাহিনীকে ময়দানে অবতীর্ণ করার ফলে শেখ হাসিনা পঞ্চম বারের মতো আর অবরোধ করতে পারলেন না। এর পূর্বে চার বার অবরোধ করে মোট ১৩ দিন গোটা দেশকে অচল করে হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতি করেছেন।

শেখ হাসিনা মনে করেন যে, তিনি যা বলেন তা-ই জনগণের দাবি। তাই তিনি নির্বাচন হতে দিতে না চাইলে জনগণ অত্যন্ত খুশি হয়ে নির্বাচন বর্জন করবে। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না যে, জনগণ নির্বাচনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর তাদের হাতে নতুন সরকার কায়েমের ক্ষমতা ফিরে এসেছে। তারা স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য উদগ্রীব হওয়ারই কথা।

শেখ হাসিনা যথাসময়ে নির্বাচন হওয়ার পথে যত প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতে চান, জনগণ কিছুতেই তাকে সমর্থন করবে না। জনগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। জনগণ যাতে অবাধে ভোট দিতে পারে, সে উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা প্রয়োজন বোধ করলে অবশ্যই করবেন।

শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতিকে হুঁশিয়ার করে বলেছেন, যেন সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে ব্যবহার না করেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, রাষ্ট্রপতি জনগণের পক্ষে এবং শেখ হাসিনার অবরোধ ঠেকানোর প্রয়োজনেই সেনাবাহিনীকে ময়দানে এনেছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ও সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষে এবং শেখ হাসিনার হিংস্রতার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হবে।

শেখ হাসিনার হরতাল

১৮ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন যে, নির্বাচন প্রার্থীদের দরখাস্ত রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ ডিসেম্বর সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করবেন। প্রার্থীরা আগে থেকেই মনোনয়নপত্র দাখিল করে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। দরখাস্ত জমা দিতে যারা বাধা সৃষ্টি করবে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সরকার অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে। শেখ হাসিনার এ হরতালে প্রমাণ হবে যে, জনগণ তার পক্ষে নেই, তারা নির্বাচনের পক্ষে।

মনে হয়, শেখ হাসিনা এ নির্বাচনকে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মতো এক দলীয় নির্বাচন মনে করেই মন্তব্য করেছেন যে, বিএনপি-জামায়াত একঘরে হয়ে পড়েছে এবং সকল দল তার মহাজোটে শরীক হয়ে গেছে। ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী তো নির্বাচনে নমিনেশনের টোপ ফেলেই অনেককে দলে ভিড়িয়েছেন। এরশাদ নির্বাচন না

www.bjilibrary.com

করলে তো দলই ভেঙে যাবে। তারা যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হলেও নির্বাচন বর্জনে সম্মত নাও হতে পারেন।

১৪ দলের সমন্বয়ক ঘোষণা করেছেন যে, যারা মনোনয়নপত্র জমা দেবেন তারা গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হবেন। তিনি হুমকি দেন যে, নীলনকশার নির্বাচন প্রতিহত করা হবে। দেশবাসী তাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন মনে করে কি না, তা এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই প্রমাণিত। জনগণ তাদের বাকশালী ইতিহাস ও সন্ত্রাসী চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। এ পর্যন্ত জনগণ তাদের আন্দোলনে সাড়া দেয়নি। নির্বাচনের বেলায় তো তাদের পক্ষে সাড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

গৃহযুদ্ধের হুমকি

১৪ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল নির্বাচনপ্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে না দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি সুস্পষ্টভাবেই হুমকি দিলেন যে, নির্বাচনপ্রক্রিয়া জারি রাখা হলে তারা তা প্রতিহত করার জন্য গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা গত ২৮ অক্টোবর গৃহযুদ্ধেরই মহড়া দিয়েছেন।

শান্তিপ্রিয় ও নির্বাচনমুখী জনগণের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়ে তারা এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ ও জনগণের জন্য যেকোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও তারা প্রস্তুত। তাদের এ হিংস্র প্রবৃত্তি দমন করে জনগণকে গৃহযুদ্ধের মতো মহাবিপদ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করা হলে তা কি জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার বলে গণ্য হতে পারে?

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতিসংঘের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বের বহু দেশে গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে। কোনো কোনো দেশে গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে দিয়ে জনগণকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। তারা নিশ্চয়ই গৃহযুদ্ধের এ হুমকি শুনে আরো সচেতন হবেন।

গত ১০ ডিসেম্বর ১৪ দল বঙ্গভবনের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করে সরকারকে অবরুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল। ৯ তারিখ দিবাগত রাতেই সেনাবাহিনী ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করায় তাদের ঐ হিংস্র কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। এটাও কি জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার বলা হবে?

১৫ জুলাই (২০০৫) থেকে সংস্কার আন্দোলনের নামে ১৪ দলীয় জোট যে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন চালিয়ে এসেছে, বিশেষ করে চারদলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষে তাদের যে নির্বাচনবিরোধী ভূমিকা তা দেশবাসীর সাথে সেনাবাহিনীও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে।

শেখ হাসিনার অন্তহীন দাবি

পল্টন ময়দানে তিনি দাবি করেছেন যে, ড. ইয়াজুদ্দীনকে প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনকে নতুন করে গঠন করতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী

www.bjilibrary.com

যার প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা, ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা-লাঠি নিয়ে অবরোধ করে তিনি তা হতে দিলেন না বলেই শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রপতিকেই এ দায়িত্ব নিতে হয়। এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য শেখ হাসিনাই দায়ী।

আরেকটি অবরোধের অস্ত্র প্রয়োগ করে শেখ হাসিনা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে সক্ষম হন। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় যিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তাকে শেখ হাসিনাই নিয়োগ দিয়েছিলেন। চারদলীয় জোট ঐ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় শেখ হাসিনা পাইকারিভাবে ঐ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও তারই নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনকে অশালীন ভাষায় নির্বাচনে কারচুপি করে তাকে পরাজিত করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন।

প্রমাণিত হলো যে, প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে কারচুপি করেন না। করলে শেখ হাসিনাকেই বিজয়ী করার ব্যবস্থা করতেন।

বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম এ আজিজকে ছুটিতে যেতে বাধ্য করাই শেখ হাসিনা যথেষ্ট মনে করছেন না, তার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করতে তিনি রাষ্ট্রপতিকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিলেন। তার ভাব-সাব দেখে মনে হয়, তিনিই দেশের মালিক-মোক্তার। তার হুকুমমতোই সবাইকে চলতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গত নির্বাচনে তাকে জনগণ ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করে ধরাশায়ী করে দিয়েছে। নির্লজ্জের মতো তিনি দাপট দেখাচ্ছেন। এসব কি জনগণ ও সেনাবাহিনী দেখছে না?

হাসিনার মহাজোটে এরশাদ

২০ ডিসেম্বর ২০০৬-এর দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় 'জোট গঠন নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এরশাদ ও হাসিনা যা বলেছিলেন' শিরোনামে উভয়ের চমকপ্রদ উক্তিগুলোকে সংকলিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐসব উক্তিকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নে তা উদ্ধৃত করছি :

১. এরশাদের চারদলীয় জোটে যোগদান করার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'চোর ও ভোট জালিয়াতরা এক হচ্ছে, ওদের রুখতে হবে।'

২. 'চোর চোরকে ভালো চেনে। সব চোর একদিকে যাচ্ছে। আর অন্য দিকে যারা রয়েছে তারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক'– শেখ হাসিনা।

৩. শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে এরশাদ, 'আমি চোর নই, গণভবন নিজের নামে লিখে নিইনি।'

৪. সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এরশাদ, 'নীতিগত ও আদর্শগতভাবে আমাদের নিকটতম দল বিএনপি।'

৫. শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন, 'এরশাদ বলেছেন, বিএনপির সঙ্গে তাদের আদর্শের মিল রয়েছে। এ কথা ঠিক। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জন্ম একইভাবে হয়েছে।

www.bjilibrary.com

তাদের দুই দলের নামও প্রায় এক। দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে দুর্নীতিবাজদেরই ঐক্য হয়েছে।'

৬. চারদলীয় জোটে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে এরশাদ বলেন, 'বিগত নির্বাচনে চারদলীয় জোট থেকে বেরিয়ে আসাটা আমার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল। তখন আমাদের সামনে বিরাট মনস্তাত্ত্বিক চাপ ছিল। সে কারণে ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের অনেক ভুল হয়। কিন্তু সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর ঘটাতে চাই না।'

৭. 'আমার সমর্থনে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল। অথচ তারাই আমার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, আমার দল ভেঙেছে।' –এরশাদ।

৮. একটি জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকারে এরশাদ বলেন, 'ক্ষমতার অংশীদারিত্ব না পেলে জাতীয় পার্টি বাঁচবে না। এ জন্যই চারদলীয় জোটে যাচ্ছি। ক্ষমতার অংশীদার হলে জাতীয় পার্টির অফিসে বাতি জ্বলবে। অন্যথায় মৃত্যুর পর আমার কবরও কেউ যিয়ারত করবে না।'

৯. এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নূর হোসেন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এ সম্পর্কে এরশাদ মন্তব্য করেন, 'আমি নূর হোসেনকে হত্যা করিনি। নূর হোসেন লাশের রাজনীতির শিকার হয়েছেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগনেত্রী একটি লাশ চেয়েছিলেন। সেই লাশের রাজনীতির শিকার হয়ে নূর হোসেন মৃত্যুবরণ করেছিলেন।'

১০. এরশাদকে চারদলীয় জোটে আনার উদ্দেশে বেগম জিয়ার ছেলে তারেক রহমান এরশাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'বিকৃত মানসিকতা ও ক্ষমতার লোভ আছে বলেই খালেদা জিয়া তার স্বামীর হত্যাকারী এরশাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি নিয়েছেন। আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এরশাদের মান ভাঙাতে ছেলেকে এরশাদের কাছে পাঠিয়েছেন।'

১১. শেখ হাসিনার সমালোচনা করে এরশাদ বলেন, 'ওনার মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলেন। অনেক সময় রিকশাওয়ালাদের ভাষায় কথা বলেন তিনি।'

১২. আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে এক সময় এরশাদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকে ঘিরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে হাইকোর্টের জজদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করা হয়েছে। আর এবার তারা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসের দরজায় লাথি মেরেছে– এটা কোনো সভ্য দেশের ইতিহাসে নেই।'

১৩. এরশাদ বলেন, 'আওয়ামী লীগ ভাবছে জাতীয় পার্টি যদি বিএনপি'র সঙ্গে জোটবদ্ধ নির্বাচন করে তাহলে তারা ৪০টির বেশি আসন পাবে না। এ ৪০ আসন নিয়ে তারা সংসদে যেতে চাইবে না। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না গেলে জাপা ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে।'

www.bjilibrary.com

১৪. আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপ চলাকালে এরশাদ বলেন, 'জাতীয় পার্টির চারদলীয় জোটে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এখনো জোটে যোগদান করিনি। সংলাপের ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেব। ফল শুভ হলে চারদলীয় জোটে যাব। আর অশুভ হলে এককভাবে ৩০০ আসনে নির্বাচন করব।'

১৫. এরশাদকে নিম্ন-আদালতে দেওয়া দুর্নীতি মামলার শাস্তি হাইকোর্ট বহাল রাখায় শেখ হাসিনার মন্তব্য : 'আগে এরশাদ চার দলে যেতে চেয়েছিলেন। তখন তার দুর্নীতির মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিল। আর এরশাদ যখন বললেন যে, তিনি চার দলে যাবেন না, তখন তার মামলা আদালতে তুলে পুরো শুনানি হলো না, রায় ঘোষণা করা হলো। তাকে দুই বছরের জেল দেওয়া হলো। তার মানে কোর্ট-কাচারি রিমোট কন্ট্রোলে চলছে।'

এসব উদ্ধৃতি থেকে বাংলাদেশের দুজন রাজনৈতিক নেতার মান সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা বড়ই দুঃখজনক। এ জাতীয় নেতৃত্ব দলীয় লোকদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, রাজনীতিতে নীতি ও আদর্শের কোনো মূল্য নেই। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যখন যা প্রয়োজন তা-ই বলতে হয়। এতে যত হাস্যকর স্ববিরোধিতার প্রমাণই পাওয়া যাক সে জন্য লজ্জাবোধ করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের মান উন্নত না হলে সুস্থ ও উন্নত মানের রাজনীতি কেমন করে আশা করা যায়? অনেক বুদ্ধিজীবী ও সুশীল ব্যক্তি রাজনৈতিক নেতাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে থাকেন। তারা সুন্দর ও মার্জিত কথা বলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে নসিহত করেন। কিন্তু তারা সরাসরি রাজনৈতিক অনিশ্চিত ময়দানে অবতীর্ণ হন না। রাজনীতির ময়দান থেকে বাইরে অবস্থান করে রাজনীতিকে সুস্থ করা সম্ভব নয়। জ্ঞানী, মার্জিত, পরিশীলিত, দেশপ্রেমিক ও জনদরদি লোক রাজনৈতিক দলে যোগদান না করলে এ দেশে মানসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে না।

যারা শুধু ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করেন, তারা জনসেবা করার যোগ্য হতে পারেন না। তারা ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়োজনে জনগণকে যাতনা দেওয়ারই যোগ্য। এ জাতীয় নেতাদের কাছ থেকে দেশ গড়ার আশা করাই বৃথা।

ইসলামী ঐক্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ইন্তিকাল

২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর '০৬ ফুরফুরা শরীফের গদ্দিনশীন পীর মুহতারাম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মদ আবদুল কাহহার সিদ্দিকী সাহেবের ইন্তিকালের খবর জেনে হতবাক হয়ে গেলাম। দুমাস আগে উত্তরবঙ্গে সফরকালে ব্রেইন স্ট্রোকে তিনি শয্যাগত হন। কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহর রহমতে ধীরে ধীরে এ অবস্থার উন্নতি হয়। টেলিফোনে তাঁর সাথে কথা বলে আশ্বস্ত হলাম যে, উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি বক্তব্য রেখেছেন জেনে আরো আশান্বিত হলাম।

www.bjilibrary.com

ইতোমধ্যে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো খবরও শুনিনি। হঠাৎ ইন্তিকালের খবরে মর্মাহত হলাম। মৃত্যু অনিবার্য, মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত; কিন্তু তাঁর তিরোধানে বাংলাদেশের যে বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল তা অপূরণীয়।

তিনি দীনের দুরকম বড় বড় খিদমত করে আমার অন্তরে গভীর মহব্বতের পাত্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর অসুস্থতার খবর শোনার সময় থেকেই তাঁর জন্য দোআ করছিলাম ও মাঝেমধ্যে খবর নিচ্ছিলাম। ক্রমে উন্নতি হচ্ছে জেনে আনন্দবোধ করছিলাম।

বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁর বিরাট অবদান রয়েছে। 'বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টার ইতিহাস' বইটিতে আমি তাঁর এ অবদান সম্পর্কে লিখেছি। বিশ বছর এ ব্যাপারে চেষ্টা করে আমি হতাশ হয়ে ক্ষান্ত হয়েছি। ১৯৯৭ সাল থেকে তাঁর উদ্যোগে আবার প্রচেষ্টা চলে এবং মিরপুরস্থ ফুরফুরার দরবার শরীফে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মেলনেই ১৯৯৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাইতুল মুকাররমের মুহতারাম খতীব মাওলানা উবায়দুল হক সাহেবকে চেয়ারম্যান এবং মুফতি মাওলানা সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদীকে সেক্রেটারি জেনারেল করে 'জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল' নামে ইসলামী ঐক্যের একটি জাতীয় সংগঠন কায়েম করা হয়। ঐ দরবার শরীফেই প্রতি বছর ডিসেম্বরে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের বার্ষিক অধিবেশন হয়। বাংলাদেশে এটাই একমাত্র ইসলামী ঐক্যমঞ্চ। মরহুম পীর সাহেব ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

দীনের দ্বিতীয় বড় যে খিদমত তিনি করে গেছেন তা হলো সকল প্রকার শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ জিহাদ। আমাদের দেশে যত রকম শিরক ও বিদআত চালু রয়েছে তা একশ্রেণীর স্বার্থবাদীরা তরীকতের নামে চালু রেখেছেন। পীর-মুরীদীর পরিভাষা ব্যবহার করেই তারা শিরক ও বিদআতে জনগণকে লিপ্ত করে থাকেন। এ সবের বিরুদ্ধে মরহুম পীর সাহেবের ভূমিকা খুবই ফলপ্রসূ বলে মনে করি।

বাংলাদেশ তাঁর এ দুদফা খিদমত থেকে মাহরূম হয়ে গেল। আমি আশা করি তাঁর অবর্তমানেও দীনের এ দুদফা খিদমত জারি থাকবে।

আল্লাহর মহান দরবারে কাতরভাবে দোআ করছি, যেন তাঁর এ মহান বান্দাহর খিদমত কবুল করে তাঁকে আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তার উত্তরসূরিগণকে যেন এ খিদমত অব্যাহত রাখার তাওফীক দান করেন।

www.bjilibrary.com

২৯৫.

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট

বর্তমানে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট যে অদ্ভুত রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। চারদলীয় জোট সরকারের সময় কতক অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে সংলাপের সুযোগ পেয়েও তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। কেয়ারটেকার সরকারের মতো অত্যন্ত দুর্বল সরকারের উপর পেশিশক্তি প্রয়োগ করে অনেক অন্যায় দাবি আদায় করা সত্ত্বেও তাদের দাবির বহর বাড়তেই থাকে।

কেয়ারটেকার সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও সহায়তা করা। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করার মতো কঠিন বোঝা সংবিধানে তাদের উপর চাপানো হয়নি। ৩০ অক্টোবর (২০০৬) কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই কেয়ারটেকার সরকার শেখ হাসিনার দাবি পূরণেই ব্যস্ত রয়েছে।

কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন। আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে সম্মত করার জন্যই ৫৫ দিন অপচয় হয়ে গেল। নির্বাচন কমিশন কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য ও সহায়তা পায়নি। তবুও নির্বাচন কমিশন ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ২২ জানুয়ারি (২০০৭) নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার সীমা রক্ষা করা যাবে না।

অনেক দাবি আদায় করে নেওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ১৪ দলীয় জোট ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেসব দাবি তারা আদায় করতে সক্ষম হলেন এর জন্য ৫৫ দিন কঠোর সংগ্রাম করলেন। এর দ্বারা তারা বিজয়ের কতটুকু নিশ্চয়তাবোধ করেছেন তা বোঝার সামর্থ্য আমার নেই। তবে তাদের সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট আপতত কেটে যাওয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতার অবসান হলো।

অতীতের রাজনৈতিক সংকট

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব একদলীয় বাকশাল সরকার কায়েমের মাধ্যমে গণতন্ত্র হত্যা করে বাংলাদেশে প্রথম রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেন। '৭৫-এর আগস্ট ও নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে ঐ সংকট কাটিয়ে ওঠার সূচনা হয়। ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সামরিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বার গণতন্ত্র হত্যা করে স্বৈরশাসন কায়েম করেন। বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর দীর্ঘ যুগপৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুনর্বহাল হয়।

জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফর্মুলা বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমর্থন করায় ১৯৯১ সালে ঐ ফর্মুলা অনুযায়ী নির্বাচন

www.bjilibrary.com

অনুষ্ঠিত হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বহাল হয়। নির্বাচনের পর জামায়াতে ইসলামীর নিঃস্বার্থ সমর্থনে বিএনপি সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়।

বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় আবার রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী দুই বছর আন্দোলন করে ১৯৯৬ সালে বিএনপিকে ঐ বিষয়ক আইন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করে।

২০০৫ সালের জুলাই থেকে শেখ হাসিনা সংস্কার আন্দোলনের নামে নতুন করে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করলেন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার দুঃশাসন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিদেশে তার বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার ফলে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তিনি এমন কোনো ভূমিকা পালন করেননি, যাতে জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারে। সারা বছরই তারা সংসদ বর্জন করেছেন। সংসদে একটানা ৯০ দিন অনুপস্থিত না থাকলে সদস্যপদ শূন্য হয়ে যায় বলে তিনি ও তার দলীয় সদস্যগণ সদস্যপদ টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে সংসদে বসেছেন, যাতে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা যায়। বিরোধী দল হিসেবে সংসদে জনগণের স্বার্থে যে ভূমিকা পালন করা কর্তব্য, এর কোনো কিছুই তারা করেননি।

বিগত পাঁচ বছরে শেখ হাসিনার ভূমিকা

২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক কোনো দায়িত্ব পালন করেননি। বিগত পাঁচ বছর তিনি যা করেছেন তা নিম্নে বর্ণনা করছি :

১. তারই নিযুক্ত নির্বাচন কমিশন, তার দল কর্তৃক নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশি ও বিদেশি সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষক ঐ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো ছোট-বড় রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেনি। এমনকি নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় স্বয়ং শেখ হাসিনা নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে বলে গণমাধ্যমের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ২ অক্টোবর ২০০১-এর সংবাদপত্র এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

   নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর শেখ হাসিনা স্থূল কারচুপির অভিযোগ করে অত্যন্ত অশালীন ভাষায় রাষ্ট্রপ্রধান, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশনপ্রধান, পুলিশপ্রধান ও সেনাপ্রধানকে পক্ষপাতিত্বের দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করেন।

২. জনগণ জাতীয় সংসদের দু-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক আসনে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। অথচ জনগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্টকে এ নির্বাচন বাতিল করে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করেন। প্রেসিডেন্ট এমন আজব প্রস্তাব কেমন করে গ্রহণ করতে পারেন?

www.bjilibrary.com

৩. নির্বাচনে জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর তাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার হিম্মত না করে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতে গিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন সব জঘন্য মিথ্যা প্রচার করতে লাগলেন, যা দেশের ভাবমর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। যার মধ্যে দেশপ্রেমের লেশমাত্র নেই সে-ই এমন কাজ করতে পারে। ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি সম্পূর্ণ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার প্রমাণই দিলেন।

৪. জনগণের ভোটে চারদলীয় জোট সংসদে দু-তৃতীয়াংশের অধিক আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করল। শেখ হাসিনা কোন্ অধিকারে এ সরকারকে পদত্যাগ করার দাবি জানালেন? সংবিধান অনুযায়ী এ সরকারের মেয়াদ পাঁচ বছর। এ সরকারের পদত্যাগ দাবি করা জনগণের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক।

৫. জোট সরকার পদত্যাগ না করায় ২০০৪ সাল থেকে শেখ হাসিনা সরকার পতনের ব্যর্থ আন্দোলন করে তিনটি বছর একটানা অপচেষ্টা চালালেন। তিনি বারবার গণ-অভ্যুত্থানের হুমকি দিলেন। জনগণ সামান্য সাড়াও দেয়নি। জনগণ এটাকে ধৃষ্টতা হিসেবেই বিবেচনা করেছে।

এসব নিষ্ফল অপকর্মে দীর্ঘ পাঁচটি বছর অপচয় না করে যদি তারা সংসদে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করতেন এবং নেতিবাচক রাজনীতির বদলে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক কর্মসূচি পালন করতেন, তাহলে হয়তো জনগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক হতো।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের প্রত্যক্ষ ও রাশিয়ার পরোক্ষ সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও রাশিয়ার সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা হয়। অথচ এ দুটো ইসলামবিরোধী মতবাদের কোনো ভিত্তিই এ দেশে নেই।

কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা রাজনৈতিক খেল-তামাশার বিষয় নয়। যদি জনগণের মধ্যে এ দুটো মতাদর্শের সামান্য প্রভাবও থাকত তাহলে ১৯৭৭ সালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে রেফারেন্ডাম করে এ দুটো মতবাদকে উৎখাত করা এত সহজ হতো না।

শেখ হাসিনা ও আওয়ামী বলয়ের যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী, তারা এ দেশের নিকট-অতীতের ইতিহাসটুকুর খবরও কি রাখেন না? নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সমাজতন্ত্র তার পিতৃভূমি রাশিয়াতেই আত্মহত্যা করে। এরপর আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র থেকেও এ মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই এখন তাদের আদর্শ হিসেবে একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই অবশিষ্ট রয়েছে। এ কুফরী মতবাদটিই রাজনৈতিক অস্থিরতার ভিত্তি।

www.bjilibrary.com

এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুপ্রবেশ

এ দেশের ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অবস্থান কোথায়, তা নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে। ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকার তাদের ঔপনিবেশিক শাসন ত্যাগ করার ঘোষণা দিলে স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপ কী হবে, সে বিষয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়।

মি. গান্ধী ও মি. নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ঘোষণা করল যে, গোটা ভারতবর্ষ একটি অবিভক্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। ঐ সময় ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যা ৪০ ছিল কোটি। কংগ্রেস দাবি করল যে, হিন্দু-মুসলিম সকল ভারতবাসী ৪০ কোটি মানুষ এক জাতি এবং এ জাতির আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। তারা আরো দাবি করল যে, ভারতবর্ষের সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র কংগ্রেস দল। ৪০ কোটির মধ্যে ১০ কোটি ছিল মুসলমান। মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে দাবি করে যে, মুসলমানগণ একটি আলাদা জাতি এবং একমাত্র মুসলিম লীগই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, কংগ্রেস মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না।

উক্ত সম্মেলনে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গদেশের প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সম্মেলনে ভারতকে বিভক্ত করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে নিয়ে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

গোটা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক লড়াই চলে। একদিকে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ অখণ্ড ভারত আন্দোলন, অপরপক্ষে মুসলিম লীগের ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাই করে। ভারত বিভাগের পক্ষে শতকরা ৯৭ জন মুসলমান ভোট দেয়। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান নামক নতুন মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করে। বর্তমান বাংলাদেশ ঐ পাকিস্তান রাষ্ট্রেরই অংশ ছিল। প্রমাণিত হলো যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতি আন্দোলন ও নির্বাচন করে বাংলাদেশকে ভারত থেকে আলাদা করে নেয়।

পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলাদেশের বড় নেতা ছিলেন হোসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিব ঐ আন্দোলনে সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ যুবনেতা ছিলেন। ঐ আন্দোলনে আসাম প্রদেশের প্রধান নেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী। ইতিহাসের ট্রাজেডি হলো, এ তিন নেতাই ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনে দলের নাম 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দলের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেন।

তখন থেকেই এ দেশে পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের বিরোধ শুরু হয়। আইয়ুব খান ও ইয়াহ্ইয়া খানদের শাসন ইসলাম ও গণতন্ত্রবিরোধী হওয়ায় আওয়ামী লীগ রাজনীতিতে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। ১৯৭০ সালের

www.bjilibrary.com

নির্বাচনে এ দেশের জনগণ পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়। জনগণ শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিল। জনগণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে ভোট দেয়নি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নির্বাচনী ইস্যুও ছিল না।

মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নেশায় সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে আঁতাত করে পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার উদ্দেশ্যে এ দেশের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দেন।

ভারত বাংলাদেশে তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কায়েম ও এ দেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার উদ্দেশে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে সাহায্য করে।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পর বাংলাদেশের রাজনীতি

১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণভোটের মাধ্যমে পঞ্চম সংশোধনী পাস করে ১৯৭২ সালের সংবিধানে চারটি মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন :

১. সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযোজন করা হয়। এরপূর্বে সংবিধানের কোথাও আল্লাহর নামই ছিল না।

২. 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শিরোনামে সংবিধানের ৮(১) উপধারায় 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' কথাটি বাদ দিয়ে এর বদলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটি সংযোজন করা হয়।

৩. সংবিধানের একটি ধারায় লেখা ছিল যে, 'ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাইবে না।' পঞ্চম সংশোধনীতে এ ধারাটি বিলুপ্ত করা হয়।

৪. শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশাল-বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (BAKSAL) নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলকে বৈধতা দান করেন। এতে আর কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা বেআইনি বলে উল্লেখ করা হয়। পঞ্চম সংশোধনীতে এ ধারাটিও বিলুপ্ত হয়।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে উপরিউক্ত পরিবর্তনের ফলে আগের সকল রাজনৈতিক দলই নতুন করে গঠন করা সম্ভব হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগও ঐ সংশোধনীরই ফসল। সব দলের মতো ইসলামী দলগুলোও পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি সংবিধানবিরোধী

আওয়ামী লীগ দাপটের সাথে দাবি করে যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই তাদের দলীয় আদর্শ। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের সময় নিম্নের বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন :

'আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব।'

www.bjilibrary.com

কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যখন একসময় ঘোষণা করলেন যে, তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী তখন তিনি সাংবিধানিক শপথ ভঙ্গ করলেন এবং সংবিধানবিরোধী কথা উচ্চারণ করলেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদভিত্তিক হওয়ায় তাদের গোটা রাজনীতিই সংবিধানবিরোধী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল হিসেবেই বাংলাদেশে রাজনীতি করতে হলে তাদেরকে সংবিধান সংশোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে। সংবিধান সংশোধন করে আবার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অংশ হিসেবে সংবিধানে সংযোজন না করা পর্যন্ত তাদের দলীয় আদর্শ সংবিধানবিরোধী হিসেবেই গণ্য হতে থাকবে।

বাংলাদেশে আদর্শিক দ্বন্দ্ব

বাংলাদেশের রাজনীতিসচেতন মহলে আদর্শিক দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট।

একটি আদর্শ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ ও প্রতিবেশী দেশের আধিপত্যবিরোধী চেতনা। অপরটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ভারতের আধিপত্যকামী চেতনা।

প্রথম আদর্শের ধারক ও বাহক বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। বিপরীত আদর্শের পতাকাবাহী আওয়ামী লীগ।

বৃহত্তর জনসাধারণ এ আদর্শিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন না হলেও তারা ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। প্রায় চার দিক দিয়েই বাংলাদেশ ভারত দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। ভারত সরকারের আচরণ কোনো সময়ই প্রতিবেশীসুলভ নয়। গোটা বাংলাদেশের সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে সারা বছরই বাংলাদেশিরা প্রাণ হারায়।

সশস্ত্র বাহিনী তো প্রতিরক্ষার জযবা নিয়েই গড়ে ওঠে। তারা জানে যে, বাংলাদেশে বিদেশ থেকে হামলা হলে একমাত্র ভারত থেকেই হতে পারে। তাই ভারতীয় আগ্রাসন থেকে প্রতিরক্ষার মনোভাব তাদের মধ্যে প্রবল থাকাই স্বাভাবিক।

সাধারণ জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে উপরিউক্ত আদর্শিক দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। অবশিষ্ট সকল মহলেই এ দ্বন্দ্ব সংক্রমিত। প্রায় সকল পেশাজীবীদের মধ্যেই বিভাজন দেখা যায়। এর আসল কারণই হলো আদর্শিক দ্বন্দ্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী ইত্যাদি পেশাজীবীগণ ঐ দুটো আদর্শের ভিত্তিতেই বিভক্ত। আদর্শের কারণেই তাদের সংগঠনও ভিন্ন।

পেশাজীবীদের সবাই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও সংগঠনের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় ঐ আদর্শের ভিত্তিতেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

কলেজ শিক্ষক সমিতি, স্কুল শিক্ষক সমিতি, জেলা আইনজীবী সমিতি ইত্যাদিতেও আদর্শিক পার্থক্য স্পষ্ট।

www.bjilibrary.com

ব্যবসায়ী সমিতি, ব্যাংক কর্মচারী, বেসরকারি চাকরিজীবী, পুলিশ বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীমহল সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিভক্ত না হলেও জাতীয় নির্বাচনে সকলেই ভোট দেওয়ার সময় নিশ্চয়ই ঐ দুই আদর্শের কোনো এক পক্ষেই ভোট দেন। অবশ্য তারা সাংগঠনিকভাবে প্রকাশ্যে বিভক্ত নন বলে কোন্ আদর্শের সমর্থক শতকরা কত জন, তা হিসাব করা সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমেই জানা যায় যে, আদর্শিক বিভাজনের দিক দিয়ে জনগণের শতকরা কত জন কোন্ আদর্শের সমর্থক।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

আদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও যদি উভয় পক্ষ গণতান্ত্রিক নীতিমালা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে, তাহলে নির্বাচনের মাধ্যমে এক সময় জনগণ ফায়সালা করে দেবে যে, কোন্ আদর্শ এ দেশে বিজয়ী বলে গণ্য হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক নীতিমালার পরওয়া করে না। তারা পেশিশক্তি প্রয়োগ করেই তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে তাদের রাজনৈতিক আচরণ এতটা অগণতান্ত্রিক যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে অনিশ্চিত বলে মনে হয়। তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নেওয়ার যে উদহারণ স্থাপন করেছেন, তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস যদি জনগণ হয়, তাহলে আওয়ামী লীগকে তাদের রাজনৈতিক মতামতকে নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করতে হবে এবং জনগণের দেওয়া সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। অবশ্য পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ের উদ্দেশ্যে আবার তারা তাদের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পারেন।

তাদেরকে এ মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে, যা গত পাঁচ বছরে তারা প্রদর্শন করেছেন। 'আন্দোলন করে সরকারকে অমুক দাবি মানতে বাধ্য করব, গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করব, আমাদের এসব দাবি না মানলে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে দেব না'— এ জাতীয় মনোবৃত্তি গণতন্ত্রের সুস্পষ্ট বিরোধী।

সংবিধান অনুযায়ী কোনো দল মেয়াদের পর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে সক্ষম নয়। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে দলকে ক্ষমতায় বসাতে চায়, তারাই পরবর্তী মেয়াদ পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে। আওয়ামী লীগ যদি গত পাঁচ বছরের মতো গণবিরোধী ভূমিকা পালন করা থেকে বিরত না হয় তাহলে জনগণই তাদেরকে রাজনীতি থেকে উৎখাত করবে। জনগণের মধ্যে গত ১৫ বছরে যথেষ্ট সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে আর সহজে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়।

গত তিনটি নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশের গণতন্ত্র এতটা মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সরকারের আমলে তো জোর করে কিছুই আদায় করতে পারেনি; কেয়ারটেকার সরকারের মতো দুর্বল সরকারের আমলেও নির্বাচনে বিজয়ের নিশ্চয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য তারা অবরোধ করে এমন কিছু দাবি পূরণ করে নিয়েছেন, যা নির্বাচনে সামান্য সুফলও বয়ে আনবে না।

www.bjilibrary.com

২৯৬.

কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির উপযোগিতা

বাংলাদেশে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে দলীয় সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা সবারই রয়েছে। এ কারণেই ১৯৯০ সালে প্রধান প্রধান দলগুলো নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে একমত হয়। সংবিধানে এ ব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও সকলের সম্মতির ফলে ১৯৯১ সালে এ দেশে সর্বপ্রথম একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ পদ্ধতিটি ১৯৯৬ সালে সংবিধানে সংযোজিত হয়। এরপর এ পদ্ধতিতেই ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের আর কোথাও এ পদ্ধতি চালু না থাকা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফল হওয়ায় এ পদ্ধতিটি সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশে এসে মন্তব্য করেছেন, যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য বিশ্বের অনেক দেশে এ পদ্ধতিটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। নির্বাচনের পর তিনি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরিচালনায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা সকল রাজনৈতিক দল বর্জন করায় ঐ নির্বাচন গ্রহযোগ্যতা পায়নি বলে ঐ বছরই জুন মাসে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ নির্বাচনে শেখ হাসিনা বিজয়ী হন।

আমার ধারণা যে, বাংলাদেশের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির বিরোধী নয়। দু-একটি দল বিরোধী বলে মত প্রকাশ করলেও দলীয় সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাইবে না। অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগ প্রধান বিচারপতি কে এম হাসানের পরিচালনায় নির্বাচন করতে সম্মত হলো না। কারণ, তিনি ২৫ বছর পূর্বে বিএনপি করতেন। এমতাবস্থায় বিএনপি সরকারের পরিচালনায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এ দেশে ভবিষ্যতে কোন্ পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে? এতে প্রমাণিত হয় যে, নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিই উপযোগী। এ পর্যন্ত কোনো বিকল্প প্রস্তাব কেউ উত্থাপন করেননি। এ পদ্ধতি বাতিল করার দাবিও কেউ করেননি।

এ পদ্ধতির সংস্কার

শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির সংস্কার দাবি করে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সকল রাজনৈতিক দলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। অনেকেই এ প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছেন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবে কর্মরত প্রধান বিচারপতিকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান করার কথা ছিল। সে প্রস্তাব অনুযায়ীই ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান

www.bjilibrary.com

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর তিনি স্বীয় পদে ফিরে যান। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেলায় এ সন্দেহ করার অবকাশ থাকে যে, নির্বাচনে তিনি কোনো দলের পক্ষে ভূমিকা পালন করে নির্বাচনের পর বিজয়ী দলের নিকট থেকে কোনো সুবিধা গ্রহণ করবেন; কিন্তু কর্মরত ব্যক্তির এ ধরনের কোনো সুযোগ থাকার কথা নয়।

আগামী সংসদ নির্বাচনের পর সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী দলসমূহ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলে পরবর্তী নির্বাচনের যথেষ্ট পূর্বেই সংবিধানে এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী গ্রহণ করা যাবে।

১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক যে ধারা চালু রয়েছে, তা যাতে আরো সংহত হয় সে ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। ২০০৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে যেন এমন কিছু না ঘটে সে মহান উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকলেই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই নিরাপত্তা, উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। আর সুস্থ গণতন্ত্র অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

আদর্শ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন

নির্বাচনকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশে কী কী বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে কতক প্রস্তাবনা পেশ করা কর্তব্য মনে করছি, যাতে এ বিষয়ে সবাই চিন্তা-ভাবনা করেন।

১. নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকারার্থে স্বাধীন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

ক. নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকবে, যাতে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

খ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সম্পূর্ণ স্বাধীন মর্যাদার অধিকারী হবে। প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণ থেকে কমিশন সচিবালয় সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।

গ. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে রিক্রুট করার সময় থেকেই সরকারি প্রশাসন থেকে পৃথক মর্যাদা দিতে হবে, যাতে তারা আজীবন নির্বাচনী দায়িত্বেই নিয়োজিত থাকেন।

২. নির্বাচন কমিশনারগণকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার প্রয়োজনে। প্রেসিডেন্ট প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণকে নিয়োগদানের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার সম্মতি নেবেন, যাতে পরে কোনো আপত্তি করার অবকাশ না থাকে।

www.bjilibrary.com

৩. ভোটার তালিকাকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার উদ্দেশ্যে ভোটারদের ছবিসহ আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতি পাঁচ বছরে একবার নির্বাচনের পূর্বে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। পুরনো তালিকা হালনাগাদ করার আইন থাকলে তা পরিবর্তন করতে হবে।

৫. মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হাই কোর্টের রায় মোতাবেক ৮ দফা তথ্য জমা দেওয়ার বিধান থাকতে হবে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ বহাল রাখার উদ্দেশ্যে চুক্তি

আগামী নির্বাচনের পর সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে নিম্নরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে হবে :

১. নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেব।

২. নির্বাচিত সরকারকে মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ দেব।

৩. রাজনৈতিক আন্দোলনে হরতাল, অবরোধ, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করব না।

৪. রাজনৈতিক বক্তব্যে অশালীন ও অসংসদীয় (Unparliamentary) ভাষা ব্যবহার করব না।

৫. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের নিয়তের উপর হামলা করব না।

৬. রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে যুক্তিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। পেশিশক্তি প্রয়োগ করব না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর কখনো হামলা করব না।

৭. অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক (Unconstitutional) কর্মসূচি গ্রহণ করব না।

৮. ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে ব্যবহার করব না। ছাত্র-সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন বানাব না।

এ দেশের প্রাচীন রাজনৈতিক দল

১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ দলের আদর্শ ছিল না। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়।

জামায়াতে ইসলামী ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯৪১ সালেই সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে। এ দেশে এ দলটি ১৯৫০ সালে কাজের সূচনা করলেও ১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদীর সফরের সময় দেশব্যাপী সংগঠন চালু হয়।

এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলে এ দুই দল একই সাথে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে। ঐ আন্দোলনেই শেখ মুজিবের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

www.bjilibrary.com

গোটা উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রাচীনতম রাজনৈতিক সংগঠন হলো মুসলিম লীগ। ১৯০৬ সালে ঢাকায়ই মুসলিম লীগের জন্ম। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর এ দলটি এ দেশে আর উল্লেখযোগ্য হিসেবে গণ্য হতে পারেনি।

আওয়ামী লীগের প্রতি কয়েকটি পরামর্শ

আওয়ামী লীগ এ দেশের অন্যতম প্রাচীন দল। স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দলটিই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে। এ দেশে গণতন্ত্রকে সংহত করার বিরাট দায়িত্ব এ দলের উপরও বর্তায়। দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রয়োজনেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মযবুত রাখা আমাদের কর্তব্য। একটি বৃহৎ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ যদি এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন না করে, তাহলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। এ ব্যাপারে তাদের নিকট নিম্নরূপ পরামর্শ রাখতে চাই :

১. অগণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক আচরণ করুন।

১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল। যাতে আর কোনো দল প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে বাকশাল কায়েম করা হয়েছিল। ১৯৭৫-এর পর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় সংসদে এ দলটি যথাযথভাবে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেছে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় গিয়ে তারা '৭৫-পূর্ব রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের আচরণ থেকে মনে হয়েছে যে, তারাই ক্ষমতায় আছেন।

২০০৬ সালে চারদলীয় জোটের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের আমলে তারা যা কিছু করেছেন তা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

২০০৭ সালের নির্বাচনের পর যেন তারা গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলেন সে পরামর্শ দিতে চাই। গণতন্ত্রবিরোধী ভূমিকা পালন করে যে তারা রাজনৈতিক কোনো সুফল অর্জন করতে পারেননি, সে কথা উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানাই। গণতান্ত্রিক ভাষায় কথা বলুন। লাঠি-লগি-বৈঠার রাজনীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করুন। যুক্তিভিত্তিক রাজনীতি করুন। পেশিশক্তি প্রয়োগের মনোবৃত্তি ত্যাগ করুন।

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে অযৌক্তিক তা উপলব্ধি করুন।

সারা বিশ্বেই দেশের নামের ভিত্তিতেই জাতি হিসেবে নামকরণ করা হয়। ভাষার ভিত্তিতে জাতির পরিচয় হয় না। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশি জাতি। বাংলাভাষা হিসেবে আমরা যেমন বাঙালি, ভারত ও আসামে যারা বাংলাভাষী তারাও বাঙালি। সকল বাংলাভাষীকে এক জাতির অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরা ভারতীয় জাতি। এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। তাই আওয়ামী লীগের নিকট আমার পরামর্শ, বাংলাদেশে ও বাঙালি হিসেবে এ দেশবাসীকে বিভক্ত করা থেকে ক্ষান্ত হন।

www.bjilibrary.com

৩. বাংলাদেশের আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নয়। তাই এ কুফরী মতবাদ আওয়ামী লীগের আদর্শ হিসেবে থাকা উচিত নয়।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা মুসলিম তারা অনেকেই নামায পড়েন, হজ্জ ও ওমরা করেন। শেখ হাসিনা নিয়মিত নামায আদায় করেন এবং বহুবার হজ্জ ও ওমরা পালন করেছেন। কুরআনে এসবের হুকুম করা হয়েছে বলেই তো তারা এসব ফরয আদায় করেন। তাহলে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, তারা কুরআনে বিশ্বাস করেন। নিশ্চয়ই তারা কুরআন তিলাওয়াতও করেন।

যে কুরআনে নামায ও হজ্জের হুকুম রয়েছে, সে কুরআনেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিধান রয়েছে। তাতে আদালত ও ফৌজদারি মামলার শাস্তির বিধানও আছে।

কুরআনের কিছু কথা গ্রহণ করা ও বাকি কথা বর্জন করার কোনো অনুমতি নেই। যারা তা করে তাদের বিরুদ্ধে কুরআনের কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে।

কুরআনে মুহাম্মদ (স)-কে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ হিসেবে অনুকরণ করার জন্য ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনৈতিক বিধান, ব্যবসায়-বাণিজ্যের নীতি ইত্যাদির যেসব নির্দেশ কুরআনে রয়েছে, মুহাম্মদ (স) স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তা বাস্তবে প্রয়োগ করে মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উন্নত মানের কল্যাণরাষ্ট্রের নমুনা রেখে গেছেন।

যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করেন, তাদেরকে আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে হলে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও মুহাম্মদ (স)-কে অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানে হলো, কুরআনকে শুধু ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা; রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ময়দানে কুরআনের বিধান মানার প্রয়োজন নেই।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কতক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়। দীন ইসলাম মানে ইসলামী জীবনবিধান। দীন অর্থ ধর্ম নয়; দীন মানে আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত বিধানের নাম 'দীন ইসলাম'। এটা কুরআনেরই পরিভাষা। এর অর্থ 'ইসলাম ধর্ম' নয়।

ইবলিস আল্লাহর একটি মাত্র হুকুমকে মানতে অস্বীকার করায় তাকে কুরআনে কাফির ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনের কতক ধর্মীয় বিধান ছাড়া অন্য সকল বিধানকে মানতে অস্বীকার করার নামই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ কারণেই সকল ইসলামী চিন্তাবিদ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কুফরী মতবাদ বলে অভিহিত করেছেন।

আওয়ামী লীগ যদি এ মতবাদ এ দেশে চাপিয়ে দিতে চায়, তাহলে প্রথমে তাদেরকে সংবিধান সংশোধন করতে হবে এবং তা গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত

www.bjilibrary.com

করতে হবে। যদি তারা এ মতবাদের পক্ষে জিদ ধরেন, তাহলে আদর্শিক দ্বন্দ্ব ক্রমে সংঘাতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, পেশিশক্তি প্রয়োগ করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে লাখ লাখ ঈমানদার জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবে।

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাই। তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলেই দাবি করেন। আমার বিশ্বাস যে, ইসলাম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যে কুফরী মতবাদ, তা তারা অবশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

৪. বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য কামনা করা পরিত্যাগ করুন।

আওয়ামী লীগ ভারতকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করে; কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাইলেও ভারত সরকারের আচরণের কারণে কোনো দিক দিয়েই ভারতকে বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে না। সীমান্তে ভারতের বিএসএফ প্রতিবছর কয়েক শ' বাংলাদেশি হত্যা করছে। শুষ্ক মওসুমে নদীর পানি বন্ধ রেখে উত্তরবঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করছে। যার ফলে বাংলাদেশের নদীগুলো পানিপ্রবাহের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। বর্ষার মওসুমে বাঁধ ছেড়ে দিয়ে অসময়ে বাংলাদেশে বন্যায় সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। ভারত থেকে যে মূল্যের পণ্য বাংলাদেশে আসে, এর বদলে ভারত বাংলাদেশ থেকে এত কম মূল্যের পণ্য নিতে সম্মত হয় যে, বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ বিরাট ঘাটতিতে ভোগে।

এসব আচরণের কোনোটা কি সৎ প্রতিবেশীর প্রমাণ দেয়? জনগণ তাহলে কেমন করে ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করতে পারে?

তদুপরি কয়েকটি এমন বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা বাংলাদেশের স্বার্থের বিরোধী বলে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সবাই মনে করেন।

১. বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে ভারতের যে কয়টি প্রদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ রয়েছে, তা দমন করার জন্য ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাতায়াতের পথ (ট্রানজিট) দাবি করেছে। এ অনুমতি দিলে ঐ বিদ্রোহীরা বাংলাদেশকে শত্রু মনে করে সকল সীমান্তে হামলা চালাত পারে।

২. বাংলাদেশের তিন দিকে ভারতের প্রদেশসমূহে ভারতের যাবতীয় মালামাল কম সময়ে ও কম খরচে পৌছানোর জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করার দাবি জানাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনই পূরণ করে কুলাতে পারছে না। ভারতকে এ বন্দর ব্যবহার করতে দিলে এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.bjilibrary.com

৩. বাংলাদেশের গ্যাস এ দেশের জনগণের চাহিদাই এখনো পর্যন্ত পূরণ করতে পারেনি। অথচ ভারত বাংলাদেশকে গ্যাস বিক্রয় করার জন্য চাপ দিচ্ছে। বাংলাদেশে কাঠের লাকড়ির অত্যন্ত অভাব। তাই গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করতে হবে। গ্যাস অফুরন্ত নয় বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় ভারতের নিকট গ্যাস বিক্রয় করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ভারতের এ তিনটি দাবিই বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এসব বিষয়ে ভারতের দাবি মেনে নেওয়ার পক্ষে বারবার মত প্রকাশ করেছে। দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের স্বার্থরক্ষার পক্ষে থাকা রহস্যজনক।

ভারতের আধিপত্য কামনার দুটো উদাহরণ

আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কোনো অবস্থায়ই ভারত সম্পর্কে এমন কোনো মন্তব্য করেন না, যার দরুন ভারত সামান্যও অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু দুজন কেন্দ্রীয় নেতা সরাসরি ভারতের আধিপত্য কামনা করার নজির স্থাপন করেছেন। একজন দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এবং অপরজন প্রেসিডিয়াম সদস্য বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

২০০৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আবদুল জলিল বলেন,

"১৯৭১ সালে আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতাযুদ্ধ করিনি। ...... মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়। বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে রক্ষার জন্য এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।"

'৭১ সালে এ দেশ পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর কব্জায় ছিল। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এসে দখলদারদেরকে পরাজিত করে জনগণকে স্বাধীন করে দেয়। বর্তমানে তো দেশ জনগণের দখলে, কোনো দল বা জোটের দখলে নয়। এখন জলিল সাহেব ভারতকে আহ্বান জানালেন কি জনগণের দখল থেকে মুক্ত করে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য?

দ্বিতীয় উদাহরণ হলো, ২০০৫ সালের ৩০ মার্চের ঘটনা। বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির আলোচনা সভা ঐ সিরডাপ মিলনায়তনেই অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাবু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। আলোচনায় প্রধান অতিথি ও অন্যান্য বক্তাগণ বলেন, "ভারতের বন্ধুত্ব ও সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাবে না। ভারতকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা উল্লেখ করে তারা বলেন, এ

www.bjilibrary.com

অবস্থায় বিপুল ব্যয়ে বড় ধরনের সেনাবাহিনী পোষা বোকামি। বাংলাদেশের জনগণকে ভারতই বর্তমানে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতের চাল-ডাল খেয়ে, ভারতের কাপড় পরে এ দেশে ভারতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা যাবে না। ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন না করে দিলে বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন হতে পারত না। ... আজ হোক, কাল হোক ভারতকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট দিতেই হবে। ... বর্তমান সরকার স্বাধীনতার রক্ষক হতে পারে না। এই সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির উৎখাতে শিগগিরই বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান হবে।"

উক্ত উভয় আলোচনা সভায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। দৈনিক যুগান্তর ও ইনকিলাবে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

২৯৭.

আওয়ামী লীগের উগ্র ও হিংস্র রাজনীতি

এ কথা তো সবারই জানা যে, আওয়ামী লীগের ভূমিকা সব সময়ই উগ্র। ২০০৫ সালের জুলাই থেকে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে তাদের উগ্রতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে এমন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, তা যদি জোট সরকার দলীয় কর্মীদের দ্বারা প্রতিহত করতে চাইতেন তাহলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ত। শেখ হাসিনার শাসনামলে বিরোধী দলের কর্মসূচিকে তাদের দলীয় ক্যাডার দিয়ে প্রতিহত করা হতো; কিন্তু চারদলীয় জোট সরকার তা করেনি।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২৮ অক্টোবর লাঠি-বৈঠা-লগি দিয়ে বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে আয়োজিত জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় আগতদেরকে চরম নৃশংসতার সাথে রাজপথে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। স্যাটেলাইট টেলিভিশনে এ বর্বর দৃশ্য দেশ-বিদেশের কোটি কোটি মানুষ হতবাক হয়ে দেখেছে। ঢাকাস্থ বিদেশি কূটনীতিকগণ থেকে নিয়ে জাতিসংঘের বিদায়ী সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এতে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের পরিচয় সারা দুনিয়ায় ছড়িয়েছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের এ নমুনায় দেশের ভাবমর্যাদা কতটা ক্ষুণ্ন হয়েছে, তা আওয়ামী লীগ ছাড়া সবাই উপলব্ধি করেছে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ এরপরও সামান্য লজ্জিত হয়নি। দলের প্রধান হিসেবে শেখ হাসিনা একটু দুঃখ প্রকাশেরও প্রয়োজন বোধ করেননি। বরং এর পর থেকে দুর্বল কেয়ারটেকার সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধের মতো চরম গণবিরোধী ও দেশের স্বার্থবিধ্বংসী হিংস্র কর্মসূচি পালন করে প্রমাণ করেছেন যে, তাদের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে তারা প্রয়োজনে দেশদ্রোহী তৎপরতা চালাতেও পরওয়া করেন না।

www.bjilibrary.com

শেখ হাসিনা কর্তৃক সেনাবাহিনী ও র‍্যাব প্রত্যাহারের দাবি

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চার কিস্তিতে মোট ১৩ দিন অবরোধ করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের ১৪ কোটি জনগণকে চরম যাতনা দিলেন। ব্যবসায়ীরা তার দরবারে বারবার ধরনা দিয়েও এ দেশবিরোধী কর্মসূচি থেকে তাকে বিরত রাখতে সক্ষম হননি।

১৪ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে যখন ১০ ডিসেম্বর বঙ্গভবন অবরোধ করার ঘোষণা করা হলো, তখন প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়ে এর পূর্বের রাতে সেনাবাহিনীকে ময়দানে নামিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। অবরোধ বন্ধ হয়ে গেল। ১৪ দলের সমন্বয়ক আবদুল জলিল ১০ তারিখে সাংবাদিকদেরকে বললেন যে, আমরা অবরোধের ঘোষণা দিইনি।

২৯ ডিসেম্বর (২০০৬) শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে তার দীর্ঘ দাবিনামার মধ্যে ঈদের আগেই সেনাবাহিনী ও র‍্যাবকে প্রত্যাহার করার দাবি জোরেশোরে উচ্চারণ করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্থা। তাদেরকে তিনি কেন ভয় করেন? সেনাবাহিনী ময়দানে থাকলে তিনি অবরোধের মতো দেশবিরোধী তৎপরতা চালাতে পারবেন না বলেই এ দাবি। সরকার এ দাবি পূরণ করে তাদেরকে নৈরাজ্য কায়েমের সুযোগ কেমন করে দেবেন? সেনাবাহিনী ময়দানে থাকায় গোটা দেশবাসী পরম স্বস্তিবোধ করে।

কারো উপরই শেখ হাসিনার আস্থা নেই

২০০১ সালে শেখ হাসিনার আস্থাভাজন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ঘটনায় আর কারো উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না; বরং তিনি প্রশাসন, পুলিশ এমনকি সেনাবাহিনীকেও দোষী সাব্যস্ত করেছেন। জনগণের উপর আস্থা হারিয়ে তিনি বিদেশের দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন।

এ কারণেই তিনি সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে বলে ভরসা পাচ্ছেন না। এ জাতীয় আস্থাহীনতা নিয়ে তিনি রাজনীতির ময়দানে কেমন করে টিকে থাকবেন?

র‍্যাবকে প্রত্যাহার করার দাবি বিস্ময়কর। গত কয়েক বছরে র‍্যাব সন্ত্রাস দমনে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে তারা জনগণের অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়েছে। র‍্যাব সরকারি দলের সন্ত্রাসীদেরকেও ছাড়েনি। এ বিষয়ে জোট সরকার চরম আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। র‍্যাব জেএমবির মহাসন্ত্রাস খতম করে দেশকে সাংঘাতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। নির্বাচন নাগাদ র‍্যাবের তৎপরতা বন্ধ রাখার দাবি জানিয়ে শেখ হাসিনা তার সন্ত্রাসী পরিকল্পনা ফাঁস করে দিলেন। তিনি নির্বাচনে হয়তো এমন কিছু কর্মকাণ্ড ঘটাতে চান, যা র‍্যাব প্রতিহত করবে বলে তিনি আশঙ্কা করেন। র‍্যাব প্রত্যাহারের দাবি করে তিনি জনগণের নিকট তার আসল চেহারা খুলে দিলেন।

www.bjilibrary.com

জেএমবি ইস্যুতে শেখ হাসিনার আজব স্ববিরোধী ভূমিকা

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সারা দেশে একই সময় বোমা হামলা করে জেএমবি সর্বস্তরের জনগণকে ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত করতে সক্ষম হয়। সরকার হতভম্ব হয়ে পড়ে। শেখ হাসিনা এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি দায়ী করেন। এ জঙ্গি বাহিনী নাকি প্রধানমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে। পাগলের প্রলাপের মতো এ কথা বলার সময় তিনি ভুলে গেলেন যে, জনগণ তার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এমন কোনো নির্বোধ সরকার দুনিয়ায় নেই, যে আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করে নিজেকে ব্যর্থ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।

র‍্যাব যখন জেএমবির শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরকে অত্যন্ত চমকপ্রদ যোগ্যতার সাথে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো, তখন শেখ হাসিনা এটাকে নাটক বলে বিদ্রূপ করে চরম ক্ষুদ্রমনার পরিচয় দিলেন।

আদালত শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিলে শেখ হাসিনা মন্তব্য করলেন যে, সরকারি দলের গডফাদারদেরকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলা হচ্ছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা প্রথমে ঘোষণা করেছিল যে, তারা তাগূতী আদালতে আপিল করবে না। কিন্তু পরে তারা আপিল করায় মৃত্যুদণ্ড বিলম্বিত হওয়ায় শেখ হাসিনা মন্তব্য করলেন যে, ফাঁসির আসামিদেরকে জামাই আদরে রাখা হয়েছে। শেখ হাসিনার এসব স্ববিরোধী মন্তব্য থেকে কি তার সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়?

গৃহযুদ্ধের হুমকি

২০০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয়ক আবদুল জলিল এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগসহ কতক অবাস্তব দাবি উচ্চারণের পর রাষ্ট্রপতিকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, 'অবিলম্বে এসব দাবি মেনে নিন। দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবেন না।'

তার মতো বড় নেতা এ কথাটির তাৎপর্য নিশ্চয়ই বোঝেন। এ কথাটি হালকাভাবে বলার মতো কথা নয়। কথাটি দ্ব্যর্থবোধকও নয়। তিনি এর দ্বারা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিলেন যে, এসব দাবি আদায়ের জন্য তারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হতেও প্রস্তুত।

তার এ হুমকি দেওয়ার মাত্র এক মাস তিন দিন পর ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতেই নির্বাচন হওয়ার কথা। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সিদ্ধান্তের জন্য তারা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন।

কাদের ভরসায় তিনি এত বড় হুমকি দেওয়ার সাহস পেলেন? তিনি কি মনে করেন যে, পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তারা এমন বিভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছেন যে তারাও গৃহযুদ্ধে শরীক হবেন? যদি তারা শরীক না হন তাহলে গৃহযুদ্ধের উদ্দেশে কেউ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালালে তা অবশ্যই তারা দমন করবে।

www.bjilibrary.com

আওয়ামী লীগ গৃহযুদ্ধ বাধাতে চাইলে কি জনগণ তাদের পক্ষে সাড়া দেবে? তাদের গণ-অভ্যুত্থানের ডাকে যেমন জনগণ সাড়া দেয়নি, সন্ত্রাস করার ডাকেও সাড়া দেবে না। বরং নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই জনগণ সন্ত্রাস ঠেকাতে সরকারের সাথে সহযোগিতা করবে।

আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, গৃহযুদ্ধের মতো মারাত্মক কথা তিনি কেমন করে উচ্চারণ করলেন? গৃহযুদ্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করলে তাদের দলের সমর্থকরাও সাড়া দেবে না। এমন আত্মঘাতী কর্মসূচি কোনো দেশপ্রেমিকই সমর্থন করতে পারে না।

মহাজোট গঠন

২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর ১৪ দলীয় জোট গঠিত হওয়ার পর দুই বছর চারদলীয় জোট সরকারের পতনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করে ব্যর্থ হয়ে তারা তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হওয়ার দিন থেকে অবরোধের পর অবরোধ করে বেশ কতক সংবিধানবিরোধী, অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় দাবি আদায় করে নেন।

এরশাদ সাহেব চারদলীয় জোটে আসার সিদ্ধান্ত কয়েক বারই ঘোষণা করেছেন; কিন্তু দরকষাকষিতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ১৪ দলের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে তার দল এককভাবেই ৩০০ আসনে নির্বাচন করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা হাসিল করবে।

বিএনপির কতক বিদ্রোহী নেতা পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ডাক্তার বি চৌধুরীর নেতৃত্বে এলডিপি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে বিএনপির বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। কর্নেল (অব) অলি আহমদ বিএনপির কবর রচনার সংকল্পও ঘোষণা করেন।

তারা চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে নির্বাচন করার হিম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটে যোগদান করেন। ১৮ ডিসেম্বর (২০০৬) পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে মহাজোট গঠিত হয়।

শেখ হাসিনা নিশ্চয়তা বোধ করলেন যে, মহাজোট একসাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে বিজয়ী হওয়ার আশা করা যায়। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে উচ্চারণ করলেন যে, বিএনপি-জামায়াত একঘরে হয়ে পড়েছে। বিজয়ের নিশ্চয়তা বোধ করেই শেখ হাসিনার মহাজোট নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারা দেশে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। নির্বাচন কমিশন তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারবার সিডিউল পরিবর্তন করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে জনগণ ধারণা করে যে, তাদের সকল দাবিই পূরণ হয়েছে; এমন কোনো দাবি বাকি নেই, যা পূরণ হওয়াকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত বলে গণ্য করা যায়।

www.bjilibrary.com

মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত

শেখ হাসিনা ২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি বিশাল সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন বর্জনের অপ্রত্যাশিত ঘোষণা দেন। হোটেল শেরাটনের হল রুমে জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলনে শেখ হাসিনার ডানদিকে ডাক্তার বদরুদ্দোজা ও বাঁদিকে এরশাদ আসন গ্রহণ করেন।

উৎফুল্ল ও উল্লসিত শেখ হাসিনার খোশমেজাজ থেকে মনে হচ্ছিল যে, তিনি মহাবিজয়ী বীরাঙ্গনা এবং এ দেশের সম্রাজ্ঞী। তিনি প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদকে নির্দেশ দেওয়ার সুরে নিম্নরূপ ফরমান জারি করেন :

১. প্রধান উপদেষ্টার পদ ত্যাগ করে নতুন প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।

২. নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ ও নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

৩. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত তিন শতাধিক দলীয় ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. খসড়া ভোটার তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ১৫ দিন সময় দিতে হবে এবং প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৫. সব ভোটারকে ভোটার আইডি কার্ড দিতে হবে।

৬. নির্বাচনে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করতে হবে।

৭. পুরনো ভোটকেন্দ্র বহাল রাখতে হবে।

৮. প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

৯. এটর্নি জেনারেল, সব আইন কর্মকর্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষপদে নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে পরিবর্তন করতে হবে।

সুস্থ মস্তিষ্কের যেকোনো নিরপেক্ষ লোকই বিস্ময় বোধ করবে যে, দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে সরকার পরিচালনা ও নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একটি রাজনৈতিক দলের প্রধানের পক্ষ থেকে এ জাতীয় নির্দেশ দেওয়ার কোনো অধিকার কেমন করে থাকতে পারে?

২০০৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২৬ ডিসেম্বর রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। ৩ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার শেষ দিন শেখ হাসিনা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলে মহাজোটপ্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার সময় শেখ হাসিনা যে ১০ দফা দাবি পেশ করলেন, এর কোনোটাই নতুন দাবি নয়। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পূর্বে অবরোধের মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনেক দাবি আদায় করার পর উপরিউক্ত দাবিসমূহ আদায় না হওয়া সত্ত্বেও মহাজোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ অবস্থায় ঐসব দাবির অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচন বর্জনের যৌক্তিকতা বোধগম্য নয়।

www.bjilibrary.com

দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হওয়ায় এরশাদের মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশন বাতিল ঘোষণা করে। নির্বাচন কমিশন বিধি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হয়েছে। এরশাদ নির্বাচন করতে অক্ষম হওয়ায় তার দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে; কিন্তু মহাজোট নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিল কেন?

উপদেষ্টাদের পণ্ডশ্রম

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচাল করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান। তিনি সংস্কার আন্দোলনের নামে সংবিধানবিরোধী দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে অগণতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে তার ক্ষমতা লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই তিনি নির্বাচন বানচাল করতে চান। কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হওয়ার সাথে সাথেই চার জন উপদেষ্টা ১৪ দলীয় জোটকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সম্মত করার উদ্দেশ্যে সিরিয়াস প্রচেষ্টা চালান। আমরা পূর্বে লিখেছি যে, এটা তাদের দায়িত্ব ছিল না। আরো লিখেছি, উপদেষ্টাগণ শেখ হাসিনাকে চেনেন না এবং তিনি যে নির্বাচন বানচাল করতে চান তা জানেন না। শেখ হাসিনাকে দুই মাস তোয়াজ করে তারা হয়তো এতদিনে উপলব্ধি করেছেন যে, তারা শুধু পণ্ডশ্রমই করেছেন। শেখ হাসিনার সংবিধানবিরোধী দাবি একটার পর একটা মেনে নিয়ে তাকে আরো হিংস্র হতে উৎসাহিত করেছেন। পরপর চার বার অবরোধের মতো অগণতান্ত্রিক তৎপরতার অস্ত্র প্রয়োগ করার বিরুদ্ধে উপদেষ্টাগণ কোনো আপত্তি করেননি। শুধু তাদের দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে আরো সাহসী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে, সরকার তাদের নিকট নতজানু।

এখন তারা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে আবার অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছেন। তারা নির্বাচন প্রতিহত করার হুমকিও দিয়েছেন এবং গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কেয়ারটেকার সরকার কি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হবেন?

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ মাত্র ৯০ দিন। সে হিসেবে নির্বাচন কমিশন ২২ জানুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও সহায়তা করাই উপদেষ্টাগণের সাংবিধানিক শপথের দাবি। তারা ১৪ দলীয় জোটেরই মোকাবেলা করতে পারেননি। এখন তো মহাজোট। তারা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। ২৭, ২৮ ও ২৯ অক্টোবর (২০০৬) সারা দেশে অবরোধের অবস্থা দেখেই দ্বিতীয় অবরোধের পূর্বে রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীকে ময়দানে আনার চেষ্টা করেছিলেন। উপদেষ্টাগণ তা করতে দেননি। এখন কী করবেন? শেখ হাসিনা নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, জীবন থাকতে এ নির্বাচন হতে দেবেন না। শেখ হাসিনাকে তোয়াজ করে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত করার জন্য অবশ্য ঐ চারজন উপরদেষ্টাই প্রধানত দায়ী, যারা সেনাবাহিনীকে ময়দানে আনার প্রতিবাদে

www.bjilibrary.com

পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু উপদেষ্টাপরিষদের অন্য সদস্যগণ ঐ চারজনকে সমর্থন না করলে তারা ঐ ভুল করার সুযোগ পেতেন না। যাহোক, শেখ হাসিনার সাথে সমঝোতার কোনো পথ আর অবশিষ্ট নেই। এখন কেয়ারটেকার সরকারের সম্মুখে বিরাট চ্যালেঞ্জ। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো সম্ভাবনাই নেই। নির্বাচনের পক্ষে জনগণের ইতিবাচক ভূমিকাই একমাত্র ভরসা।

জনগণের দৃষ্টিতে মহাজোটের নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত

শেখ হাসিনা সব সময় জনগণের দোহাই দেন। তিনি যা দাবি করেন, সবই জনগণের দাবি। জনগণ যদি তারই সমর্থক হয়ে থাকে, তাহলে ২০০১ সালের নির্বাচনে তার দলকেই বিজয়ী করত এবং তার বর্তমান আন্দোলনে সাড়া দিত।

২০০৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তার মহাজোটের সকল দল নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। মাত্র ১০ দিন পর ৩ জানুয়ারি '০৭ তিনি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ দশ দিনের মধ্যে এমন কী কারণ ঘটল, যার ফলে তার সিদ্ধান্ত বদলে গেল? তিনি যেসব দাবি উত্থাপন করলেন এর কোনোটাই নতুন দাবি নয়। এসব দাবি বাকি থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

তার দীর্ঘ দাবিনামার তালিকা ইতঃপূর্বে লিখেছি। সব দাবিই পুরনো। শুধু একটা দাবি নতুন, যা তিনি প্রধান দাবি হিসেবে তুলে ধরেননি। সব দাবির সাথে ঐ নতুন দাবিটিকে গুরুত্বহীনভাবে পেশ করেছেন। সে দাবিটি হলো, 'এরশাদকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে'।

যে জনগণের দোহাই তিনি দেন, তারা তো বোকা নয়। তারা দেখল যে, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণার মাত্র ১০ দিন পরই বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের দৃষ্টিতে তার এ সিদ্ধান্ত কি যুক্তিপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে? ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর জনগণ ২২ জানুয়ারিতে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এখন এ আজব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা কী ধারণা করবে?

এরশাদ সাহেব তো আইনগত কারণে নির্বাচনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হলেন। নির্বাচন বর্জনের জন্য এটাকে একমাত্র কারণ বলা তো দূরে থাক, প্রধান কারণ বলেও তো তিনি দাবি করেননি। তাই জনগণ এ ধারণাই করবে যে, নির্বাচন বর্জনের জন্য যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তা অজুহাত মাত্র, আসল কারণ নিশ্চয়ই অন্য কিছু।

নির্বাচন প্রতিরোধের যে হুমকি দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনি। এর কোনো আইনগত অধিকার নেই। তাই সরকার এ বেআইনি তৎপরতা বন্ধ করার জন্য বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে। শেখ হাসিনা বলতে পারেন যে, জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ প্রকৃত সত্য হলো, শেখ হাসিনা জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের পক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন হলো, কারা সঠিক, আর কারা ভ্রান্ত– এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার মালিক কে? সংবিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে। কিন্তু জনগণ তো একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত দিতে পারে। শেখ হাসিনা যদি নির্বাচন থেকে পালাতে থাকেন তাহলে কীভাবে জনগণের আদালতে সুবিচার পাবেন? তিনি তো জনমতের কোনো পরওয়াই করেন না; যদি করতেন তাহলে অবরোধের মতো গণবিরোধী কর্মসূচি দিতে পারতেন না।

২৯৮.

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকগণের ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ। এ দেশে গণপ্রতিনিধিদের প্রণীত একটি সংবিধান রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস হলো জনগণ। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে।

প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। এ জাতীয় সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের। তারাই সমস্যা সৃষ্টি করে থাকেন। কোনো স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব অন্য দেশের নয়। যদি কোনো রাষ্ট্র এ জাতীয় অপচেষ্টা চালায়, তাহলে তা অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ হিসেবে অপরাধ বলে গণ্য। কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দেশ এ জাতীয় হস্তক্ষেপকে সহ্য করতে পারে না।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকগণ অব্যাহতভাবে এ অপরাধটি করে চলেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই এজন্য প্রধানত দায়ী। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর তারা বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য দেশের জনগণের নিকট পেশ না করে বিদেশে গিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন। তারাই রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে কূটনীতিকদের দরবারে ধরনা দেন। তারা যদি বারবার কূটনীতিকদের নিকট ধরনা না দিতেন, তাহলে কূটনীতিকরা গায়েপড়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এত বেশি নাক গলাতে পারতেন না।

কূটনীতিকগণের নিকট প্রশ্ন

আপনাদের দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে অন্য কোনো দেশের হস্তক্ষেপ কি আপনারা সহ্য করবেন? তাহলে আপনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অব্যাহতভাবে নাক গলাচ্ছেন কেন?

আপনাদের এ তৎপরতা যদি সমস্যার সমাধানে সামান্যও সহায়ক হতো তাহলে একটা কথা ছিল; কিন্তু আপনারা যা করছেন তাতে দেশের ফ্যাসিবাদী শক্তি আরো আশকারা পাচ্ছে। অগণতান্ত্রিক ও সহিংস তৎপরতা থেকে তাদেরকে বিরত রাখার কোনো উপদেশ কেন দেন না? তারা তো আপনাদের দুয়ারেই বারবার ধরনা দেয়। তাদেরকে গণতন্ত্রের সবক দেওয়ার সুযোগ আপনাদের আছে।

www.bjilibrary.com

আপনারা জানেন যে, আমাদের সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হতেই হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬ ডিসেম্বর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে ৩ জানুয়ারি তা প্রত্যাহার করে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করল। এতে আপনারা হতাশা প্রকাশ করেছেন; কিন্তু এটা করা অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করতে পারলেন না। এ অবস্থায় আপনারা হতাশ হয়ে চুপ করে থাকতে পারলেন না কেন? নির্বাচন বানচালকারী অপশক্তি নির্বাচনে না আসায় এ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করে তাদের পক্ষেই রায় দিলেন। তারা যে নির্বাচন বানচাল করে দেশে গৃহযুদ্ধ বাধাতে চায় সে কথা আপনারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন কেন? আপনাদের তৎপরতা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সহায়ক বলে প্রমাণিত হয় না।

আপনারা কাদেরকে এ দেশে ক্ষমতায় দেখতে চান? জনগণ যাদেরকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় দেখতে চায়, তাদেরকে কি আপনারা ক্ষমতায় দেখতে চান? জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চায়, তাদেরকেই বৈধ বলে আপনাদের গ্রহণ করা উচিত। প্যালেস্টাইনের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে হামাসকে ক্ষমতা দিয়েছে। আপনারা তাতে চরম অসন্তুষ্ট। জনগণ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকেই আপনারা ক্ষমতায় দেখতে চান— এটাই কি গণতন্ত্র? তাই আপনাদের ভূমিকা মোটেই স্বচ্ছ নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আপনারা নাক গলানো বন্ধ করুন। জনগণের নিকট আপনাদের ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণ

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শক্তির ধারক ও বাহক বিএনপি এবং আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের পতাকাবাহী জামায়াতে ইসলামী ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন যে রাজনৈতিক ঐক্যে শামিল হয়েছে, তা এখনো অটুট রয়েছে। চারদলীয় জোটের নামে ঐ তারিখেই আরো দুটো দল শরীক থাকলেও তারা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য ইসলামী ঐক্যজোটের দুই গ্রুপ এখনো এ জোটেই আছে। এ কয়েকটি শক্তি এক মেরুতে অবস্থান করছে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের পতাকাবাহী আওয়ামী লীগ ২০০৪ সাল থেকে চারদলীয় জোটের বাইরের সকল রাজনৈতিক দলকে এক জোটে শামিল করার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত বামপন্থি ছোট ছোট নামসর্বস্ব তেরটি দল নিয়ে ১৪ দলীয় জোট গঠন করা হয়। অন্য কোনো দল সাড়া দেয়নি।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সিডিউল ঘোষণার পর এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি ও ডা. বদরুদ্দোজার নেতৃত্বে এলডিপি ২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর হঠাৎ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটে যোগদান করে। তারা একসাথে চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেয়; কিন্তু কয়েকদিন পরই ৩ জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেয়।

www.bjilibrary.com

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বে খেলাফত মজলিসের একাংশও সংসদে কয়েকটি আসন পাওয়ার লোভে এ মহাজোটে শামিল হয়। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যারা মহাজোটে শরীক হলেন তারা শেখ হাসিনার পাল্লায় পড়ে নির্বাচন প্রতিহত করার আন্দোলনে সক্রিয় হতে বাধ্য হন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উপরিউক্ত দলগুলো অপর মেরুতে অবস্থান করছে।

মহাজোট কি নির্বাচন প্রতিহত করতে পারবে?

দেশের মালিক জনগণ। গত নির্বাচনের পাঁচ বছর পর আবার তারা নির্বাচনের সুযোগ পেয়েছে। মহাজোট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় তারা যাদের ভোট পেতেন তারা হয়তো অন্য কাউকে ভোট দেবে। চারদলীয় জোট ও অন্য অনেক দলের প্রার্থী ছাড়াও বিরাটসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী ময়দানে আছেন। জনগণ তাদের মধ্যে যাকে ভোট দিতে চায় দেবে। সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য। কেয়ারকেটার সরকারও নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা করতে ওয়াদাবদ্ধ।

মহাজোটের নির্বাচন বর্জন করার ইখতিয়ার আছে। তারা সে ইখতিয়ার প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু যারা নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছেন তাদেরও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। জনগণেরও ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার আছে। তাই নির্বাচন প্রতিহত করার কোনো অধিকার মহাজোটের নেই।

প্রার্থীদের ও ভোটারদের অধিকারে অগণতান্ত্রিক পন্থায় যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন বাহিনীর। সুতরাং মহাজোট নির্বাচন প্রতিহত করতে পারবে না। তারা আইনবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হলে আইনের রক্ষকদের হাতে পরাস্ত হবেন। ১৯৮৮ সালে এরশাদের স্বৈরশাসনামলে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করা সত্ত্বেও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন বন্ধ করা যায়নি। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনও প্রতিহত করা যায়নি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

মহাজোট নেতারা প্রশাসন, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী ও সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকার জন্য ১০ জানুয়ারি (২০০৭) পল্টন ময়দানের সমাবেশে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা কেমন করে ধারণা করলেন যে, বৈধ সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তাদের অবৈধ নির্দেশ পালন করা হবে?

তারা জনগণকেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। জনগণ যদি তাদের ডাকে সাড়া দিতে সম্মত হতো তাহলে ১৯৯০ সালের মতো গণ-অভ্যুত্থান হয়ে যেত। সাবেক সেনাপতির মর্যাদার দোহাই দিয়ে এরশাদ বর্তমান সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অমান্য করার জন্য আদেশ দিলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে, ১৯৯০ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালেও সেনাবাহিনীকে তার পক্ষে এবং জনগণের বিপক্ষে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট জনগণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সেনাবাহিনী জনগণের পক্ষেই ময়দানে তৎপর রয়েছে।

www.bjilibrary.com

মহাজোট যা করতে সক্ষম

১০ জানুয়ারি (২০০৭) মহাজোট পল্টন ময়দানে নির্বাচন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তা দেশের ১৪ কোটি মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে। তারা ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি ৬ নং অবরোধ, ১৭ ও ১৮ তারিখে ৭ নং অবরোধ এবং ২১ ও ২২ তারিখে হরতালের ঘোষণা দিলেন। তারা ২৮ অক্টোবর থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত পাঁচ কিস্তিতে মোট ১৬ দিন অবরোধ করেছেন। আরো দুটো অবরোধে চার দিন মিলে মোট ২০ দিন দেশকে অচল করে রেখে দেশের মহাসর্বনাশ করে তারা কি আশা করছেন যে, তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে? উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রেখে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার মতো গণবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে তারা দেশপ্রেমের কেমন পরিচয় দিলেন? তারা কি মনে করেন, এর জন্য একদিন তারা জনগণের নিকট শাস্তি পাবেন না? পেশিশক্তি প্রয়োগ করে জনগণকে কষ্ট দেওয়া গেলেও তাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই অবরোধ তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

বর্তমান সংকট সৃষ্টিতে শেখ হাসিনার অবদান

যে সংকটে পড়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন তা তারই সৃষ্ট। সংবিধান অনুযায়ী যার প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার কথা তাকে দায়িত্ব নিতে না দিয়ে বিরাট অন্যায় করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করতে দিলে ভোটার তালিকার সমস্যা সৃষ্টি হতো না। নতুন ভোটার তালিকা করার অপরাধে এম এ আজিজকে পদত্যাগ করার দাবি করে তিনি দ্বিতীয় অন্যায় করলেন। ফলে সমস্যা আরো জটিল রূপ ধারণ করল।

তথাকথিত সংস্কার আন্দোলনে লিপ্ত না হয়ে শেখ হাসিনা চারদলীয় জোটের কয়েকটি ব্যর্থতাকে ইস্যু বানিয়ে জনগণের ময়দানে নির্বাচনী অভিযান চালালে ১৯৯৬ সালের মতো নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন; কিন্তু তিনি জনগণের উপর আস্থা স্থাপন করতে সাহস পেলেন না।

হরতাল ও অবরোধের মতো গণবিরোধী পদ্ধতির পরিবর্তে তারা যদি গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যান তাহলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়ই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১১ জানুয়ারি ২০০৭ প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১৪১ নং ধারা অনুযায়ী দেশে ইমার্জেন্সি (জরুরি অবস্থা) ঘোষণা করায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেল। ১১ জানুয়ারি রাতে প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিলেন তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> 'দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ও সিদ্ধান্ত আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। বিগত ২৯ অক্টোবর

www.bjilibrary.com

(২০০৬) তারিখে আমি সংবিধানের ৫৮(গ) ধারা অনুযায়ী প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং উপদেষ্টামণ্ডলী সহকারে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আমাদের প্রায় সবকয়টি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সব রাজনৈতিক দল কর্তৃক সমাদৃত হয়নি। পক্ষান্তরে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা দিয়েছে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সহিষ্ণুতার অভাব।

'উপদেষ্টা পরিষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিগত আড়াই মাসে দেশে হানাহানি, সন্ত্রাস ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অসহিষ্ণু ও হিংসাত্মক আচরণের ফলে ঝরে গেছে অনেক মূল্যবান নিষ্পাপ প্রাণ, দেশের অর্থনীতি গভীরভাবে বিপর্যস্ত। সমগ্র জাতি আজ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় নিপতিত। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা দারুণভাবে বিঘ্নিত। কম-বেশি সবাই জান-মালের নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত। গণমানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন হয়েছে সীমাহীন কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার।

'বড় দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে অন্যান্য রাজনৈতিক দল দুই জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। দেশকে সম্ভাব্য উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে গেলে জাতীয় নেতৃত্বে চারটি গুণাবলির সমন্বয় প্রয়োজন– যথাযথ সততা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম। এ সমন্বয় হয়েছে কি না, তা মূল্যায়নের দায়িত্ব দেশবাসীর।

'দেশের আপামর জনগণের প্রত্যাশা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যারা জয়ী হবে তাদের দ্বারা দেশ পরিচালিত হোক; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এদিকে উভয় জোটের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে তারা নিজ নিজ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে দেশ সম্ভাব্য বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে। দেশের অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে, রপ্তানিতে ধস নামবে এবং সর্বোপরি দেশে অরাজকতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করবে।

'স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির তিন যুগ পর আজো দেশবাসী মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্বস্তি। গণতন্ত্র চর্চার নামে চলছে অগণতান্ত্রিক আচরণ, প্রহসন ও প্রতারণা। এ অবস্থা অব্যাহতভাবে চলুক, জনগণ তা চায় না। জনগণকে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ করে দিতে হবে, স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সৎ ও উপযুক্ত সরকার গঠনের অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে।

'দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ যারা অগ্রগতি ও প্রগতিতে বিশ্বাস করে, তারা কেউ চায় না দেশের অপার সম্ভাবনার পথ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে রুদ্ধ হয়ে যাক। এ কথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে, ইতোমধ্যে প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগের উচ্চ আদালতের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। দেশকে সর্বক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করতে হলে, দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে হলে, দেশের রপ্তানি

www.bjilibrary.com

বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হলে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। উপরিউক্ত কারণে এবং দেশ ও জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কথা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি, যা সমগ্র বাংলাদেশে বলবৎ থাকবে।

'ব্যক্তিগতভাবে আমার সরকার ও প্রশাসনের লক্ষ্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান, সৎ ভাবে গণতন্ত্র চর্চা এবং প্রত্যাশিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাঙ্ক্ষিত সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজে ও শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য ইতোমধ্যে দেশপ্রেমিক ও পরীক্ষিত সশস্ত্র বাহিনীকে তলব করা হয়েছে।

'সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথকে সুগম করার লক্ষ্যে আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসনের ব্যবস্থা করবেন।"

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের এত মাথাব্যথা কেন?

বাংলাদেশে রাজতান্ত্রিক শাসন নেই, সামরিক স্বৈরশাসনও নেই। ১৯৯১ সাল থেকে একটানা পনেরো বছর সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রয়েছে। কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতির কারণে নির্বাচনে কোনো দলীয় আধিপত্যেরও সুযোগ নেই। রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস জনগণ।

২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ভারতীয় আধিপত্যবাদী একটি রাজনৈতিক অপশক্তি সম্পূর্ণ ফ্যাসিবাদী পন্থায় দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। ২০০৭ সালের নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল না বিধায় এ মহলটি ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে বানচালের উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের জুলাই থেকে তথাকথিত সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। একপর্যায়ে তারা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও আবার পিছিয়ে যায়। তারা অবরোধ ও হরতালের মতো সন্ত্রাসী কর্মসূচি দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করার অপচেষ্টা চালায়।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট তারিখের মাত্র ১১ দিন পূর্বে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাচন স্থগিত করেন এবং নতুন কেয়ারটেকার সরকার গঠন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেন।

যদি ইউরোপ ও আমেরিকার কূটনীতিকগণ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের নতুন সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন এমন সর্বাত্মক চাপ সৃষ্টি না করতেন তাহলে ২২ জানুয়ারিতে মহাজোটের সন্ত্রাস সত্ত্বেও নির্বাচনে জনগণ বিপুল সংখ্যায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হতো এবং সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো।

www.bjilibrary.com

এটা এক বিরাট প্রশ্ন যে, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের এত মাথাব্যথা কেন? কূটনীতিকরা নিজেদের চোখে ১৪ দলীয় জোটের সহিংসতা দেখেছেন। তারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাক গলানো প্রয়োজন মনে করা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের দুশমনদেরকে সংশোধনের চেষ্টা করলেন না। তারা ২৮ অক্টোবরে রাজপথে তাদের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানালেন না। অবরোধের বিরুদ্ধে নিন্দা জানানো দূরে থাকুক, সামান্য আপত্তিও করলেন না। কূটনীতিকদের যাবতীয় তৎপরতা অগণতান্ত্রিক শক্তিকেই উৎসাহিত করেছে।

দেশের নিষ্ঠাবান গণতান্ত্রিক শক্তি কূটনীতিকগণের এ জাতীয় তৎপরতায় আপত্তি করে এসেছেন। তারা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কখনো কূটনীতিকদের দুয়ারে ধরনা দেননি। এটা লক্ষ করা গেছে যে, কূটনীতিকগণের যাবতীয় তৎপরতা অগণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষেই গিয়েছে। তারা নির্বাচন স্থগিত করার অপচেষ্টা না করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে পারতেন। নির্বাচনের পর স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ বের হতো এবং আরেকটি মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সমাধান হতো। তথাকথিত মহাজোট বিদেশিদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এতটা মারমুখী হওয়ার সাহস পেয়েছে।

বিদেশিরা বাংলাদেশে কাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়?

আন্তর্জাতিক নীতিতে ব্রিটেন আমেরিকার দোসর। আমেরিকা বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাবাহী। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আতঙ্কে অস্থির। ইরান ও সুদানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকে এ আতঙ্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুসলিম দেশে যাতে তাদের পছন্দনীয় সরকার কায়েম হয়, সেদিকে তারা অত্যন্ত সজাগ। তারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ফেরি করে বেড়ান; কিন্তু মুসলিম দেশে তারা জনগণকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সুযোগ দিতে মোটেই রাজি নন। প্যালেস্টাইনে জনগণ হামাসকে নির্বাচিত করায় আমেরিকা ক্ষিপ্ত।

বাংলাদেশে ২০০১ সালের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে তারা সবাই স্বীকার করেন। তবু জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা করতে তারা লজ্জাবোধ করেন না। তাদের আচরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগকেই তারা ক্ষমতাসীন দেখতে চান। আওয়ামী লীগের ইসলামবিরোধী চরিত্রই তাদের প্রধান আকর্ষণ।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর মতো তাদের ভাষায় 'মৌলবাদী গোষ্ঠী'র একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে অগ্রসর হওয়াকে তারা মহাবিপদ মনে করেন। তারা মনে করেন যে, আওয়ামী লীগই ইসলামের উত্থানের বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। তাদের আওয়ামীপ্রীতির আর কোনো কারণ তালাশ করে পেলাম না। ক্ষমতাসীন হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের দুয়ারে সব সময় ধরনা দিয়ে আছে।

www.bjilibrary.com

গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য আগামী নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ

আজ হোক, কাল হোক, নির্বাচন বন্ধ করার সাধ্য কারো নেই। নির্বাচন ছাড়া আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোরও কোনো সুযোগই নেই। তাই জনগণের কাঙ্ক্ষিত সরকার কায়েমের উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকারকে ছবিসহ আইডি কার্ড তৈরি করে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে, যাতে জালভোটের কোনো সুযোগ না থাকে। ভোটকেন্দ্রে যাতে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। নির্বাচনের পূর্বে সকল সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ যাতে নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব কূটনীতিকগণকেই নিতে হবে।

২৯৯.

জরুরি অবস্থার পর কী হবে?

আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী ও হিংস্র রাজনীতির ফলে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলো না। যে সংঘাতময় পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করলেন, তাতে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হওয়া দূরের কথা হরতাল-অবরোধে গোটা দেশ অচল হওয়া ছাড়াও সহিংসতার প্রবল আশঙ্কাও ছিল। তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় জনগণ যত অসন্তুষ্টই হোক, দেশে স্বস্তি ফিরে আসায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছে।

নির্বাচন বন্ধ হওয়ায় তারাই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন, যারা নির্বাচন বর্জন করেছেন। অশান্তি সৃষ্টিকারী শক্তি শান্ত হওয়ায় দেশে শান্তি ফিরে এল। নতুন কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান নিয়োগ করায় তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিজয়ীর মুডে বঙ্গ ভবনে শপথ অনুষ্ঠানে হাজির হন।

দুদিন পরই তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, সংবিধানের সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ায় এখন কবে নির্বাচন হবে তা একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে গেল। তারা যেসব দাবিতে সোচ্চার ছিলেন এর মধ্যে আইডি কার্ডসহ পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকাও একটি। এ কাজটি করতে কত সময় লাগবে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। নতুন উপদেষ্টা পরিষদ এ কাজটি সমাধা করার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে।

১৪ দলীয় সমন্বয়ক আবদুল জলিল ১৭ জানুয়ারি (২০০৭) দাবি জানালেন যে, সংবিধান অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে বোঝা গেল যে, আইডি কার্ড ছাড়াই তারা নির্বাচন চান। আইডি কার্ড হলে তাদেরই বেশি ক্ষতি হবে। কারণ, ভোট জালিয়াতিতে তাদের মতো দক্ষতা অন্য কারো নেই।

www.bjilibrary.com

নতুন কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ

সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকারের যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা আছে, মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়ায় সংবিধান লঙ্ঘন হয়ে গেল। আওয়ামী সংবিধানবিশারদ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও ড. কামাল হোসেন ১৯ জানুয়ারি (২০০৭) টিভি সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা দিলেন যে, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও আইডি কার্ডসহ ভোটার তালিকা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে সংবিধান লঙ্ঘনের বিষয়টা রেটিফাই (বৈধকরণ) করে নিতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না যে, নতুন কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান কবে সম্ভব হবে। সকল রাজনৈতিক দলই এখন পরিস্থিতির শিকার। কতদিন পর নির্বাচন হবে তা না জানার কারণে তাদের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। নির্বাচন না হলে তাদের রাজনীতি অর্থহীন। নির্বাচন হলেই ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা। তাই বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় নির্বাচনের অপেক্ষা করতেই হবে। অস্থির হয়ে কোনো লাভ নেই।

সংবিধান অনুযায়ী সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সংসদের নির্বাচন সমাপ্ত হতে হবে। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ শেষ হবে।

দৈবদুর্বিপাকে যদি ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তাহলে আরো ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সমাপ্ত হতে হবে।

এ সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা না গেলে কী করণীয়, সে বিষয়ে সংবিধানে কোনো বিধির উল্লেখ নেই। ১৮০ দিন অতিক্রম করার পর এ সরকারকে সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার বলা চলে না। তখন এ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু এ বিধান সংবিধানে না থাকায় পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে এ সরকারকে বিধিসম্মত বলে স্বীকৃতি দিতে হবে।

মহাজোটের টনক নড়েছে

বৈদেশিক চাপ সৃষ্টি করে শেখ হাসিনার মহাজোট নির্বাচন বানচাল করতে সক্ষম হওয়ায় যতই উল্লসিত হোক, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতামুক্ত কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচন অনেক বিলম্বিত করতে পারে বলে শঙ্কিত হয়েছে। তাই তারা নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছেন। আইডি কার্ডসহ ভোটার তালিকার দাবিও তারা ত্যাগ করেছেন, যাতে নির্বাচন বেশি বিলম্বিত না হয়।

পূর্ববর্তী কেয়ারটেকার সরকার সংবিধানের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য ছিল। নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ শেষে ৯০ দিনের জন্য ঐ সরকার দায়িত্ব

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের লাগাতার আন্দোলনের ফলে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম না হওয়ায় ঐ সরকার পদত্যাগ করে। এ পরিস্থিতিতে কী করণীয় সে বিষয়ে সংবিধানে কোনো বিধান দেওয়া নেই।

প্রেসিডেন্ট জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সংবিধানবহির্ভূত নতুন কেয়ারকেটার সরকার গঠন করেছেন। এ সরকারকে আইডি কার্ডসহ ভোটার তালিকা তৈরি করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দিয়েছেন। নবগঠিত এ সরকার ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করে উভয় রাজনৈতিক জোটের সাথে আলোচনা করে নির্বাচনের ব্যাপারে সমঝোতার ব্যবস্থা করতে কত সময় লাগবে, তা এখনো কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে সক্ষম নয়।

মহাজোটের এক নেতা এরশাদ সাহেব সরকারকে ছয় মাস সময় দিতে চান। সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ চার মাসেই আইডি কার্ড প্রস্তুত করা সম্ভব বলে দাবি করেছেন।

যাদের উপর নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করে এবং রাজনৈতিক জোটদ্বয়ের সাথে মতবিনিময় করে নির্বাচনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে এর জন্য স্বয়ং প্রেসিডেন্টও কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেননি। ফলে এ সরকারের মেয়াদকাল নির্ধারণের ইখতিয়ার তাদের হাতেই এসে গেল। মহাজোট নেতৃবৃন্দ এ সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে বাধ্য। সময়সীমা সম্পর্কে তাদের দাবি-দাওয়া কোনো কাজে লাগবে না। ইমার্জেন্সির কারণে এ বিষয়ে আন্দোলনেরও কোনো সুযোগ নেই।

কেয়ারটেকার সরকারের মেয়াদ কি অনির্দিষ্ট হতে পারে?

অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যা যা করণীয় বলে কেয়ারটেকার সরকার মনে করেন, তা সম্পন্ন করতে যতটা সময় প্রয়োজন তা তারা দাবি করতে পারেন। কিন্তু উভয় রাজনৈতিক জোট ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলেছেন। তাদের বক্তব্য হলো যে, সংবিধানে প্রথম ৯০ দিনের পর প্রয়োজনে আরো ৯০ দিন সময় নেওয়ার সুযোগ আছে। এর অতিরিক্ত সময় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিদেশিরা চার মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ীয় জোট নেতৃবৃন্দ বলেন, কেয়ারটেকার পদ্ধতির উদ্দেশ্যই হলো ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। অনির্বাচিত কোনো সরকার ৯০ দিনের বেশি সময় ক্ষমতাসীন থাকলে সংবিধানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি কেয়ারটেকার সরকারের উপর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন সে শর্ত পূরণ করতে আরো বেশি সময় যদি লেগে যায়, তাহলে এ বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেবেন? সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলে তারা পদত্যাগ করার হুমকি দিতে পারেন। তারা বলতে পারেন, 'আমরা এমন নির্বাচন উপহার দিতে চাই না, যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আমরা ব্যর্থ

www.bjilibrary.com

বলে গণ্য হতে প্রস্তুত নই। সফল নির্বাচনের জন্য সর্বনিম্ন যেটুকু সময় প্রয়োজন এর চেয়ে বেশি সময় চাই না।

সেনাবাহিনীর সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান

আমাদের সেনাবাহিনী বিশ্বে শান্তিরক্ষায় যে সুনাম অর্জন করেছে, দুর্নীতির চরম দুর্নাম তা ম্লান করে দিচ্ছে। সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস দমন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। অথচ তাদের নিজের দেশের সন্ত্রাসীরা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। চাঁদাবাজি, অবৈধ স্থাপনা ইত্যাদিও সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়ে।

প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করায় স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তারা এ ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়েছেন। জনগণ তাদের প্রতি অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ হিসেবে পূর্ণ আস্থা রাখে। তারা কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ যেই হোক, তারা তাকে ধরবেন।

এটাও স্বাভাবিক যে, এ জরুরি কাজটি করার জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন, তারা সে সময়টুকু চাইবেন। দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এ কাজটি সমাধা হওয়া তারা প্রয়োজন মনে করবেন। রাজনৈতিক সরকার এ কাজটি করার সুযোগ দেবে কি না, তা নিশ্চিত নয় বলে তারা মনে করতে পারেন।

অবশ্য যেভাবে কাজটি চলছে তাতে তারা কতটুকু সফল হবেন তা বলা মুশকিল। তারা সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছেন। পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায়ই সন্ত্রাস ও দুর্নীতি অব্যাহত আছে বলে অনেকেরই ধারণা। যতদিন জরুরি অবস্থা জারি থাকবে ততদিন হয়তো সেনাবাহিনীর গ্রেফতারকৃতরা সহজে ছাড়া পাবে না। কিন্তু তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে অপরাধী সাব্যস্ত করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। জরুরি অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া বাস্তবসম্মত নয়। তাই এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে সেনাবাহিনী যতই আন্তরিক হোক, এ ব্যাপারে সাফল্য নিশ্চিত নয়।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন

নবগঠিত কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সকল কমিশনারকে পদত্যাগ করার জন্য উপদেষ্টাগণ পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কমিশনের তো কোনো অপরাধ নেই। তাদের একমাত্র অপরাধ হলো, তারা জোট সরকারের আমলে নিযুক্ত। শুধু এ কারণে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হলে অত্যন্ত মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংবিধানবিরোধী এত জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, এর জের হিসেবে বর্তমান কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচন কমিশনকে

www.bjilibrary.com

পুনর্গঠনের প্রয়োজনে, মনে হয় ঐ মন্দ দৃষ্টান্ত এড়াতে পারবে না। তাই বর্তমান সকল নির্বাচন কমিশনারকেই পদত্যাগ করতে হবে। ছুটি পালনকালেই ২১ জানুয়ারি (২০০৭) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ পদত্যাগ করেছেন।

কেয়ারটেকার সরকার আওয়ামী লীগকে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আবার কোনো আপত্তি জানানোর অবকাশ রাখতে চান না। হয়তো কমিশনের কর্মকর্তাগণকেও অপসারণ করা হবে এবং দুটো রাজনৈতিক জোটপ্রধানদের যৌথ সম্মতি নিয়েই নতুন নির্বাচন কমিশনারগণকে নিয়োগ দেওয়া হবে, যাতে কোনো জোট নির্বাচন বর্জন না করে।

এত কিছু করেও কেয়ারটেকার সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার প্রমাণ পেশ করে উভয় জোটকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত করতে সক্ষম হওয়ার পর যদি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়, তাহলে তারা সেনাপ্রধান ও প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজুদ্দীন আহম্মেদকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন। নিজেদের বিজয় ছাড়া নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার ঐতিহ্য তাদের নেই।

কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহমদ ১২ জানুয়ারি শপথ গ্রহণ করেন এবং ২১ জানুয়ারি জাতির উদ্দেশে তাঁরা সরকারের করণীয় সম্পর্কে ২০ মিনিটব্যাপী ভাষণ দান করেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে করণীয় হিসেবে উল্লেখ করেন যে, নির্ভুল ভোটার লিস্ট, ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠন, কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন, দুর্নীতি দমন কমিশনকে সক্রিয় করার পর দ্রুততম সময়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরো ঘোষণা করেছেন, তার সরকার দুর্নীতি, দলীয় স্বার্থসিদ্ধি, নীতিহীন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও কালো টাকার প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।

সংবিধানে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কেয়ারটেকার সরকারকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা দানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটুকু কাজের জন্য ৯০ দিনই যথেষ্ট বলে বিগত দুটো নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের পূর্বে যেসব বিরাট কাজ সমাধা করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন, তাতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ারই কথা।

তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করেননি। দ্রুততম সময়েই ঐসব কাজ সমাধা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক উভয় জোট যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি পেশ করেছে তা প্রধান উপদেষ্টার পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্ট তাঁরা ১১ জানুয়ারিতে প্রদত্ত ভাষণে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে যা বলেছেন তাতে মনে হয় যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান পর্যন্ত জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে। এসব বিষয় বিবেচনায় রাখলে পূর্ণ এক বছর পরও নির্বাচন হবে কি না তা অনিশ্চিত।

www.bjilibrary.com

রাজনীতি কতদিন স্থবির থাকবে?

জরুরি অবস্থা জারির পর বিবৃতি দেওয়ার মধ্যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। জনসভা, মিছিল, আন্দোলন ইত্যাদি মুলতবি রয়েছে। রাজনীতি সম্পূর্ণ স্থবির হয়েই আছে। এ অবস্থা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে কোনো সমস্যা হবে কি না তা অবশ্যই বিবেচ্য।

সেনাপতি আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে তিন বছর রাজনীতিকে স্থবির করে রাখেন। সেনাপতি এরশাদ ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারি করে এক বছর রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ রাখেন। সংবিধান তখন মুলতবি রাখা হয়। বর্তমানে জরুরি অবস্থা চললেও সংবিধান মুলতবি করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের পর কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো কি কর্মহীন অবস্থায়ই থাকবে?

২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৮ ডিসেম্বর হঠাৎ করেই যে মহাজোট গঠিত হলো, তা কি আগামী নির্বাচন বিলম্বিত হলে একই অবস্থায় থাকতে পারবে? শেখ হাসিনা শতাধিক আসন অন্য দলকে দিয়ে দেওয়ার কারণে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অনেকেই মনোনয়নপত্রও প্রত্যাহার করেননি।

ঐ নির্বাচন বাতিল হওয়ায় আসন বণ্টন নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। যেসব ছোট দল অল্প আসন পেয়ে অসন্তুষ্ট ছিল তারা আরো দাবি জানাতে পারে। আওয়ামী লীগের যেসব প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, তাদের আসন অন্যদেরকে দেওয়া হলে তারা দলের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারেন।

সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক দল

শিক্ষিত মহলের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক আছেন, যাঁরা বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে গঠনমূলক কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত আছেন। তাঁরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত। তাঁদের অনেকেই নিজেদেরকে সুশীল সমাজের সদস্য মনে করেন।

তাঁরা চিন্তাশীল ও জ্ঞানী। তাঁরা সবসময় দেশের কল্যাণ কামনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। অনেক ইস্যুতেই তাঁরা জাতিকে উপদেশ দেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক হলেও সরাসরি রাজনীতি করেন না বলে দলীয় কোনো দায়িত্ব নেই। রাজনৈতিক বিতর্কিত বিষয়ে তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেন।

www.bjilibrary.com

গত বছর (২০০৬) রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলাশহরে সম্মেলন অনুষ্ঠান করে দেশের রাজনীতিকে সুস্থ ও উন্নত করার জন্য তাঁরা সুধীদের মধ্যে জনমত সংগঠিত করেন।

রাজনৈতিক দলসমূহ যাতে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক ও জনদরদিদেরকে বাছাই করেন; সাথে সাথে দুর্নীতিপরায়ণ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসের গডফাদারদেরকে যেন কেউ নমিনেশন না দেন, তাঁরা এর উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেন; এমনকি জনপ্রতিনিধিত্বের যোগ্য লোকের তালিকা প্রণয়ন করে রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট পরিবেশন করার মতো আজব প্রস্তাবও রাখেন।

অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। যেকোনো ময়দানেই যারা দীর্ঘ দিন কর্মরত থাকেন, তারা নিজ নিজ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। রাজনৈতিক ময়দানে যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন না, তারা আন্তরিকতার সাথেই এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই সম্পূর্ণ অবাস্তব পরামর্শ দিয়ে বসেন। নির্বাচনী প্রার্থী জোগাড় করার ভাবনাটাও অনভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। সম্প্রতি পত্রিকার খবর দেখলাম যে, সুশীল ও বুদ্ধিজীবীগণ একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছেন। এতে আমি বেশ উৎসাহ বোধ করেছি। যারা জ্ঞানী, মেধাবী, চিন্তাশীল এবং লেখাপড়ায় অভ্যস্ত তারা যদি রাজনৈতিক অঙ্গনে অবতরণ করেন, তাহলে দেশের রাজনৈতিক মান উন্নত হওয়ার আশা করা যায়। তারা একশ্রেণীর রাজনীতিকের মতো অশালীন ভাষায় বক্তব্য রাখবেন না। তারা উগ্র, হিংস্র ও সন্ত্রাসী আচরণ করবেন না। তাই তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াকে স্বাগত জানাই।

কিন্তু তারা কি সত্যি রাজনৈতিক কঠিন ময়দানে অবতীর্ণ হতে সাহস করবেন? রাজনীতি করা অত্যন্ত কঠিন। এ ময়দানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এ ময়দানের জীবন বড়ই অনিশ্চিত। যারা দূর থেকে নসিহত করেন তাদের এ ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। জাতি তাদের খিদমত পেয়ে ধন্য হতে পারে।

রাজনীতির মান কেমন হওয়া উচিত?

রাজনীতিকগণ দাবি করেন যে, দেশ ও জনগণের সেবাই তাদের উদ্দেশ্য। এ কথা সত্যি যে, রাজনীতির মাধ্যমেই জনগণের সর্বোচ্চ খেদমত করা সম্ভব। আবার রাজনীতির মাধ্যমেই জনগণের সর্বোচ্চ ভোগান্তিও সম্ভব। আওয়ামী লীগের রাজনীতি গণদুর্ভোগের বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছে। জরুরি অবস্থা জারি করে ঐ রাজনীতি বন্ধ করায় জনগণ যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

এটা কেমন রাজনীতি, যার ভয়ে সর্বস্তরের মানুষ উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও অসুবিধা ভোগ করতে বাধ্য হয়? জনগণ যে রাজনীতিকে এত ভয় পায়, এ রাজনীতি কি জনগণের জন্য? জনগণ যে তিক্ত অভিজ্ঞতা ২০০৬ সালে লাভ করেছে, তা বিবেচনায় রেখে তারা আগামী নির্বাচনে যদি সন্ত্রাসী রাজনীতিকদেরকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আশা করা যায়, দেশে মানসম্মত রাজনীতি বিকাশ লাভ করবে।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপ

শেখ হাসিনা খাল কেটে বিদেশি কুমিরকে এনে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার যে সুযোগ করে দিলেন, তা কি ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বন্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য জনগণ ও নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। শেখ হাসিনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের কয়েকদিন পরই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিদেশিদের সাহায্যে নির্বাচন বানচাল না করলে সাংবিধানিক জটিলতা সৃষ্টি হতো না এবং বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগও হতো না।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশের হস্তক্ষেপ শেখ হাসিনার অবশ্যই কাম্য। তবে জনগণ তিন-তিনটা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতা সম্পর্কে এতটা সচেতনতা অর্জন করেছে যে, তারা নির্বাচিত সরকার ব্যতীত অন্য কোনো সরকারকে মেনে নেবে না। তাই বর্তমান কেয়ারটেকার সরকারও ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দিলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবে না বলেই আশা করা যায়।

বিদেশিরা যা-ই করতে চান, অবাধ নির্বাচনে তাদের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনেক কিছুই করাতে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু কোন্ দল ক্ষমতায় আসবে, এ ব্যাপারে তাদের কোনো ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই।

বিদেশিরা কেবল এ দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই আধিপত্য প্রয়োগ করতে পারে। খাঁটি দেশপ্রেমিক দলসমূহ এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা অব্যাহত রাখলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা সহজে সম্ভব হবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে– এটাই প্রত্যাশা।

৩০০.

ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে এলাম

ইতঃপূর্বে ধারাবাহিক আলোচনা মুলতবি করে চলতি রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে ও জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর আড়াই মাস আমার ইংল্যান্ড সফরে আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ কয়েকটি কিস্তি লিখতে হয়। বর্তমানে পুনরায় ধারাবাহিক আলোচনায় ফিরে এলাম।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ১৯৯০ সালে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও পাঁচ দলীয় বাম জোট যুগপৎ আন্দোলন করার ফলে স্বৈরশাসক জেনারেল

www.bjilibrary.com

এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ দাবি অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হয় এবং ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় সরকার গঠন করে। 'জীবনে যা দেখলাম' ৬ষ্ঠ খণ্ডের ২৪৩ কিস্তিতে এসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণেই বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়; কিন্তু বিএনপি সরকার কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করায় আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি যুগপৎভাবে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি মেনে নিতে বিএনপি সরকারকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মজলিসে শূরার জরুরি অধিবেশন

১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের জরুরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র দুমাস পর ডিসেম্বরেই বার্ষিক অধিবেশন হওয়ার কথা, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনেই এ জরুরি অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছে, তাতে জামায়াতের শরীক হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। সংসদে আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল এবং শেখ হাসিনা বিরোধীদলীয় নেত্রী। জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি তারই নেতৃত্বে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিক কারণেই কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন তারই নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। জোটবদ্ধ আন্দোলন না হলেও যুগপৎ আন্দোলন তো হবে এবং নেতৃত্ব শেখ হাসিনার হাতেই থাকবে।

এরশাদের স্বৈরশাসনামলে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও পাঁচ দলীয় বাম জোট যুগপৎ আন্দোলন করেছে। তাতে শেখ হাসিনার একক নেতৃত্ব ছিল না, কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আন্দোলন চলবে। এ অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্দোলনে শরীক হওয়ার ব্যাপারে মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। আওয়ামী লীগ আদর্শিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে জামায়াতের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জামায়াতের পক্ষে আন্দোলনে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়।

এ অধিবেশন না ডেকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেত না?

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান জামায়াতে ইসলামীরই আবিষ্কার। বিগত নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে যে, একমাত্র এ পদ্ধতিতেই এ দেশে

www.bjilibrary.com

নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব। সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিতেই এ বিধান অনুযায়ী ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ পদ্ধতি দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলে ভবিষ্যতে এ বিধান অনুযায়ীই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ উদ্দেশ্যেই জামায়াতের পক্ষ থেকে সংসদে উত্থাপনের জন্য বিল জমা দেওয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি সরকার এ বিধানকে আইনে পরিণত করতে অস্বীকার করায় আবার কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আওয়ামী লীগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ দাবি মূলত জামায়াতের আবিষ্কার। এ দাবিতে ময়দানে আন্দোলন হলে জামায়াতের পক্ষে নিশ্চুপ থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই জামায়াতের নির্বাহী ও কর্মপরিষদেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। এর জন্য মজলিসে শূরার অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আন্দোলনে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রাধান্য থাকায় এ পরিস্থিতিতে জামায়াতের পক্ষে এ আন্দোলনে শরীক হওয়া সমীচীন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজনেই এ অধিবেশন ডাকতে হয়েছে।

এ বিষয়ে আমার মনের অবস্থা

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলনে শরীক হওয়ার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত বিব্রত ছিলাম। জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়ে গেছে বলে অপপ্রচার চলার আশঙ্কা তো ছিলই, কিন্তু আন্দোলনে নিরপেক্ষ থাকারও কোনো উপায় ছিল না। ইস্যুটা জামায়াতের। জামায়াত কেমন করে নিশ্চুপ থাকতে পারে? আন্দোলনে শরীক না হলে রাজনৈতিক ময়দান থেকে জামায়াত উৎখাত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে।

আমি নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চিন্তা করলাম যে, আমরা কোনো জোটে শরীক হচ্ছি না, আওয়ামী লীগের সাথে এক মঞ্চে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু যুগপৎ পদ্ধতিতে পৃথক মঞ্চ থেকে একই আন্দোলন করব। ইস্যুটা অবশ্যই কমন। আর ইস্যুটা যে জামায়াতের তা রাজনৈতিক ময়দানে সবাই জানে।

এভাবে আমি মানসিকভাবে আন্দোলনে শরীক হওয়া অনিবার্য মনে করেই মজলিসে শূরার অধিবেশনে উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করলাম। স্বাভাবিকভাবেই মজলিসে শূরার সদস্যগণকে আন্দোলনের পক্ষে মতামত দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই জোরালো বক্তব্য পেশ করলাম।

উদ্বোধনী বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামী ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত করাচি সম্মেলনে চার দফা স্থায়ী কর্মসূচির চতুর্থ দফাটিই রাজনৈতিক দফা। দেশে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সরকারি ক্ষমতা সৎ ও যোগ্য লোকদের হাতে তুলে দেওয়ার কর্মসূচি হিসেবেই ঐ দফাটি শামিল করা

www.bjilibrary.com

হয়েছে। ঐ দফাটির মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো যে, জামায়াতে ইসলামী অরাজনৈতিক সংগঠন নয়, ইসলামী রাজনৈতিক দল।

রাজনৈতিক দল হিসেবে ময়দানে পরিচিত হয়ে টিকে থাকতে হলে রাজনৈতিক ইস্যুতে সোচ্চার হতে হবে। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনকে উৎখাত করে গণতন্ত্রকে বহাল করা বিরাট রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াল। এ ইস্যু সকল রাজনৈতিক দলের। তাই জামায়াতে ইসলামী অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ আন্দোলন করে। ফলে স্বৈরশাসনের অবসান হয়। ঐ রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই জামায়াত জনগণের নিকট রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে জামায়াত একটি অরাজনৈতিক ইসলামী দল হিসেবেই পরিচিত হতো।

বাংলাদেশ আমলে সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারি করে গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। স্বৈরশাসন উৎখাত করে গণতন্ত্রকে বহাল করার উদ্দেশ্যে জোটবদ্ধ না হয়েও জামায়াতে ইসলামী বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করে। এ আন্দোলনে শরীক হওয়ার ফলেই ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদে ১৮টি আসন পেয়ে রাজনৈতিক ময়দানে মর্যাদার স্থান দখল করে।

এখন কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে শরীক না হলে আমরা রাজনৈতিক ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

আমার বক্তব্যের শেষদিকে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, পূর্ববর্তী আন্দোলনের মতো এ আন্দোলনের দ্বারাও সুফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জামায়াত মাত্র তিনটি আসনে বিজয়ী হয়। এ বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে পরবর্তীতে যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য

চলমান আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে জামায়াতের তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেল ও পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো পরবর্তী সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে। তিনি বলেন যে, ভোটের ময়দানে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে জামায়াতকে প্রধান বাধা মনে করে। জামায়াত আওয়ামী লীগবিরোধী ভোটারদের মধ্যে ভাগ বসায় বলে বিএনপি বেশ কতক আসনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়।

যদি আগামী নির্বাচন বিএনপির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে জামায়াতকে একটি আসনেও বিজয়ী হতে দেবে না। তাই নির্বাচনের পূর্বেই কেয়ারটেকার সরকারব্যবস্থা

www.bjilibrary.com

সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ কারণেই চলমান আন্দোলনে শরীক হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

মজলিসে শূরার সদস্যগণ এ বিষয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করার পর সর্বসম্মতিক্রমে যুগপৎভাবে আন্দোলনে শরীক হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, উক্ত রাজনৈতিক ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন চলাকালে বিভিন্ন ইসলামী ইস্যুতে সম্ভব হলে অন্যান্য ইসলামী দলের সাথে যুগপৎভাবে কর্মসূচি পালন করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

এ অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারের নিকট ব্লাসফেমি আইন পাস করার দাবি জানানো হয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক মুসলিম নামধারী মুরতাদ সালমান রুশদী ও বাংলাদেশি ভ্রষ্টা চরিত্রের মুসলিম নামের কলঙ্ক তাসলিমা নাসরিনের রচিত পুস্তকে বিশ্বনবী (স) সম্পর্কে জঘন্য কটুভাষা ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ঐ আইন পাসের দাবি জানানো হয়।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন

এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আট দলীয় জোট, বেগম জিয়ার নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ আন্দোলন করে। ১৯৯০ সালের শেষদিকে বামপন্থি পাঁচদলীয় জোটও যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হয়।

সাক্ষাৎ বা টেলিফোনে যোগাযোগ করে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে পৃথক পৃথকভাবে একই দিনে ও একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঐ কর্মসূচি পালন করা হতো। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের সময় কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে বিএনপির সাথেই জামায়াতের যোগাযোগ বেশি হতো। আওয়ামী লীগের সাথে তেমন যোগাযোগ হতো না। অবশ্য জামায়াতের লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ নিয়মিত দুজোটের নেত্রীদ্বয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

দুজোটের কোনো জোটই জামায়াতে ইসলামীকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিত না। কর্মসূচি গ্রহণে জামায়াত শরীক বলে তারা স্বীকারও করত না।

কিন্তু ১৯৯৪ সালের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে বৈঠকে মিলিত হয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করত। এ বৈঠক প্রায়ই আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের বাসায় বসত। মাঝে মাঝে মোহাম্মদ নাসিম সাহেবের বাসায়ও বৈঠক হতো।

কোন্ দলের কে কে বৈঠকে উপস্থিত হতেন, তা-ও নিয়মিত পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এ আন্দোলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী প্রধান দুদলের নিকট প্রকাশ্য রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

www.bjilibrary.com

বৈঠকে আওয়ামী লীগের আবদুস সামাদ আজাদ, মোহাম্মদ নাসিম ও তোফায়েল আহমদ; জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জামায়াতে ইসলামীর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আবদুল কাদের মোল্লা নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। তিন দলেরই আরো কয়েকজন বৈঠকে অনিয়মিতভাবে আসতেন।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সালের আন্দোলন

তিন দলের লিয়াজোঁ কমিটিসমূহের যৌথ বৈঠকে আলোচনা করেই আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হতো এবং পত্রিকায় তা প্রকাশিত হতো।

কর্মসূচি তৈরি করার সময় জামায়াতের প্রতিনিধিগণ হরতালের বিকল্প কর্মসূচি গ্রহণের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। একদিনের হরতালকে অর্ধদিনে বা দুদিনের লাগাতার হরতালকে এক দিনে কমিয়ে আনার চেষ্টাও করতে হতো।

তিন দলের যৌথ বৈঠকে কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও তা পৃথকভাবে বাস্তবায়ন করা হতো। সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের অনুষ্ঠান প্রত্যেক দল আলাদাভাবে করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের প্রোগ্রামের প্রকৃতি জামায়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনেরই হতো। বিশেষ করে হরতালে চলতি গাড়ি ভাঙচুর, খোলা দোকানে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য।

বিশেষ করে অফিসগামী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অফিসে না গিয়ে হরতাল পালনে বাধ্য করার জন্য তাদের সাথে অসভ্য আচরণ এবং তাদের প্রতি পেশিশক্তি প্রয়োগ করা আওয়ামী লীগের স্থায়ী অভ্যাস। এমনকি তাদের কারো কারো পোশাক খুলে নগ্ন করার মতো বর্বর আচরণ করতেও তাদের বিবেকে বাধেনি।

কর্মসূচিতে জামায়াত শরীক থাকার কারণে আওয়ামী লীগের উশৃঙ্খল ও অশালীন আচরণে জামায়াত অত্যন্ত বিব্রতবোধ করত এবং জনগণের নিকট লজ্জাবোধ করত।

১৯৯৫ সালের শেষ দিকে আন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠল তখন আওয়ামী লীগের সহিংসতা ও উগ্রতা আরো বৃদ্ধি পেল। এসবের প্রতিবাদ করাও সম্ভব ছিল না বলে জামায়াত অনেকটা অসহায়ত্ব বোধ করতে বাধ্য হলো।

মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন

১৯৯৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। ঐ দিনই ১৯৯৫-১৯৯৭ মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমাকে শপথ গ্রহণ করতে হয়। প্রধান নির্বাচন পরিচালক অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ শপথ পরিচালনা করেন।

www.bjilibrary.com

শপথ গ্রহণের পর উদ্বোধনী বক্তব্যে যে দুটো বিষয়ে আমাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয় তা শূরার কার্যবিবরণী থেকে উল্লেখ করছি :

১. কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে চলমান আন্দোলন।

২. ১৩ ডিসেম্বর (১৯৯৪) মরক্কোতে অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন।

কেয়ারটেকার সরকারপদ্ধতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবির বিরুদ্ধে বিএনপি সরকার এক হাস্যকর যুক্তি দিচ্ছে যে, সংবিধানে এর বিধান নেই। এর জবাবে আমি বলেছি, সংবিধানে নেই বলেই তো সংবিধানে তা সংযোজনের দাবি করা হচ্ছে। সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতিও ছিল না। এ সরকারের আমলেই ১২ নং সংশোধনী দ্বারা তা সংযোজন করা হয়েছে।

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে বক্তব্য রাখি :

ক. রাশিয়া থেকে চেচনিয়াকে মুক্ত করার দাবি করা।

খ. বাবরী মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ।

গ. কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর যুলুম বন্ধ করার দাবি জানানো।

ঘ. ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে 'মৌলবাদ' পরিভাষা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো।

১৩ ডিসেম্বর মজলিসে শূরায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, সরকারের যেকোনো উপায়ে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার মানসিকতার কারণেই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কেয়ারটেকার সরকার দাবি মেনে না নিলে যেকোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

অধিবেশনে সেক্রেটারি জেনারেলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সংসদীয় দলের নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলেন,

"১৯৯৪ সালের গোড়া থেকেই সংকটের সূচনা হয়। প্রথমে সংসদ থেকে ওয়াকআউট, পরে বয়কট এবং সবশেষে ২৭ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় এমপিদের পদত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সংলাপ ও আপসের সব উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। পদত্যাগের পর সরকার উপনির্বাচন দিতে পারে, অথবা সংসদ ভেঙে দিয়ে অগ্রিম নির্বাচন দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনায় সংসদ নির্বাচনের চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তিন বিরোধী দল এ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না। সরকারি ও বিরোধী দলে কোনো সমঝোতা না হলে সামরিক শাসনও আসতে পারে। তবে তারা হয়তো শাসনের ভূমিকার বদলে নির্বাচন করিয়ে ব্যারাকে ফিরে যেতে পারে। যে পরিস্থিতিই সৃষ্টি হোক জামায়াতকে তো আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে জনগণের ময়দানে এগিয়ে যেতেই হবে।"

www.bjilibrary.com

১৯৯৪ সালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

১. ১৯৯৪ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সংসদ বয়কট শুরু করে এবং যুগপৎ কর্মসূচি জোরদার করে।

২. ২৭ জুন তিন দল পৃথকভাবে ঘোষণা দেয় যে, সরকার কেয়ারটেকার সরকার বিল পাস না করলে সংসদ থেকে তাদের দলীয় এমপিগণ পদত্যাগ করবেন।

৩. ২৮ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় ১৪৭ জন এমপির পদত্যাগপত্র স্পিকারের নিকট জমা দেওয়া হয়।

আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যেই নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের প্রায় অর্ধেক সদস্য পদত্যাগ করেন, যাতে সরকার সংসদ ভেঙে দিতে বাধ্য হয়।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.bjilibrary.com